বাংলা মঙ্গলকাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

মোছা. শামীম আরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

নভেম্বর ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোছা. শামীম আরা কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলা মঙ্গলকাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি লেখকের মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

০৭. ১১. ২০১২

(ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

466240

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

ছাত্রজীবনে সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ জন্মেছিল, তা' পরবর্তী সময়ে অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণায় রূপান্তরিত হয়েছে। সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জনজীবন বিষয়ে কৌতূহল জাগায় মধ্যযুগের সাহিত্য মঙ্গলকাব্যকে বেছে নেওয়া। কারণ মঙ্গলকাব্যের অন্ত্যজ জীবন সম্পর্কিত তথ্য-অন্বেষণই বর্তমান গবেষণাকর্মটি রচনার মূল প্রেরণা।

'বাংলা মঙ্গলকাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে নাম নিবন্ধন করি। পিএইচ. ডি. গবেষণায় নিবন্ধন দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনা করি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল আমার অন্যতম শ্রম-উৎস। মঙ্গলকাব্যের দুষ্প্রাপ্য টেক্সট সংগ্রহ থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে স্যারের সুচিন্তিত পরামর্শ, নির্দেশনা ও মীমাংসা আমার গবেষণাকর্মকে অনেক সহজসাধ্য করে দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম।

অন্বিষ্ট বিষয় নির্বাচন, গবেষণা-পরিকল্পনা ও বিষয় মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক খোন্দকার সিরাজুল হক-এর সুচিন্তিত অভিমত ও প্রাজ্ঞ বিবেচনা আমার অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজতর করে দিয়েছে। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে গ্রন্থ সাহায্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যাঁরা আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন তাঁরা হলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল ও ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী । এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রসঙ্গত স্মরণ করছি আমার কর্মস্থল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকর্মীদের নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার কথা। কৃতজ্ঞতা জানাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক চঞ্চলকুমার বোস, অধ্যাপক হোসনে আরা জলী, সহযোগী অধ্যাপক আরজুমন্দ আরা বানু এবং

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শিপ্রা সরকারকে। মঙ্গলকাব্য-সংশ্লিষ্ট কিছু দুর্লভ গ্রন্থ দিয়ে তাঁরা আমাকে ঋণী করেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মিল্টন বিশ্বাস ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. শামীম রেজা তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গ্রন্থ দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে ঋণী করেছেন।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, গণ-গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ ও কর্মিবৃন্দকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ প্রসঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেকশন অফিসার নবাব সিরাজুদ্দৌলার সহায়তার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি। গবেষণাকর্ম রচনায় উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে আমাকে ঋণে আবদ্ধ করেছেন আমার বাবা-মা ও আমার স্বামী মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান আজাদ তাঁদের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা। গবেষণাকালে ছোট্ট কাব্যকে ঠিকমতো সময় দিতে পারিনি, ওর জন্য রইল আমার আদর ও ভালবাসা। গবেষণাকর্মটি কম্পিউটারে মুদ্রণের কাজে সহযোগিতা করেছেন লিটু ভাইয়া ও সজল। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

এই অভিসন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে যে পরম সত্যটি আমি উপলব্ধি করেছি তা হল এই, মানুষের জানার ও শেখার কোনো শেষ নেই।

০৭.১১.২০১২

(মোছা. শামীম আরা)

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ৬-৯

প্রথম অধ্যায় : মঙ্গলকাব্যের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ ১০-৪৬
প্রথম পরিচ্ছেদ : মনসামঙ্গল কাব্য
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চণ্ডীমঙ্গল কাব্য
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অন্নদামঙ্গল কাব্য
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ধর্মমঙ্গল কাব্য
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন

দ্বিতীয় অধ্যায় : মঙ্গলকাব্যের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি ৪৭-৬৯

তৃতীয় অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ ৭০-১০৭
প্রথম পরিচ্ছেদ : সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মনসামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

চতুর্থ অধ্যায় : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ ১০৮-১৬৩
প্রথম পরিচ্ছেদ : সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

পঞ্চম অধ্যায় : অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ ১৬৪-১৯৫
প্রথম পরিচ্ছেদ : সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অন্নদামঙ্গলকাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

ষষ্ঠ অধ্যায় : ধর্মমঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ ১৯৬-২৩২
প্রথম পরিচ্ছেদ : সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ধর্মমঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

সপ্তম অধ্যায় : শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়নে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ ২৩৩-২৫৮
প্রথম পরিচ্ছেদ : সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়নে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

উপসংহার ২৫৯-২৬১

পরিশিষ্ট ২৬২-২৭২

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ শাখার উদ্ভব ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়ে সাহিত্য-সাধনা করা সেকালের মানুষের পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব। ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কারকে সমাজ-মানসের হৃদয়গোচর করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্যসমূহ। মধ্যযুগের এই সমৃদ্ধ শাখাটিতে একদিকে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের রীতি-নীতি, আদর্শ-ঐতিহ্য তথা লোক-জীবনের সামগ্রিক ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কারের কথা যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তৎকালীন সমাজের আনুষঙ্গিক নানা বিষয়।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ শ্রেণির ধর্ম-বিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত তা-ই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। বাংলার পল্লীর জনমানসে এর উদ্ভব হয়েছে ঠিকই কিন্তু এর ব্যাপ্তি রাজসভা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যুগে যুগে বঙ্গদেশের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছিল, মঙ্গলকাব্য যেন তারই পরিচায়ক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি ও ধর্ম-বিশ্বাসের বিস্তৃত ভিত্তির উপর মঙ্গলকাব্যগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হতে শুরু করে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে বিবিধ মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলো যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়, বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলোও একই উদ্দেশ্যে প্রথমদিকে রচিত হতে শুরু করে। মহারাজ অশোকের সময় হতে সমগ্র ভারতবর্ষে যে ধর্মের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল সে ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম। এই ধর্মের প্রতিক্রিয়ারূপে এদেশীয় জনগণের অর্জিত ধর্মবিশ্বাস ও হিন্দুধর্মের মূলগত আর্দশ উভয়ের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধান করে ভারতবর্ষে এক নবসংস্কার-প্রবুদ্ধ হিন্দুধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল। সে-যুগে বেদ ও উপনিষদ বর্ণিত ব্যক্তিসত্তাহীন ভাব-সর্বস্ব দেবতাগণকে তাদের কল্পিত গুণাবলির উপর বাস্তবতা আরোপ করে ভারতবর্ষের কর্মভূমিতে অবতীর্ণ করা হয়েছিল। এর কারণ ছিল এই যে, ইতঃপূর্বে বুদ্ধদেব নিজস্ব কর্মসাধনার মাধ্যমে সমাজের বুকে নিজের ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, মানুষের মনে সৌহার্দ্যের জায়গা তৈরি করে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তাই বৌদ্ধধর্মের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য বৈদিক হিন্দুধর্মের যখন সংস্কারের প্রয়োজন হল, তখন হিন্দুর দেবতাগণকে আর কল্পনার মায়াজালে আবদ্ধ করে রাখা যায়না, স্বর্গলোকবিহারী করে রাখা চলেনা। তাদেরকে মূর্তিধারণ করে মানুষের সমাজে নিজেদের কর্তব্যসাধনের পথে অগ্রসর করাতে হয়েছিল। এরূপ বিষয়বস্তু অবলম্বন করেই খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হতে সংস্কৃত পুরাণগুলি রচিত হতে থাকে।

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার যুগে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে জাতবর্ণ প্রথাই ছিল শ্রেণিরূপের সমার্থক। জাতবর্ণ হল বাঙালির সবচেয়ে স্বতন্ত্র ও আদি সামাজিক গোষ্ঠী যা জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয়। মধ্যযুগের হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথা মূলত কৌলিক বৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তী সময়ে এটি একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। মধ্যযুগের বাংলায় বর্ণবিন্যাস ও শ্রেণিবিন্যাস প্রায় অভিন্ন ছিল। বাংলায় শূদ্র ও অন্ত্যজেরা কেবলমাত্র বর্ণ হিসাবেই নয়, অর্থনৈতিক বিচারেও ছিল সমাজের নিম্নতম পর্যায়ের মানুষ। এদের প্রায় সকলেই দিনমজুর, ভূমিহীন, কিংবা অন্যান্য পেশার সমাজ-শ্রমিক। বর্তমান অভিসন্দর্ভে অন্ত্যজ বলে তাদেরই স্থান-অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যারা কোনো না কোনো ভাবে অন্তেবাসী মানুষ।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের ভেদ প্রচলিত থাকলেও বাংলায় মাত্র দুটি জাতির অস্তিত্ব ছিল। শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণ ছাড়া সমূহ জনসাধারণকে 'শূদ্র' অভিধায় নির্দেশ করেন কেননা রক্তসঙ্কর্যের কারণে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা তাদের বৃত্তি বা পেশা অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ দুটোতে বর্ণসঙ্করতাকে স্বীকার করে নিয়ে শূদ্র- জনগোষ্ঠীকে ভাগ করা হয়েছে তিন উপশ্রেণিতে, উত্তমসঙ্কর বা সৎ-শূদ্র, মধ্যমসঙ্কর বা অসৎ-শূদ্র এবং অধমসঙ্কর বা অন্ত্যজ।

অধমসঙ্কর বা অন্ত্যজ'রা জলচল গোষ্ঠীতে কোনোদিন স্থান পায়নি। মঙ্গলকাব্যসমূহে ব্রাহ্মণ সংস্কারশাসিত সমাজে এরা অস্পৃশ্য হিসাবেও গণ্য হত। সেকালের শ্রমজীবী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল মোটামুটি এদের দিয়েই । সেকালের অন্ত্যজ জাতিসমূহ নানাভাবে সমাজকে সেবা করেছে, যার বাস্তবচিত্র মঙ্গলকাব্যসমূহ। বাঙালি কোনোকালেই শ্রমবিমুখ ছিলনা। পাশাপাশি শ্রমবিমুখ ছিল না তৎকালীন বাঙালি ঘরের নারীরাও। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা পালনের নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যসমূহে অথচ মধ্যযুগের সমাজে নারীরা ছিল অবহেলিত, বঞ্চিত ও অধিকারহীনা। এই অর্থে সামাজিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান সমাজের অন্তে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের শিরোনাম *বাংলা মঙ্গলকাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ*। স্বাভাবিক কারণেই এই আলোচনা প্রধান মঙ্গলকাব্য হিসেবে *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল*, *অন্নদামঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল*, *শিব-সঙ্কীর্ত্তন* বা *শিবায়ন*–এই পাঁচটি মঙ্গলকাব্যের পরিমণ্ডলে আবর্তিত হয়েছে।

গুরুত্ব

মধ্যযুগের ধর্মাশ্রিত ও ধর্মনিরপেক্ষ–উভয় শ্রেণির কাব্যে বাংলার সামাজিক জীবনের অসংখ্য উপাদান ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সাহিত্যের এইসব সামগ্রী একত্রীকরণের মাধ্যমে তৎকালীন দেশ, জাতি ও সমাজ-পরিবেশের অনন্য চিত্র অঙ্কিত হতে পারে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শাখা মঙ্গলকাব্যসমূহে বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, অন্ত্যজ শ্রেণির স্থান-অবস্থান, ভূমি-ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রেণিবৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব, আর্থ-সামাজিক অবস্থা , ধর্মীয় অবস্থান এবং প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দুষ্টিকোণ থেকে মঙ্গলকাব্যগুলো পর্যবেক্ষণ করলে তৎকালীন সমাজের সার্বিক চালচিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান-অর্জন সম্ভব। তবে শুধুমাত্র সাহিত্যের উপাদান-উপকরণের সাহায্যে একালে বসে সেকালের শ্রেণি-সমাজের চিত্র অঙ্কন সত্যিই দুরূহ। মধ্যযুগের সাহিত্যের সামাজিক উপাদানের সবগুলোই বাস্তব সমাজ-উদ্ভূত ছিলনা। এর কিছু ছিল কল্পনা নির্ভর, কিছু ছিল জনশ্রুতি-নির্ভর, কিছু ছিল গতানুগতিক বর্ণনামাত্র। এরূপ হওয়ার কারণ হতে পারে সংশ্লিষ্ট কবিদের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বা অপূর্ণতা। এজন্যই মঙ্গলকাব্যের উপাদান-উপকরণের সবটাই গ্রহণ করা যায়না, এর জন্য থাকা উচিত গ্রহণ-বর্জনের ঔচিত্যবোধ। সুতরাং যে-সকল বিষয় বাস্তবোচিত বলে মনে হয়েছে, অন্ত্যজ শ্রেণির বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে– সেইসব উপাদনই আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আলোচ্য অভিসন্দর্ভের বিষয়গত সীমাবদ্ধতার কথা বলা প্রয়োজন। আমার গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মঙ্গলকাব্যের অন্ত্যজ শ্রেণির বৈশিষ্ট্য সন্ধান এবং তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে তাদের জীবনের রূপায়ণ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন।

এ কারণে বর্তমান অভিসন্দর্ভে সাহিত্য ও সমাজের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার দিকে না গিয়ে আকর গ্রন্থের তথ্যের ওপর অধিকতর গুরত্ব দেয়া হয়েছে এবং তথ্যের মাধ্যমে অন্ত্যজ জীবনের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্য নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণে গবেষণা হলেও অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে, আমাদের জানা মতে, সমগ্রতা-স্পর্শী কোনো গবেষণামূলক কাজ হয়নি। এ ধরনের

Dhaka University Institutional Repository
প্রায় অনুদ্‌ঘাটিত একটি বিষয়কে তুলে ধরার প্রয়োজনের দাবিকে স্বীকার করেই রচিত আলোচ্য অভিসন্দর্ভ *বাংলা মঙ্গলকাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ*।

পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটি ধর্মীয় ও সামাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের সমন্বয়ে ঐতিহাসিক-বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। বাংলা মঙ্গলকাব্য নিয়ে ইতঃপূর্বে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের গবেষণা-গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বর্তমান গবেষণাকর্মে ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিধি

বাংলা মঙ্গলকাব্যে অন্ত্যজ জীবন দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। একদিকে ধর্মীয় অন্ত্যজ, অন্যদিকে সামাজিক অন্ত্যজ। এই দুই ধারার মিলিত স্রোতই মঙ্গলকাব্যের অন্ত্যজ জীবন। মঙ্গলকাব্যের সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনধারা, শ্রেণিসংগ্রাম, ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক পরিস্থিতির একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনই বর্তমান গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান গবেষণা-প্রকল্পকে নিম্নোক্ত সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস পেয়েছি।

১. মঙ্গলকাব্যের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ : এই অধ্যায়ে পাঁচটি মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

২. মঙ্গলকাব্যের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি : এই অধ্যায়ে প্রাক্-তুর্কী ও তুর্কী-পরবর্তী শাসনামলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করে মঙ্গলকাব্যের পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে।

৩. মনসামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ : এই অধ্যায়ে সামাজিক অন্ত্যজ ও ধর্মীয় অন্ত্যজ শ্রেণির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর মনসামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণে তৎকালীন সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির বৈশিষ্ট্য, সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিদ্বন্দ্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-ব্যবস্থা, অন্ত্যজ নারীর অবস্থান ও নানাবিধ সামাজিক চিত্রের বর্ণনা এবং তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৪. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ : এই অধ্যায়ে সামাজিক অন্ত্যজ ও ধর্মীয় অন্ত্যজ শ্রেণির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণে তৎকালীন সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির বৈশিষ্ট্য, সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিদ্বন্দ্ব , ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-ব্যবস্থা, অন্ত্যজ নারীর অবস্থান, নগরায়ণ, নগরজীবন ও নানাবিধ সামাজিক চিত্রের বর্ণনা এবং তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৫. অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ : এই অধ্যায়ে সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ অংশে অন্ত্যজ শ্রেণির স্বরূপ ও অন্ত্যজ নারী চরিত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া তৎকালীন সমাজের নানাবিধ সমাজচিত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ : এই অধ্যায়ে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর ধর্মমঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ অংশে অন্ত্যজ শ্রেণির বীরত্বের অমরগাথা বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক চিত্রও স্থান পেয়েছে।

৭. শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ : এই অধ্যায়ে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এছাড়াও অন্ত্যজ শ্রেণির দেবতারূপে শিবের কীর্তিকলাপের মাধ্যমে গার্হস্থ্যজীবন, পারিবারিকজীবন এবং অন্ত্যজ শ্রেণির নারীর জীবনযাত্রা স্থান পেয়েছে।

উপসংহার অংশে পূর্বের অধ্যায়সমূহের আলোচিত বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় :

মঙ্গলকাব্যের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় :

মঙ্গলকাব্যের পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ

মানুষের বিশ্বাস মতে, দেবদেবীর মাহাত্ম্য-নির্ভর যে সাহিত্য–রচনা, পাঠ ও শ্রবণ করলে নিজের, প্রতিবেশীর ও সমাজের মঙ্গল বা কল্যাণ সাধন হয় তাই-ই মঙ্গলসাহিত্য। এই সাহিত্যের গঠন যেহেতু কাব্যাকারে সেহেতু মঙ্গলসাহিত্য না বলে মঙ্গলকাব্যই বলেছেন এই ধারার কবিরা। মঙ্গলকাব্যের 'মঙ্গল' শব্দটির সঙ্গে শুভ ও কল্যাণ বা ভালো কিছুর অর্থসাদৃশ্য থাকা ছাড়াও আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, মঙ্গলকাব্য এক মঙ্গলবারে পাঠ আরম্ভ হয়ে পরের মঙ্গলবারে সমাপ্ত হত। বিভিন্ন দেবদেবীর গুণকীর্তন মঙ্গলকাব্যগুলোর উপজীব্য। তবে স্ত্রীদেবতাদের প্রাধান্যই বেশি বিশেষকরে, মনসা ও চণ্ডীই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এদের গুণকীর্তনমূলক দুটি মঙ্গলকাব্যই মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মঙ্গলকাব্যগুলো খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক ও লৌকিক আবার পৌরাণিক-লৌকিক সংমিশ্রিত হয়ে রচিত হয়েছিল। লৌকিক দেব-দেবীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলোতে : ক. বন্দনা খ. গ্রন্থরচনার কারণ বর্ণনা গ. দেবখণ্ড ও ঘ. নরখণ্ড বা মূল কাহিনি বর্ণনা–এই চারটি অংশ থাকে। বারমাসী ও চৌতিশা জাতীয় কাব্যাংশ মঙ্গলকাব্যে স্থান লাভ করত। কবি কাব্যে নিজের পরিচয় উল্লেখ করতেন। মঙ্গলকাব্যগুলো দেবদেবীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত হলেও এতে বাঙালি জীবনের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাঙালি সমাজের বহু অপ্রাপ্ত তথ্যের শূন্যস্থান পূরণ করেছে মঙ্গলকাব্যের উপাদান। তুর্কী আক্রমণের ফলে আকস্মিক সামাজিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলকাব্যগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল বলে তাতে সমাজ-মানসের দৈবনির্ভরশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। আবার লৌকিক ও পৌরাণিক আদর্শ-মিশ্রিত লৌকিক দেবদেবীর মহিমাপ্রচারক এবং ভক্তের গৌরববাচক এই মঙ্গলকাব্যগুলো আখ্যানকেন্দ্রিক ধর্মীয় সাহিত্য বলা যেতে পারে। সর্বোপরি যে বিষয়টি মঙ্গলকাব্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে মঙ্গলকাব্যে লৌকিক গ্রামীণ-সংস্কার, আর্যেতর দেব-বিশ্বাস এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার ও চিন্তাধারা ক্রমে সমন্বয় লাভ করেছিল। সাম্প্রদায়িক দেব-কাহিনি সার্বজনীন মানবিক সংবেদনাপূর্ণ সাহিত্যরূপে নবজন্ম লাভ করেছিল। উঁচু-নিচুর প্রভেদ ভুলে গিয়ে গোষ্ঠিগত সাধনার সাফল্যে শিল্পধর্মী অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছিল মঙ্গলকাব্যে। এ অধ্যায়ে প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ

মনসামঙ্গল কাব্য

পদ্মাপুরাণ বা *মনসামঙ্গল* কাব্যের কবি বিজয় গুপ্ত। বিজয় গুপ্তের আত্মপরিচয় সূত্রে জানা যায় তিনি বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবির ভাষ্য :

হরি মনে ভাবিয়া নির্ম্মল কৈলা চিত।
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত ॥
ঋতু [শ] শী বেদ শশী পরিমিত শক
সুলতা [ন] হুসন রাজা পৃথিবী পালক ॥
সমরে দুর্জ্জয়ে রাজা বিপক্ষের যম।
দানে কল্পতরু রাজা রূপে কামসম ॥
যাহার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে [অ] ধিক।
মুলুক ফতোয়াবাদ বাঙ্গ রোর [তম] সিক ॥
পশ্চিমে গর্গর নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেস্বর।
মধে [য়] ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥
বৈদ্য জাতি বৈসে তমা লেখনে চতুর।
একাদশীর ব্রত করে পুজয়ে ঠাকুর ॥
স্থানগুণে জেই বৈসে সেই জ্ঞানময়ে।
হেন [ফুল] শ্রী গ্রামে বাস করেন বিজয়ে ॥

(পদ্মাপুরাণ : মনসার জন্মপালা, পৃ. ৮-৯)

কবির জন্ম বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রামে। এই গ্রামটির প্রাচীন নাম 'মানসী', পরবর্তী সময়ে গৈলা-ফুলশ্রী নামে পরিচিতি পায়। কবি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সনাতন, মাতার নাম রুক্মিণী। কবির জন্মভূমি 'মুল্লক' ফতেয়াবাদের অন্তর্ভুক্ত। সতের শতকের কবি আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্য থেকে জানা যায় সতের শতকে ফরিদপুরে ছিল এই মুলুক ফতেয়াবাদের শাসনকেন্দ্র। এই পরগনার পশ্চিমে ঘাঘর নদী, পূর্বে ঘণ্টেশ্বর, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে ব্যঙ্গডোড়া তক্সিম (প্রশাসনিক উপ-বিভাগ) অবধি বিস্তৃত।[১]

মহাকবি আলাওল লিখেছেন :

মুলুক ফতেহাবাদ গৌড়েতে প্রধান।
তথাতে জালালপুর অতি পুণ্যস্থান ॥[২]

আলাওল উল্লিখিত 'ফতেহাবাদ' আর বিজয় গুপ্ত উল্লিখিত 'ফতেয়াবাদ' একই পরগনার নাম। 'বাহরিস্তান গায়বী' থেকে জানা যায় 'মধ্যযুগে ফতেহাবাদ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি পরগনা ছিল।[৩] কবি আরবি শব্দ 'তক্সিম' এর 'তক' অর্থে "পর্যন্ত" ও 'সিম' অর্থে "সীমা"কে বুঝিয়েছেন। 'তক্সিমে'র ইংরেজি division,[৪] অর্থাৎ প্রশাসনিক উপ-বিভাগ বোঝান হয়েছে। কবির গ্রামে বাস করত

Dhaka University Institutional Repository

নানা বর্ণের মানুষ–চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ, চিকিৎসাশাস্ত্রকুশল বৈদ্য, লিখনপটু কায়স্থ ছাড়াও নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জাতের মানুষ। ফুলশ্রী গ্রামের পশ্চিমে যে ঘাঘর নদী ও পূর্বে ঘণ্টেশ্বর নদীর নামোল্লেখ রয়েছে, তা শুকিয়ে গেলেও বিলের আকারে এখনও বর্তমান।

এই গ্রামেই কবির বাস্তুভিটার ওপর প্রতিষ্ঠিত দেবী মনসার মন্দির আছে। কবি পরমভক্ত ছিলেন দেবী মনসার আর এ জন্যেই *পদ্মাপুরাণ* কাব্য জুড়েই যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই প্রণতি জানিয়েছেন দেবী মনসাকে। বিজয় গুপ্তের বাস্তুভিটার বাড়িটি এখন মনসার বাড়ি নামেই পরিচিত। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসব্যাপী কবির এই মনসাবাড়ীর মন্দিরে মনসা-গান, রয়ানী, যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ও মেলার আয়োজন করা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ভক্তের আগমন হয় সেখানে।[৫] স্থানীয় সূত্রে জানা যায় , কবির জন্মভূমি গৈলা-ফুলশ্রীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম কুড়লিয়া নিবাসী হরি বাড়ৈ নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির জ্যেষ্ঠপুত্র প্রমানন্দ বাড়ৈকে প্রতিবছর সর্পে দংশন করত। হরি বাড়ৈ মানত করে তার বাড়িতে মনসার ঘট স্থাপন করেন এবং মন্দির নির্মাণ করে প্রতি বছরই শ্রাবণ মাসে ঘটা করে দেবী মনসার পূজা করেন। এরপর থেকে হরি বাড়ৈ এর পুত্র প্রেমানন্দ বাড়ৈকে সর্পে দংশন করেনি এবং এভাবে দেবীর পূজা সে বাড়িতে প্রচলিত হয়ে যায়। এ ধরনের অনেক ঘটনার বিবরণ জনশ্রুতিতে পাওয়া যায়। *পদ্মাপুরাণ* সঙ্কলক বসন্তকুমার ভট্টাচার্য জানিয়েছেন :

> বিজয় গুপ্তের পাঁচালী বা রয়ানী গান নামে পূর্ব্ববঙ্গের সর্বত্র প্রচারিত। শ্রাবণ মাসে অনেক পরিবারে ইহা নিয়মিত পঠিত হয় এবং আপদোদ্ধারের জন্য লোকে ইহার গান বা রয়ানী মানত করিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী রমনীগণ আজও ভাবাবেগে অশ্রুসিক্ত চক্ষে রয়ানী শ্রবণ করেন।[৬]

গৈলা ফুলশ্রী গ্রাম মনসার অভিপ্সিত স্থান। কাজেই মনসাবাড়ীটি এখানেই অবস্থিত। একটি প্রাচীন সরোবরের পূর্ব তীরবর্তী স্থানে এটি অবস্থিত। মনসা দেবীর ঘট অতি প্রাচীন এবং বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। ঘটটি কয়েকবার ঐ সরোবরে বা মানসকুণ্ডে অন্তর্হিত হয়েছিল। ঘটের পশ্চাদভাগ পিতল দ্বারা নির্মিত দেবীমূর্তি সম্পূর্ণ আধুনিক।[৭] প্রতি বছর পর্ব উপলক্ষ্যে মনসাবাড়ীতে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আগমন ঘটে। মনসা-ভক্তরা দেশ-দেশান্তর হতে রোগ-মুক্তি, সন্তান-কামনা, শত্রু-নাশ ইত্যাদি মানত করতে সমবেত হয় দেবীর পীঠস্থানে।

বসন্তকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে অমৃতলাল বালা মন্তব্য করেছেন :

> আমি ব্যক্তিগতভাবে একবার 'মনসা বাড়ি' গিয়ে এ চিত্র প্রত্যক্ষ করেছি। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি দেবীর ঘট বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত হওয়া এবং ঘট সরোবরে নিমজ্জিত হবার যে প্রসিদ্ধি আছে তা আজ জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে।[৮]

কবির কাব্য রচনার সন-তারিখ নিয়েও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যা ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কবির *মনসামঙ্গল* বা *পদ্মাপুরাণ* পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে রচিত। কাব্যের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। কবি তাঁর কাব্যের 'স্বাপ্নাধ্যায়' পালায় রচনাকাল নির্দেশক নিম্নোক্ত তথ্য দিয়েছেন :

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি তিলক ॥

(পৃষ্ঠা-৪)

বিজয় গুপ্তের কাব্যের সবচেয়ে পুরোনো মুদ্রিত সংস্করণ (প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত) থেকে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত। অঙ্কস্য বামাগতি নিয়মে ১৪০৬ শক বা ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে এটি পাওয়া যায়। সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

প্যারীমোহন দাশগুপ্ত তিনখানি পুথি অবলম্বনে পাঠ নির্ণয় করতে গিয়ে আরো দুটি রচনাকাল নির্দেশক শ্লোক পেয়েছেন :

১. ঋতুশশী বেদশশী শক পরিমিত।
২. ছায়াশূন্য বেদশশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন সাহা নৃপতি তিলক ॥[৯]

১নম্বর শ্লোক থেকে ১৪১৬ শক অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ, ২নম্বর শ্লোক থেকে ১৪০০ শক অর্থাৎ ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। কোনো কোনো পণ্ডিত বিজয় গুপ্তের কাব্যের রচনাকালজ্ঞাপক ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ এই সনটিকে সঠিক বলে মনে করেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. সুকুমার সেন, ড. জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত সংস্করণে তিনটি পুথি ব্যবহৃত হয়েছিল। তার একটিতে "ঋতু [শ] শী বেদ শশী" পাঠ আছে, অন্য দুটিতে "ঋতু শূন্য বেদ শশী" পাঠ আছে।[১০] বর্তমান গবেষণাকাজে আমি মূল গ্রন্থ হিসেবে জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত *পদ্মাপুরাণ* গ্রন্থটি ব্যবহার করেছি। সুতরাং এই গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্য উপাত্তের আলোকেই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে।

মনসামঙ্গলের কাহিনি

হরিনাম নিয়ে মন প্রফুল্ল করে বিজয় গুপ্ত শুরু করলেন দেবী মনসার জন্মবৃত্তান্ত রচনা। শিবের কৈলাসে হাজির হলো নারদ তপোধন। শিবকে দেখে মাথা নত করল। বারাণসী কেমন দেখতে প্রশ্ন করল মহাদেব, উত্তরে নারদ মুনি বলেন :

বারাণসী হেন স্থান পৃথিবীতে নাই
ভাল স্থান করিছ তোমি কাশী বারাণসী।
ইন্দ্রের অমরা হইতে অধিক হেন বাসি ॥
কাশীর যতেক গুণ কি কহিব অন্ত।
বিকশিত নানা পুষ্প পিয়ে মকরন্দ ॥
কুহু কুহু করিয়া কুকিলা গাহে সারি।
চারিদিগে বেড়িয়া মদনে করে ধারি ॥
ভাল স্থান করিছ তোমি কাশী বারাণসী।
তথায়ে মরিলে লোক হয়ে স্বর্গবাসী ॥
(মনসার জন্মপালা, পৃ. ১১)

বারাণসীর বর্ণনা দিতে গিয়েই অন্য একটি তথ্য বেরিয়ে আসে। সেটা হলো, সরযুতের দক্ষিণে একটি রম্যস্থান আছে। দেবী চণ্ডী সেখানে ফুলের বাগান করেছেন। দেবী চণ্ডী প্রতি রাতে সেখানে ডাকিনী, যোগিনীদের নিয়ে খেলা করেন। স্থানটি কাশী হতে বেশি দূরে নয়। এসব শুনে শিব হাসলেন, চণ্ডীকার পুষ্পবন আমি জানিনা? (পৃষ্ঠা-১২) নারদের কানে চুপিসারে বলেন শিব, কালকে দেখতে যাব কিন্তু দেবী যেন না জানে একথা শুনেই দিব্যরথে চড়ে চলে গেলেন নারদ। এসে পৌঁছলেন দেবী চণ্ডীকার কাছে, যথারীতি দেবী তাকে বসতে বললেন, নারদ বললেন বসে কাজ নেই , একটি কথা তোমাকে বলতে চাই।

Dhaka University Institutional Repository
সরযুতের দক্ষিণকূলে তোমার পুষ্পবন। আগামিকাল সেখানে যাবেন দেব ত্রিলোচন। একাই যাবেন সঙ্গে কেউ থাকবে না। না জানি কি হবে সেখানে গেলে। এই বলে নারদ চলে যায় নিজ দেশে।

আঁচলে আঁচল বেঁধে দেবী শিবের বামপাশে ঘুমাল। শিব চুপিসারে কোন শব্দ না করে বেড়িয়ে আসেন। নন্দীকে আদেশ করলেন বলদ সাজাতে। মাথায় ভূষণ, সর্বাঙ্গে মানিক-রতন, গলায় ঘণ্টা, বুকে,পীঠে বাধা হলো সোদরি ঘাঘর। শ্বেত দিগল চামর লেজে বাঁধা হলো। বলদের সৌন্দর্য দেখেই শিব লাফ দিয়ে বলদের পিঠে আরোহণ করলেন। চোখের পলকে শিব সরযুতের তীরে পৌঁছলেন। জালুয়া ডোমের মেয়ে গৌরী শিবকে খেয়াপার করে দিল। পুষ্পবন দেখে শিব আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। সকল ফুল ফুটে শিব-মহাদিদেবকে তুলে ধরল। চারদিকে সুগন্ধময় পরিবেশ দেখে আনন্দিত মহাদেব। হঠাৎ শিব ত্রিলোচনের আনন্দিত মন ক্রোধান্বিত হয়ে গেল :

মলয় বসন্ত বায়ে ভ্রমরা ঝঙ্কারে তায়ে
নানা পাখী করে কোলাহল ॥
মধুলোভে মত্ত কায়ে কুকিলে পঞ্চম গায়ে
ভ্রমর ভ্রমরী যায়ে সঙ্গ।
ফুটিল কমল কলি তাহা দেখি মত্ত অলি
তাহা দেখি কুপিল অনঙ্গ ॥
পূর্ব্বে যারে কৈল সেবা বৈরী পাইয়া পদ প্রভা
মধুমাস পাইয়া পুষ্পগণে।
কে বোজে দেবের মতি যে দেব সৃষ্টির পতি
হেন শিব পীড়িত মদনে ॥
কামে ব্যাকুল শিব কাতর চঞ্চল জীব
রতিলোভে হইল প্রবেশ।
কামেতে হইল ভোল শ্রীফল গাছে দিল কোল
আচম্বিতে খসে মহারস ॥

(মনসার জন্মপালা, পৃ. ১৭-১৮)

চণ্ডীর পুষ্পবনে পক্ষীযুগলের কামক্রীড়া দেখে দেবাদিদেব মহাদেব 'শিব পীড়িত মদনে' কামে ব্যাকুল হয়ে শ্রীফল বৃক্ষকে কোল দিলেন। তখন 'আচম্বিতে খসিল মহারস'। তারপর :

পদ্মপত্রে মহাধন রাখিলেক ত্রিলোচন
দূর হইতে পক্ষিণী দেখিল।
তিষ্ণায়ে হইয়া ধন্দ না বুজিল ভাল মন্দ
জল জ্ঞানে পক্ষিণী গিলিল ॥
যক্ষনে পিলেক জল ফুটিলেক বুদ্ধি বল
অগ্নি জ্বলে সকল শরীরে।
অনল সমান মনে উগারিল ততক্ষণে
আরবারে পদ্মবনে এড়ে ॥

Dhaka University Institutional Repository

সুরঙ্গে হইয়া বন্দী পাইয়া মৃণাল সন্দি
মহারস পাতালে নামিল।
প্রবেশিল পাতাল পুরী জন্মিল নাগিনী নারী
দেবকন্যা সোন্দর দেখিল ॥
বার্ত্তা পাইয়া নাগরাজে স্বর্গে ধুমধুমি বাজে
নাগরাজে পুজিল সম্ভ্রমে।
বাসুকি দিল বেবহার দিল রত্ন অলঙ্কার
যত্নে স্থাপিল পুষ্পবন।
উপজিল বিষহরি আনন্দিত দেবপুরী
প্রসন্ন হইল বসুমতী।

(মনসার জন্মপালা, পৃ. ১৮-১৯)

এই বিষহরি-ই দেবী মনসা। শিবের ঔরসে (মতান্তরে মানস-জাত) কন্যা মনসার জন্ম পদ্মবনে বলে তার আর এক নাম পদ্মা। কবি বলেছেন :

পদ্মবনে উৎপত্তি নাম হইল পদ্মাবতী
মনসা নাম থুইল নাগরাজে।

(মনসার জন্মপালা, পৃ. ২৪)

দেবী চণ্ডীর ভয়ে যুবতী মনসাকে নিয়ে শিব গৃহে ফিরতে সাহসী হননি। তাই মনসাকে 'পুষ্পের করণ্ডীর (ফুলের সাজি) মধ্যে লুকিয়ে শিব রওয়ানা করলেন সরযুর খেয়া ঘাটে। ডোমনীর ছদ্মবেশে চণ্ডীর সঙ্গে দেখা হলো শিবের। কামার্ত শিব চণ্ডীর ছলনায় ভুলে আলিঙ্গন চাইলেন; কিন্তু 'ডোমনীর মূর্তি এড়ি তখনে হইল দেবী'। শিব তাতে ভীষণভাবে লজ্জিত হন। দেবী শিবকে ভর্ৎসনা করে অন্তর্হিত হন। প্রথমবার মনসাকে দর্শনমাত্র 'কন্যার রূপ যৌবনে' শিবের 'মদন অনলে প্রাণ দহিছে।' জোড় হাতে মনসা 'রাম রাম' বলে বাপ সম্বোধন করে 'শিবের চরণে পড়ি' নিজেকে রক্ষা করেন।

দ্বিতীয়বার কামার্ত শিব ডোমনীর ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীর হাতে ধরা পড়েন। এরপর শিব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 'ঘরের মধ্যে সাজি' রেখে শিব 'জাহ্নবীর ঘাটে' স্নান করতে গেলে ইতোমধ্যে এক অনর্থ ঘটে যায়। দেবী চণ্ডী সাজির ঢাকনা খোলেন। দেখতে পান পূর্ণযৌবনা এক নারী। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হন। ক্রুদ্ধ হয়ে পুনঃ পুনঃ আঘাতে জর্জরিত করেন দেবী মনসাকে। মনসা আপন জন্মবৃত্তান্ত বলেন :

পদ্মা বলে চণ্ডী তুমি জগতের মাতা।
অবিচারে মার তুমি পাছে পাবা বেথা ॥
মন দিয়া শোন মাগ মোর কথা কই।
মাহাদেবের কন্যা আমি উদাসীন নই ॥
অবিচারে অনুচিত বলিলা অধর্ম্ম।
মহাদেবের কন্যা আমি অযুনিতে জর্ম্ম ॥
পদ্মবনে উপজিল নাম পদ্মাবতী।
তোমার ঘরে আসিল জানি বাপের সঙ্গতি ॥

(মনসাকে চণ্ডীর দর্শন ও প্রহার, পৃ. ৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

চণ্ডীর প্রহারে মনসার বাম চোখ কানা হয়ে যায়। প্রতিশোধ পরায়ণ মনসা বিষদৃষ্টিতে চণ্ডীকে মূর্ছাহত করলেও মহাদেবের অনুরোধে সে পুনর্জীবিত করে তোলে তাকে। কিন্তু চণ্ডী মনসাকে গৃহে স্থান না দেওয়ায় শিব কন্যাকে নিয়ে বের হল অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধানে। এদিকে দুর্বাশার শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীহারা হওয়ায় লক্ষ্মীর সঙ্গে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য ও ক্ষীরোদ সাগরে আশ্রয় নিলে সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হল দেবকুল। মন্দার পর্বত ও বাসুকির সহায়তায় মন্থনের কাজ শেষ হলে উঠে এল লক্ষ্মীসহ চন্দ্র, ঐরাবত প্রভৃতি। সবশেষে অমৃত হাতে নিয়ে আবির্ভূত হল ধন্বন্তরি। বিষ্ণু মোহিনী বেশ ধরে অসুরদের প্রতারিত করে সমস্ত অমৃত দেবতাদের দেওয়ায় অসন্তুষ্ট হল শিব। শেষ পর্যন্ত দেবতারা শিবের মতামতই মেনে নিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিন্তু দেবতাদের কপটতায় ক্রুদ্ধ শিবের কোপানলে বিষমিশ্রিত হয়ে পড়ল সমুদ্র। অসুর এবং বাসুকি সেখান থেকে পালিয়ে গেলে হনুমানের অনুরোধে বিষ পান করায় অচেতন হয়ে পড়ল শিব। নারদের কাছ থেকে খবর পেয়ে শোকাকুল চণ্ডী মনসার শরণাপন্ন হওয়ায় বিষমন্ত্র উচ্চারণ করে শিবকে বাঁচিয়ে তুলল মনসা। ফলত মনসার জয়ধ্বনি করল দেবতারা।

তারপর দেবতাদের অনুরোধে মনসার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল শিব। ধ্যানলব্ধ পাত্র জরৎকারু ও বশিষ্ঠকে রাজি করিয়ে দুই মেয়ের বিয়েও দেন তাদের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের রাতেই মুনি জরৎকারুর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। অতি প্রত্যূষে গঙ্গাতীর থেকে 'কুশা ও পুষ্প' এনে দেবার জন্যে মুনি মনসাকে হুকুম দেন। কিন্তু 'বাপের প্রতাপে' অহংকারী মনসা স্বামীর এ হুকুম প্রত্যাখ্যান করে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়– 'বাপের প্রতাপে আমি নানা ভোগে ভোগী'।... কোনকালে হেন কর্ম আমা হইতে নয়।' এবার মুনি রেগে মনসাকে বলেন মহাদেবের কন্যা না হলে তিনি মনসার মাথা ভেঙ্গে দিতেন। মুনির তর্জন-গর্জন শুনে মনসার কোপ বেড়ে যায়। অবশেষে :

এত শুনি ক্রোধ হইলা জগতগৌরী মাই
ক্রোধ হইয়া দেবী কহে মুনির ঠাঁই ॥
বাপুর প্রসাদে আমি রাজভোগে ভোগী।
বনপুষ্প দূর্ব্বা আমি কভো নাহি তুলি ॥
আমা নিন্দা কর তুমি দুঃক্ষিত ব্রাহ্মণ।
চক্ষু মেলি দেখ তুমি আমার বিক্রম ॥
এত বলি বিষহরি চাহে মুনির ভিতে।
ঢলিয়া পড়িল মুনি পদ্মার সাক্ষাতে ॥

(বিচ্ছেদ পালা, পৃ. ৮৬)

শিবের আদেশে মনসা মুনিকে বাঁচালেন। জীবন ফিরে পেয়ে মুনি বললেন, 'পদ্মা হেন স্ত্রীতে আমার নাহি কিছু কাম' (পৃ. ৮৯)। বনের মুনি বনে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় মনসাকে বর দিয়ে গেলেন :

এক বর দিব আমি শোহন বচন।
সত্য দিল বর তবে শুন দিয়া মন ॥
আমার সন্তান হবে তোমার উদরে।
আস্তিক হইবে নাম জগত ভিতরে ॥
তক্ষকের শাপ হইয়াছে অষ্ট নাগের তরে।
তাহারা আসি জন্ম হইব তোমার উদরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মার উদরে হাত বুলাইয়া মুনিবর।
বিদায় হইল মুনি কহিতে সত্তর ॥
(বিচ্ছেদ পালা, পৃ. ৯২-৯৩)

এভাবে মনসাদেবী আস্তিক ও অষ্টনাগের জননী হলেন। কিন্তু মনসার স্তনে অষ্ট নাগের জন্য দুগ্ধ নেই। মনসা বাধ্য হয়ে পিতার নিকট শরণাপন্ন হলেন। শিবের অনুরোধে স্বর্গের কামধেনু সুরভী গাভীর ক্ষীর-দুগ্ধে অষ্ট নাগ লালিত-পালিত হতে লাগল। কিন্তু ক্ষীরোদ মন্থনে বিষপান করে শিব একবার 'নীলকণ্ঠ' হয়েছিলেন। নতুন 'প্রমাদ' ঘটার আগেই দেবী চণ্ডী মনসাকে ত্যাগ করতে শিবের কাছে অনুরোধ করেন। মনসাকে ডেকে শিব তার সিদ্ধান্ত জানালেন। দেবী চণ্ডীর নিকট মনসা অনেক আকুতি-মিনতি জানালেন , একটু ঠাঁই দেওয়ার জন্য কিন্তু কঠিন হৃদয়ের অধিকারিণী দেবী চণ্ডী ফিরে তাকালেন না।

শিব নৌকস পর্বতে বনবাসে রেখে আসতে চায় পদ্মাকে। এই কথা শুনে পদ্মা শিবের চরণ ধরে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় অচেতন হয়ে যায়। পদ্মার সাথেসাথে পিতা শিবও কাঁদতে শুরু করেন। পদ্মা যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শিব তাকে রেখে স্নান করতে যায় :

নিদ্রা হইল পদ্মার জানিল শূলপাণি।
স্নান হেতু সরযুতে গেলা চক্রপাণি ॥
স্নান করিয়া শিব জটার তোলে জল।
তাতে এক কন্যা হইল নেতের অঞ্চল ॥
কন্যা দেখিয়া শিবের চমকিত মন।
কাহার কন্যা হই আসিল কি কারণ ॥
শিবের বচনে কন্যা কহিতে লাগিল।
তোমার বসন হইতে আমার জন্ম হইল ॥
(পদ্মার বনবাস, পৃ. ১১৩)

এই কন্যা যে সুসময়ে মিলে গেল এজন্য শিব মহা আনন্দিত হলেন। শিব কন্যাকে বলেন :

শিব বলে কন্যা তোমার নাম থুইলাম নেতা।
পদ্মার সেবা করিবা তুমি থাক গিয়া তথা ॥
(পদ্মার বনবাস, পৃ. ১১৪)

বিশ্বকর্মা সিজুয়া পর্বতে পদ্মার জন্য পুরীনির্মাণ করে দিল, নেতাকে নিয়ে পদ্মা সেখানেই থাকলো। শিবের আদেশে নির্বাসিতা 'মনসার প্রিয়পাত্র' নেতা মনসার সঙ্গেই রইল। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা কর্তৃক জয়ন্তী নগরে পুরিনির্মাণ করিয়ে জয়ন্তীর রাণী হলেন বিষহরি। আর মনসার 'বামেতে বসিল নেতা রাজকুমারী'। এবার মনসা আপন দৈব- প্রভাব, প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কাজে মন দিলেন। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই মনসার পালা শুরু।

মনসা শিবের নিকট অনুযোগ প্রকাশ করে বলে , 'মর্ত্যলোকে মোর পূজা না হল প্রচার'। শিব তখন বিশ্বকর্মাকে দিয়ে 'দিব্য ঘট' নির্মাণ করিয়ে মনসাকে দিলেন। মনসা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী রূপ ধারণ করে মাথায় ঘট নিয়ে যেখানে রাখালরা জুয়া খেলছিল সেখানে গেলেন। রাখালদের দলপতি লাটিক চণ্ডাল। তাকে মনসা পূজা করতে বললেন। লাটিক চণ্ডাল জুয়ায় যে কড়ি হারিয়েছিল, মনসার বরে তা 'পাইল আবার'। তখন লাটিক চণ্ডাল মনসার পূজা করল। ওদিকে মায়ারূপে সব গরুকে লুকিয়ে রাখলেন দেবী। গরু

Dhaka University Institutional Repository

হারিয়ে রাখালরা যখন অনেক খোঁজাখুঁজি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন 'যতীরূপ' ধরে মনসা তাদের বললেন, 'অভয়া মনসা দেবী তাঁর পূজা কর।' রাখালগণ পূজা করে তাদের অভীষ্ট লাভ করল কিন্তু 'দৈবযোগে প্রমাদ পড়িল আচম্বিত।' এই প্রমাদের বিবরণ 'হাসন-হোসেন সংবাদে' পাওয়া যায়। প্রথমে মনসার সঙ্গে তুরুক বা যবনের বিরোধ, বিরোধের পর পূজা প্রচার ও আদায় সম্ভব হয়েছে। হোসেনহাটি গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী জোলা পল্লীতে এ ঘটনা ঘটে। বনমধ্যে রাখালগণ কর্তৃক মনসাপূজা আয়োজিত তকাই মোল্লা কর্তৃক লণ্ড-ভণ্ড হলে মোল্লার ওপর সব রাখাল ঝাপিয়ে পড়ে এবং রাখালদের প্রহারে মোল্লার দেহ রক্তাক্ত হয়। মোল্লা কাজির নিকট নালিস করে। *মনসামঙ্গলে* আছে যে, এভাবেই মুসলমান কর্তৃক হিন্দু দমন-পীড়ন অভিযানে কোটি কোটি নাগ অংশগ্রহণ করে। হোসেনহাটি ও জোলা পাড়ায় মুসলমান সর্পদংশনে কাতারে কাতারে মৃত্যুবরণ করে। অবশেষে হাসন-হোসেন ও কাজি মনসার পূজা করে। দেবীর কৃপায় সবাই বেঁচে যায়। হোসেনহাটিতে মনসার পূজা প্রচারিত হলেও সবচেয়ে বড় বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দিল চাঁদ সদাগরের সঙ্গে। শৈব ধর্মাবলম্বী চাঁদ সদাগর একদিন স্বর্গের পুষ্পকাননে শিব পূজার জন্য ফুল আহরণ করতে প্রবেশ করেন। সেখানে দেবী মসনা নাগাবরণ-ভূষিতা ছিলেন। চাঁদকে দেখে সমস্ত নাগ দেবীর অঙ্গ থেকে পালিয়ে গেল, দেবী নিরাবরণ হন। তখন দেবী চাঁদ সদাগরকে অভিশাপ দেন বলেন , 'আমি শিবের কন্যা এই বলে অভিশাপ দিলাম নগরের বণিক হয়ে তুমি পৃথিবীতে জন্মাবে এবং তোমার পতন নিশ্চিত।' মহাদেবের বরে মহাজ্ঞান ও মহাশক্তির অধিকারী চাঁদ মনসার এ অভিশাপ শুনে মনসাকে ভর্ৎসনা করে বলেন , অন্যের ক্ষতি করাই তোমার কাজ, এজন্য দেবী চণ্ডী তোমায় ভালবাসে না, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর ঘরে কাটালে অর্ধরাত'। মনসার দেয়া অভিশাপ চাঁদ সদাগর মেনে নিয়ে পাল্টা অভিশাপ ছুড়ে দেয় দেবী মনসার দিকে। চাঁদ বলেন , 'অকারণে তুমি আমায় অভিশাপ দিলে। পৃথিবীতে আমি যাব তাড়াতাড়ি কিন্তু পৃথিবীতে তোমার পূজা আমি হতে দেব না। আমি জানি মহাদেবের ইচ্ছায় বিষ পানি হয়ে যায়।' এরপর চম্পক নগরে বিজয় সাধুর পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন চাঁদ সদাগর। কিন্তু চাঁদের স্ত্রী সনকা শৈশব থেকেই মনসার পূজা করে আসছে। ক্রমে সে 'ছয়' পুত্রের জননী হয়েছে। চাঁদ নিত্য শিবপূজা করেন, আর গোপনে চাঁদের স্ত্রী পরম নিষ্ঠায় মনসা পূজা করে। চাঁদ জানতে পেরে :

বার্ত্তা পাইয়া চান্দ হেতাল লইয়া হাতে।
লড় দিয়া পুরীর মধ্যে চলিল ত্বরিতে ॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে ঘটের উপরে।
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে ঘরের ভিতরে ॥

(গুয়াবাড়ী কাটাপালা, পৃ. ১৪৮)

এর ফলে চম্পক নগর থেকে মনসাপূজা দূর হয়। সেই সময় থেকেই চাঁদের সাথে পদ্মার বিবাদ নতুনভাবে শুরু হল। মনসা পিতার নিকট অভিযোগ করলে শিব স্পষ্ট জানিয়ে দেয় :

চান্দ যদি তোমা পূজা করে একচিত।
তবে সে তোমার পূজা হবে পৃথিবীত ॥
নেতারে দিয়াছি আমি তোমার তরে।
সেই জেবা বলে তাহা করিও অন্তরে ॥

(গুয়াবাড়ী কাটাপালা, পৃ. ১৫১)

মনসা নেতার উপদেশে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে চাঁদের 'নন্দনকানন' সদৃশ গুয়াবাড়ি ধ্বংস করে দিল। মনসার প্রকোপে রাজ্যের নর-নারী প্রাণ হারাল। কিন্তু চাঁদের মিত্র সঙ্কু গাড়ুরী 'মহাজ্ঞানের' অধিকারী

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। তিনি সেই মন্ত্রবলে গুয়াবাড়ি উদ্ধার করেন এবং সমস্ত মৃতকে বাঁচিয়ে দেন। মনসা কৌশলে সঙ্কু গাড়ুরীর পত্নীর নিকট থেকে তার মৃত্যুর উপায় জেনে নিয়ে তাকে বধ করেন। 'নটী বেশে' মনসা চাঁদের হৃদয় কামবানে বিদ্ধ করেন, মায়ার ছলনায় ভুলিয়ে চাঁদের 'মহাজ্ঞান' হরণ করেন। চাঁদের 'মহাজ্ঞান' অন্তর্হিত হলেও চাঁদ এবার আরো কঠিনভাবে মনসার সঙ্গে কোন্দলে জড়ালেন। মনসা কৌশলে চাঁদের হরি সাধু ও ছয় পুত্রকে দুধের মধ্যে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেন। পুত্রশোকে কাতর চাঁদ, তবুও মনসাপূজা করতে তিনি রাজী নন। কারণ মনসা তার কাছে "ধামনা ভাতারী" "লঘুজাতি কানী" ইত্যাদি (চ্যাংমুড়ী কানী- বিজয় গুপ্তের কাব্যে নেই)।

চাঁদের আদেশ যদি কখনও মনসাকে পূজা দাও তাহলে তোমার শরীরে প্রাণ থাকবে না। এই কথা শুনে মনোকষ্টে পুত্র শোকাতুরা মাতা সনকা বনবাসে গিয়ে মৃত্যু কামনা করেন। পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে সনকা। অনিদ্রা-অনাহারে কেঁদে কেঁদে কাতর হয়ে যায়। মনসা এসে চাঁদকে বলেন , তাঁর পূজা করতে। তাহলে 'মহাজ্ঞান' ছয় পুত্র সবই ফিরে পাবে সে। এবার চাঁদ ক্রোধে হেতাল দিয়ে তাড়া করেন মনসাকে। লাঠির এক আঘাতে মনসার কাঁকাল ভেঙ্গে যায়। সনকা হাজার চেষ্টা করেও চাঁদকে রাজী করাতে পারে না। ওদিকে চম্পক নগরের জেলে ঝালু-মালু দু'ভাই স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মনসার পূজা করে। মনসার বরে তারা ধনী হয়। গোপনে সনকা ঝালু-মালুদের বাড়ি গিয়ে মনসা পূজা করে। মনসা খুশী হয়ে তাকে বর দিতে চায় :

বর মাগহ সোনাই দিব পুত্র বর।
মনসার বাক্যে সোনাই হরিষ হৃদয় ॥
(বরের পালা, পৃ. ১৯১)

পুত্র বর দিয়েই মনসা অন্তর্হিত হন। কিন্তু সনকার এই বরে নাই সাধ কারণ নেতা যখন বলে 'পুত্র হলে কখনও বিবাহ করাইওনা' আবার পুত্র সন্তানের মুখদর্শন কি যে আনন্দের। এই আনন্দসুখ থেকে সনকা বঞ্চিত হতে চায় না। ওদিকে দেব সভায় নর্তক-নর্তকী অনিরুদ্ধ ঊষা মনসার মায়ার ছলে নৃত্যের তাল ভঙ্গ করার অপরাধে শিব কর্তৃক অভিশপ্ত হন।

শিব বলেন :

অবজ্ঞা করহ তুমি দেখিয়া পাগল।
মোর শাপে স্বর্গ হতে লাম ক্ষিতিতল ॥
মনুষ্য যোনিতে জন্ম লভ দুইজন।
ভোগিবা অনেক দুঃখ দুই মহাজন ॥
বাপ শ্বশুর কুল করিয়া উদ্ধার।
আমার নিকটে দুই আসিবা আরবার ॥
(অনিরুদ্ধ ঊষা হরণ ও যমযুদ্ধ, পৃ. ১৯৫)

অত্যন্ত কৌশলে শিবের এই অভিশাপকে মনসা আপন স্বার্থে কাজে লাগালেন। ঊষা-অনিরুদ্ধকে তিনি শিবের নিকট থেকে চেয়ে নিলেন। বললেন :

অনিরুদ্ধ ঊষা বাপু দেওত আমারে।
তবে যত দুঃখ মোর সব যায়ে দূরে ॥
অনিরুদ্ধ জন্মিবেক সোনকার উদরে।

Dhaka University Institutional Repository

ঊষারে জন্মাইব নিয়া উজানি নগরে ॥

(অনিরুদ্ধ ঊষাহরণ ও যমযুদ্ধ, পৃ. ১৯৬)

দেবীর প্রার্থনা শিব অনুমোদন করেন। এভাবে চম্পক নগরে চাঁদের ঘরে অনিরুদ্ধ লখিন্দর রূপে এবং ঊষা উজানী নগরে সায়বেনের ঘরে বেহুলা রূপে জন্মগ্রহণ করে। দিনে দিনে তারা বেড়ে উঠতে থাকে। ইতোমধ্যে চাঁদ 'চৌদ্দ ডিঙ্গা' সাজিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করেছেন। যাত্রাকালে মনসা আবির্ভূতা হয়ে চাঁদকে তাঁর পূজা করে বাড়ির বাহিরে পা রাখতে বললেন কিন্তু চাঁদ দেবীকে পূর্বের মতোই অপমান করে তাড়িয়ে দেন। চাঁদ বাণিজ্যে গিয়ে অল্প পুঁজিতে বিস্তর মূল্যবান দ্রব্যাদি লাভ করেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করতে থাকেন। মনসা তখন আবির্ভূতা হয়ে চাঁদের নিকট অনুরোধ করেন , তাঁকে পূজা দিতে। চাঁদ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, 'যে হাতে তিনি শঙ্কর ভবানীর পূজা দেন সেই হাতেই তিনি দুষ্ট-কানীকে পূজা দিতে অপারগ।

দেবীর ইচ্ছায় মাঝ-সমুদ্রে অসময়ে বান এল, ঝড়-মেঘ একত্রিত হল। তাতে সমুদ্র উত্তাল হল। চাঁদের 'চৌদ্দ ডিঙা'র সবকটি সমুদ্রে ডুবে গেল। চাঁদ জলে ভাসতে ভাসতে মৃতপ্রায়। মনসার মনে হল সমুদ্র বক্ষে চাঁদের মৃত্যু হলে পৃথিবীতে দেবীর পূজা হবে না, তাই আশ্রয় হিসেবে একটি কাঠের টুকরা ফেলে দিলেন। চাঁদ তা ধরতে গিয়ে যখনই বুঝলেন, এটা মনসার দান তখনই তিনি তা ধরলেন না। জলে ডুবে ভেসে অনেক কষ্টে চাঁদ তীরে পৌঁছলেন। চাঁদ বার বছর নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে অবশেষে ভিখারি বেশে নিজদেশে ফিরে এলেন। সংসারে এসে পুত্র লখিন্দরকে পেয়ে চাঁদ অতীতের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে চাইলেন। নতুন স্বপ্ন দেখলেন লখিন্দরকে নিয়ে। লখিন্দরের বিবাহের আয়োজন করলেন। চাঁদ জেনেছেন, বিবাহের রাতেই সর্পদংশনে মৃত্যু হবে, লখিন্দরের ভাগ্যে লেখা আছে। তারপরও তিনি উজানী নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিবাহ দিলেন। চাঁদ নিশ্ছিদ্র এক লৌহ বাসর নির্মাণ করিয়ে তাদের বাসররাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করলেন। মনসার আদেশে 'তারাপতি কর্মকার' সুকৌশলে বাসর ঘরের এক কোণে সূতাসম ছিদ্র করে রাখে। বাসর ঘরে নিদ্রিত লখিন্দরকে দংশন করার জন্য প্রথমে অষ্টনাগ গমন করে। তারা বেহুলার হাতে ধরা পড়ে বন্দী হয়। অষ্টনাগ বন্দী হবার পর লখিন্দরকে দংশন করার জন্য সুতার মতো ছিদ্র পথে কালীনাগ প্রবেশ করে এবং নিদ্রিত লখিন্দরের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে কামড় দেয়। কালিনাগের দংশনে প্রাণ হারাল লখিন্দর। বেহুলা মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে গাঙ্গুরীর জলে ভেলায় ভেসে স্বর্গযাত্রা করল। ভেলা ক্রমে গোদার ঘাট, অপু ডোমের ঘাট, ধোনা-মোনার ঘাট, টেটনের ঘাট অতিক্রম করে অবশেষে নেতা ধোপনীর ঘাটে এসে পৌঁছাল। বেহুলা নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল, কিন্তু মৃত স্বামীকে সমস্ত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করল।

বেহুলা মহাদেবের নিকট গমন করল। সমবেত দেবতাদের সম্মুখে বেহুলা নৃত্য পরিবেশন করল, দেবতাগণ মুগ্ধ হলেন। মহাদেব বেহুলাকে বর দিতে চাইলেন। বেহুলা বর প্রার্থনা করল স্বামী ও ছয় ভাসুরের জীবন। পার্বতী ও অন্যান্য দেব-দেবীর ইচ্ছায় মনসা লখিন্দরকে জীবিত করলেন। বেহুলার প্রার্থনা অনুযায়ী ছয় ভাসুরের জীবন, শ্বশুরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ও ধন্বন্তরী ওঝার জীবন বাঁচিয়ে ফেরত দিলেন মনসা। চাঁদ সদাগর যেন মনসার পূজা দেয় এই শর্তে মনসা সবকিছু ফেরত দিয়েছে। বেহুলাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে :

বেউলা বলে পদ্মা মাগ স্থির কর হিয়া
শ্বশুরে পূজিব তোমা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ॥

(লক্ষীন্দ্র দংশন, ভাসান, জিয়ান, পৃ. ৫১৭)

Dhaka University Institutional Repository

বেহুলা গৃহে ফিরলে সবাই আনন্দে আত্মহারা হল কিন্তু যখন বেহুলা তার অভিলাষের কথা জানাল তখনই ঘটল বিপত্তি। চাঁদ সদাগর কিছুতেই রাজী নয়। চাঁদ বলেন :

যেই হস্তে পূজি আমি শিবের চরণ।
সেই হস্তে পদ্মার পূজা করিব কেমন ॥
(লক্ষ্মীন্দ্র দংশন, ভাসান, জিয়ান, পৃ. ৫৩০)

তখনই দৈববাণী শুনতে পেলেন চাঁদ 'পদ্মাপূজা কর তুমি পুন সদাগর'। পুত্রবধূ বেহুলার প্রতি দুর্বলতা আর দৈববাণী সংযোগে 'অভ্রভেদী শালতরু বুঝি একটু স্নেহ কোমল দক্ষিণ বাতাসের স্পর্শেই ধরাশায়ী হয়।' চাঁদের জীবনে এত বড় দ্বন্দ্ব আর কোনদিন দেখা যায়নি। অবশেষে দেবী দুর্গাকে আর পদ্মাবতীকে অভিন্ন মনে করেই চাঁদ সদাগর পূজা দিতে সম্মতি দিলেন। বললেন :

বাম হস্তে পূজা আমি করিব তাহান ॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা বিরস বদন।
চান্দোরে ডাকিয়া চণ্ডী বলিলা বচন ॥
তোমার ঠাই কহি শুন চান্দ সদাগর।
এক মূর্ত্তি আমি সেই নাহি অন্য পর ॥
যেই ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।
কুবের বরুণ আদি চন্দ্র দিবাকর ॥
পদ্মা আমি দেখ তুমি হই এক মূর্ত্তি।
এ বলিয়া সাক্ষাত হইল ভগবতী ॥
এক দৃষ্টে দুইজন চাহে সদাগর।
ভিন্ন ভেদ নাহি কিছু এক সমসর ॥
এতেক দেখিয়া চান্দোর লাগে চমৎকার।
ভূমে পড়ি অষ্ট অঙ্গে করে নমস্কার ॥
(লক্ষ্মীন্দ্র দংশন, ভাসান, জিয়ান, পৃ. ৫৩৫)

এতেই মনসা খুশী হলেন, বেহুলার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা পেল। মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচলিত হল। কাল পূর্ণ হলে লখিন্দর-বেহুলা, অনিরুদ্ধ-ঊষারূপে স্বর্গারোহণ করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

মধ্যযুগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মতো এতবড় বাস্তবধর্মী জীবনবাদী কবি আর কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও নিম্নবর্ণের প্রান্তিক সাধারণ বাঙালিদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তা বিরল। মঙ্গলকাব্যের যে ইতিহাস তা প্রায় চারশো বছরেরও অধিক কালের ইতিহাস। বিভিন্ন শতাব্দীতে রচিত এইসব কাব্যের মধ্যে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র বিধৃত হয়েছে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সমাজের একটি শ্রেণির মানুষের চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-বেদনা, ভাল-মন্দকে সামগ্রিকতা দান করেছেন, সে-শ্রেণিটি অন্ত্যজ, নিম্নবর্ণের শ্রেণি। মুকুন্দরাম তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে যেসব মানুষের সমাগম ঘটিয়েছেন, সেই মানুষগুলো তাঁর দৃষ্টিবহির্ভূত কোনো মানবসন্তান নয়। তাঁর অভিজ্ঞতার রসে জারিত বলেই মানুষগুলো তাঁর কাব্যে জীবনবাস্তবতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরিব্যাপ্ত। সমাজের সমস্যাসঙ্কুল পরিমণ্ডল থেকেই তাদের আবির্ভাব। ফলে সমাজ-জীবনের বাইরে কোনো পরমাত্মার বন্দনা-মুখর বিগ্রহ নয় সেই সব মানুষ। তাই বোঝা যায়, দেবতাদের মহিমা-কীর্তন করতে গিয়েও কবি মানব-জীবনের স্বভাবগত ধর্ম বিস্মৃত হননি।

মুকুন্দরামের সমকালীন সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে মানব-মহিমার এই স্বীকৃতি কবির একক কৃতিত্ব।[১১] সুতরাং বলা যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানুষকে মানুষ হিসেবে গৌরাবান্বিত করার প্রথম কৃতিত্ব মুকুন্দরামের। কবির সৃষ্ট চরিত্রগুলো তাঁর কাব্যে এমন জীবন্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তার পেছনে আছে বাঙালির সমাজজীবন সম্পর্কে কবির ব্যাপক অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহিত্যবোধকে কতটুকুই বা স্পর্শ যায় কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল এই, কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য একদিকে যেমন অভিজ্ঞতার ফসল অন্যদিকে অলৌকিকতার যুগে ব্যতিক্রমধর্মী এক প্রচেষ্টা। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> মঙ্গলকাব্যের বিবর্ণপ্রায় শাখাটির কথা প্রথমেই মনে পড়বে। নানা রচনা কাহিনীতে, কথায় আর ভঙ্গিতে একেবারে একাকার। ব্যক্তিকে চেনা যায় না, রচনার শিল্পগুণকে স্বতন্ত্র করে বুঝে নেওয়া হয়ে পড়ে অসম্ভব। তবুও এমন শিল্পীও আছেন যাঁদের লেখা চিনে নিলে পরিশ্রম বৃথা যাবে না। চারধারের অনেক আগাছা সরিয়ে কঠিনের সাধনায় সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু রসের মূল্যে তার পুরস্কার। মুকুন্দরাম এমনি এক ব্যক্তিত্ব, এক শিল্পী।[১২]

সুবৃহৎ *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।[১৩] (১) দেবখণ্ড (২) আক্ষেটিক খণ্ড এবং (৩) বণিক খণ্ড। দেবখণ্ড স্বর্গলোকের কাহিনি কিন্তু বাকি দু'খণ্ডের কাহিনি মর্ত্যলোকের। আক্ষেটিক খণ্ড হচ্ছে কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যান এবং বণিক খণ্ডের কাহিনি ধনপতি-খুল্লনাকে নিয়ে। এই কাহিনি সম্পর্কিত তথ্যে মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত জীবনের একটি বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন :

'কবির দুই স্ত্রী বর্তমান ছিলেন'।[১৪] পত্নীদ্বয় সপত্নী বিদ্বেষের তাড়নায় হয়তো সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারেনি। সেই করুণ অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো লহনা-খুল্লনার সপত্নী বিদ্বেষ প্রকাশের বর্ণনায় কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মর্মান্তিক অবস্থাকে উপস্থিত করেছেন। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের অন্ত্যজ জীবন আলোচনার পূর্বে এর তিনটি কাহিনির সারাংশ উপস্থাপন করা আবশ্যক বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(১) দেবখণ্ড

দেবখণ্ডের প্রথমেই আছে গণেশ, মহাদেব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, শ্রীরাম, চণ্ডী, শুকদেব, চৈতন্যদেব, আদি দেব-দেবীর বন্দনা আছে। তারপরেই সৃষ্টি প্রকাশ, কীভাবে প্রজাপতির সৃষ্টিলীলা শুরু হল তারই বর্ণনা। এই সৃষ্টিধারার শুরুতেই শিবের শ্বশুর দক্ষের সঙ্গে শিবের বিরোধের চিত্র আছে। দক্ষ-যজ্ঞে শিব-নিন্দা শুনে তাঁর স্ত্রী সতী দেহ ত্যাগ করলেন, তার ফলেই সংঘটিত হল শিবের দক্ষ-যজ্ঞ নাশ। সতী পুনর্বার হিমালয়ের ঘরে জন্ম নিলেন গৌরী নামে, হিমালয় পর্বতের কন্যা বলে তাঁকে পার্বতীও বলা হয়। এই পার্বতী বা গৌরী বয়:প্রাপ্তা হলে আবার শিবকেই স্বামী হিসেবে পেতে চাইলেন, কিন্তু পত্নীহারা শিব তখন তপস্যায় রত ছিলেন। এই স্থানে কালিদাসের কুমারসম্ভবের প্রভাব আছে, কালিদাসের অনুসরণে এইখানে তারকাসুর বধের জন্য কুমার জন্মের আবশ্যকতা বর্ণিত হয়েছে। সেজন্য তপস্যারত শিবকে সংসারী হতে হয়। ঐ একই উপকরণ নিয়ে মুকুন্দরাম কিন্তু বাঙালি-পরিবারের একটি খণ্ডচিত্র নৈপুণ্যের সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের দাম্পত্য জীবন, শ্বশুরালয়ে আশ্রিত মেয়ের লাঞ্ছনা, পারিবারিক কলহ প্রভৃতির একটি রসোজ্জ্বল ছবি পৌরাণিক পটভূমির মধ্যে কবির মৌলিক প্রবণতার পরিচয় বহন করছে। দারিদ্র্যই এখানে প্রধান সমস্যা।[১৫]

শিবের তপস্যা ভঙ্গের প্রয়োজন পড়েছে তাই মদনদেবকে পাঠানো হয়। মদনদেব গৌরীকে সহায়তা করতে এসে শিবের তৃতীয় নয়ন বিচ্ছুরিত অগ্নিরাশিতে ভস্মীভূত হন। শুরু হয় মদনপত্নী রতি দেবীর বিলাপ এবং গৌরীর তপস্যা। তপস্যায় তুষ্ট শিব অবশেষে গৌরীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে বসবাস শুরু করলেন শিব। গণেশ,কার্তিকের জন্ম হল। কিন্তু ঘরজামাই থাকার কুফল শীঘ্রই দেখা দিল, মা মেনকার সঙ্গে কন্যা গৌরীর কিছুতেই বনিবনা হয় না। বাঙালির চিরাচরিত প্রথার মতো এটিও এমন যে, মা মেনকা মনে করেন, কন্যা-জামাতা সংসারের কোন কাজেই আসেনা বরং বসে বসে অন্ন ধ্বংস করেন এটা মানা যায় না। অগত্যা স্বামীসহ গৌরী কৈলাস যাত্রা করলেন। এইসব অংশ বাঙালি সমাজের বাস্তব চিত্র।

কৈলাসে গিয়ে এই গৌরীই দুর্গা, চণ্ডী, কালি ইত্যাদি নামে পরিচিতা হয়েছেন। দেবলোকে থাকতে থাকতে দেবতাদের মতোই দুর্গা বা চণ্ডীদেবী ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, তিনিও মর্ত্যবাসীদের দ্বারা পূজিতা হবেন। মর্ত্যে পূজা পেলেন ঠিকই কিন্তু শুধুমাত্র কলিঙ্গ রাজা এবং পশুদের কাছ থেকে, সবার কাছ থেকে নয়। দেবী স্থির করলেন সার্বজনীন পূজা পেতে হলে কোনো দেবতাকে শাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠাতে হবে। সেই দেবতা মর্ত্যে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে দেবী পূজা করলে তবেই সর্বস্তরে তাঁর পূজা প্রচলিত হবে। দেবী বেছে বেছে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে মর্ত্যে পাঠানোর জন্য মনস্থ করলেন কিন্তু দেবীর অনুরোধেও শিব রাজী হলেন না কারণ বিনা অপরাধে দেবপুত্রকে কেনই বা এমন শাস্তি তিনি দেবেন। শিব এমন কাজ করতে পারবেন না এটি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন। এবার দেবীচণ্ডী ছলনার আশ্রয় নিলেন ,কীটরূপ ধারণ করে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। নীলাম্বর সেই ফুল দিয়ে শিবের পায়ে অর্ঘ্য দিলেন। ফুল থেকে কীট বের হয়ে এসে শিবকে দংশন করল এবং কীট থাকা ফুলে পূজো দেবার অপরাধে শিব নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন , মর্ত্যলোকে গিয়ে ব্যাধরূপে জন্ম নাও,নীলাম্বর কালকেতু নামে জন্মগ্রহণ করলেন ধর্মকেতুর ঘরে। তার স্ত্রী ছায়াবতী ফুল্লরা নামে জন্ম নিলেন অন্য এক ব্যাধের ঘরে। এভাবেই শুরু হল মর্ত্যলোকের কাহিনি। যে কাহিনিটি কালকেতু উপাখ্যান নামে আক্ষেটিক খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) আক্ষেটিক খণ্ড - কালকেতু উপখ্যান

কালকেতু উপাখ্যানে কালকেতু নিম্নবর্ণ অন্ত্যজ শ্রেণির এক ব্যাধ বিশেষ। শৈশব থেকেই কালকেতু দুরন্ত প্রকৃতির ছিল। সে বীর ও বলিষ্ঠ শরীরের অধিকারী, সাহস ও শক্তিতে ছিল অন্যতম। সে শশারু তাড়িয়ে বেড়াত, বাটুল ছুঁড়ে পাখি শিকার করত, ভালুক-ব্যাঘ্র নিয়ে খেলা করত। শিকারে কালকেতু ছিল দক্ষ তাই গণক দেখিয়ে শুভদিনে শুভবারে তার হাতে ধনুক তুলে দেওয়া হয়েছিল। পশু শিকার ছিল তার জীবিকার একমাত্র উপায়। প্রতিদিন যা শিকারে জুটত, তাই বাজারে বিক্রি করে যা পেত, তাতেই চলত কালকেতুর দুঃখের সংসার কিন্তু এক সময় কালকেতুর জীবনে গভীর সংকট নেমে এল। তার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বনের পশুরা দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হল। দেবীর কাছে পশুরা নানা অভিযোগ উত্থাপন করল। কালকেতুর অত্যাচারে স্বজনহারা পশুরা দেবী চণ্ডীর কাছে জীবনের নিরাপত্তা প্রার্থনা করল,দেবী পশুদের আশ্বাস দিলেন । এই বিষয়টি সামন্তবাদী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে কালকেতুকে এবং শ্রমজীবী প্রজাসাধারণ হিসেবে বনের পশুদের ইঙ্গিত করে। একদিন চণ্ডী ছলনা করলেন, বনের পশুগুলোকে লুকিয়ে রাখলেন। কালকেতু সেদিন কোনও শিকার পেল না ফলে ফুল্লরার হাটে গিয়ে মাংস বিক্রি করে কিছু কিনে আনা হল না, ব্যাধ দম্পতি অনাহারেই রাত কাটাল। পরদিন পুনরায় ধনুক হাতে নিয়ে কালকেতু শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা হল। পথে অনেক মঙ্গলচিহ্ন দেখতে পেয়ে কালকেতুর মনে আশা জাগল কিন্তু হঠাৎ করে স্বর্ণগোধিকা দেখে তার মন খারাপ হয়ে গেল। পুরাণে আছে যাত্রাপথে গোধিকা দেখা শুভ নয় তাই কালকেতু অমঙ্গল কিছু হবে এই শঙ্কা করল। ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত হয়ে কালকেতু স্বর্ণগোধিকাকে ধনুর্গুণে বেঁধে ফেলল. আর মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল যে, আজ যদি কোন শিকার না মেলে তবে গোধিকাকেই পুড়িয়ে খাবে। সেদিন আর কোনো শিকার মিলল না। সন্ধ্যাবেলা নিরুপায় হয়ে কালকেতু গোধিকাসহ বাড়ি ফিরল। কালকেতুকে কোনদিন শূন্য হাতে ফিরতে দেখেনি ফুল্লরা কিন্তু আজ রিক্তহস্ত দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে। কালকেতু ফুল্লরাকে বলল গোধিকার মাংস রান্না করতে, আর বলল প্রতিবেশিনী বিমলার গৃহ থেকে কিছু খুদ ধার করে আনতে। এরপর বাসি মাংসের পসরা নিয়ে বাজারে গেল কালকেতু।

ফুল্লরা-কালকেতুর অনুপস্থিতিতে গোধিকারূপিণী চণ্ডী মুহূর্তেই লাবণ্যময়ী অপরূপ সুন্দরী এক যুবতীর রূপ ধারণ করলেন। ফুল্লরা বিমলার গৃহ থেকে ফিরে এসে দেখল অপূর্ব সুন্দরী সেই যুবতী গৃহের আঙিনায় দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। ফুল্লরা তার পরিচয় জানতে চাইল। যুবতী বললেন, কালকেতুই তাকে ধরে এনেছে এবং এখন থেকে তিনি ব্যাধ কুটিরেই থাকবেন। একথা শুনে ফুল্লরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। ভয় পেয়ে যায় ফুল্লরা পাছে এই সুন্দরীই না তার স্বামীকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। স্বামীকে বড় ভালবাসে ফুল্লরা। দুঃখের সংসারে স্বামীর প্রেমই ছিল ফুল্লরার বেঁচে থাকার একমাত্র সাহস। কিন্তু আজ যুবতীর মুখে একি কথা শুনল ফুল্লরা! যুবতী তার ঘরে যেন থাকতে না চায় সেজন্য ফুল্লরা তাকে নানা ধর্মীয় উপাখ্যান শোনায়।

নারীর ধর্ম রক্ষা করতে স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে বলে। সীতা-সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অনেক ধর্মীয় উপদেশ দিয়ে পরগৃহবাস থেকে যুবতীকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে ফুল্লরা। সংসারের বারোমাসের দুঃখের কাহিনি শোনায় ফুল্লরা কিন্তু কিছুতেই যুবতীকে নিবৃত্ত করতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর কাছে ছুটে যায় ফুল্লরা। বাজার থেকে ফিরে কালকেতু দেবী চণ্ডীর অপূর্ব লাবণ্যমীয় রূপ দেখে বিস্মিত হয়। কালকেতুও যুবতীরূপী চণ্ডী দেবীকে নিবৃত্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এবার কালকেতু তার আজন্ম লালিত সংস্কারবশে তার ধনুক দিয়ে দেবীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। এবার দেবী স্বমূর্তি ধারণ করেন। দেবীর এই রূপ দেখে কালকেতু ও ফুল্লরা বিস্মিত হল। দেবী তাঁর উদ্দেশ্য

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্ত করলেন এবং কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন ও একটি মূল্যবান আঙ্গুরি দিলেন। আঙ্গুরি বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে কালকেতু অরণ্য পরিষ্কার করে নগরপত্তন করে। নানা জাতির লোকের সমাগমে কালকেতুর গুজরাট নগর ক্রমে জনবসতিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ধূর্ত ভাঁড়ু দত্ত তার কূটকৌশল প্রয়োগ করে কালকেতুর কাছ তেকে উচ্চপদ পায়, কিন্তু পদটির সদ্ব্যবহার করতে না পারায় এক সময় কালকেতু কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়। কালকেতু কর্তৃক অপমানিত হয়ে ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গ রাজাকে প্ররোচিত করে গুজরাটের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। যুদ্ধে কালকেতু পরাস্ত হয় এবং কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। কারাগারে কালকেতু দেবীকে স্মরণ করে। দেবীচণ্ডী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, যেহেতু কালকেতু তাঁর ভক্ত। তাই অবিলম্বে কালকেতুকে মুক্তি দিয়ে তার রাজ্য ফেরত দিতে হবে। চণ্ডীর নির্দেশে কলিঙ্গরাজ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কালকেতুকে মুক্তি দিলেন। অতঃপর কালকেতু দেবী চণ্ডীর কৃপায় সুষ্ঠুভাবে রাজ্যশাসন করে গুজরাটে সুখ-সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসে। কালকেতু-ফুল্লরার সুখের সংসার একদিন শেষ হয়ে আসে। কারণ অভিশাপের কাল যে শেষ হয়ে এল। কালকেতু গুজরাটের শাসনভার পুত্র পুষ্পকেতুর হাতে সমর্পণ করল। তারপর একদিন শুভলগ্নে নীলাম্বর ও ছায়াবতী রূপ ধারণ করে কালকেতু ও ফুল্লরা স্বর্গে চলে গেল। এভাবেই শেষ হল *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের আক্ষেটিক খণ্ড–কালকেতু উপাখ্যান।

(৩) বণিক খণ্ড : ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বণিক খণ্ডটি 'ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান' নামে পরিচিত। ধনপতি একজন সদাগর। অত্যন্ত বিলাসী যুবক ধনপতির বাস উজানি নগরে। একদিন তিনি জনার্দন ওঝার সঙ্গে পায়রা উড়ানোর খেলায় মত্ত ছিলেন হঠাৎ শ্যেন পাখির তাড়া খেয়ে ধনপতির পায়রা অদূরে ক্রীড়াশীলা খুল্লনা নাম্নী এক কিশোরীর বস্ত্রাঞ্চলে আশ্রয় নিল। খুল্লনার কাছে পায়রা ফেরৎ চাইল ধনপতি কিন্তু খুল্লনা কিছুতেই পায়রা দিতে রাজী হল না। ধনপতি ছিলেন খুল্লনার খুড়তুতো ভগিনীর স্বামী। তাই শেষে ভগ্নিপতির সঙ্গে কৌতুক করে, ঠাট্টা করে পায়রা নিয়ে চলে গেল খুল্লনা।

খুল্লনা ছিল রূপসী নারী তাই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে ধনপতি জনার্দন ওঝার মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠালেন খুল্লনাকে বিয়ে করার। ধনপতির সৌন্দর্য ও অর্থ উভয়েই আছে সুতরাং সম্মতি পেতে বিলম্ব হল না। অন্যদিকে ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনা কিছুতেই সম্মত হল না বরং অভিমানিত ও ক্ষুব্ধ হল। ধনপতি তাকে অনেক বুঝালেন। লহনাকে সম্মত করাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ধনপতি তাকে একখানা পাটশাড়ী এবং চুড়ির জন্য পাঁচ তোলা স্বর্ণ উপহার দেয়ার প্রস্তাব করলেন। এই উপায়ে লহনার সম্মতি পাওয়া গেল। তারপর মহা ধুমধামে খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির বিয়ে হয়। বিয়ের পরপরই রাজার নির্দেশে পাখি রাখার জন্য সুবর্ণপিঞ্জর আনতে ধনপতিকে গৌড়বঙ্গে যেতে হল। যাবার বেলায় ধনপতি খুল্লনাকে লহনার হাতে সমর্পণ করলেন, নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে খুল্লনাকে নিরাপদে রাখবে লহনা। স্বামীর অবর্তমানে দুই সতীন ভালভাবেই দিন কাটাচ্ছিল। তাদের মধ্যে গড়ে উঠল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কিন্তু দুই সতীনের এই সুসম্পর্ক সহ্য হলো না দুর্বলা দাসীর। আপন স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় লহনা ও খুল্লনার মাঝে বৈরীভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দুর্বলা উদ্যোগী হল। লহনাকে কূট-পরামর্শ দিয়ে কানভারী করল দুর্বলা। অন্যদিকে মন্ত্রপূত ঔষধ খাওয়ানো হল খুল্লনাকে। কিন্তু কিছুতেই সে বিপথগামী হল না। অতঃপর লহনা এক জাল-পত্র পাঠাল খুল্লনার কাছে, বলা হল এই পত্রটিতে স্বামী ধনপতি খুল্লনাকে আদেশ করেছেন যে, 'আজ থেকে তুমি বনে বনে ছাগল চরাবে, ঢেঁকিশালে শয়ন করবে, এক বেলা আধপেটা আহার করবে এবং খুঁয়া বস্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

পরবে।' বুদ্ধিমতী খুল্লনা বুঝতে পারল এ পত্র ধনপতির লেখা নয় তাই পত্রানুযায়ী সে এসব কাজ করতে অস্বীকৃতি জানাল। তবে শেষ পর্যন্ত সবকিছু মেনে নিতে বাধ্য হল খুল্লনা।

যুবতী খুল্লনা সতীনের ষড়যন্ত্রে বনে বনে ছাগল চরিয়ে দিন অতিবাহিত করে কিন্তু প্রকৃতির বসন্ত মাধুরীর সাথে সাথে খুল্লনারও মনেও বসন্ত জাগে, প্রিয় স্বামীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। বসন্তের পুষ্পিত শ্যামলিমা, কোকিলের কুহুতান, ভ্রমরের গুঞ্জন সব নেমে আসে মাটির কাছাকাছি, স্বামী বিরহে যন্ত্রণাদগ্ধ হয় খুল্লনা। বসন্তের বাতাস পরশপাথরের মতো স্পর্শ করে ঘুম পাড়িয়ে দেয় খুল্লনাকে। ঘুমের মধ্যে দেবী চণ্ডী স্বপ্নে দেখা দিলেন, বললেন, 'তোর সর্বশী ছাগল শৃগালে খেয়েছে।' খুল্লনা জেগে ওঠে দেখে সত্যি সত্যিই সর্বশী ছাগল হারিয়ে গেছে তার। ছাগল খুঁজতে খুঁজতে খুল্লনা এক সময় বনমধ্যে পঞ্চ-দেবকন্যার সাক্ষাৎ পেল। সকল বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হিসেবে তারা খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা প্রদানের উপদেশ দিল। চণ্ডীপূজার বিধান তার জানা ছিল না। কারণ চণ্ডীপূজা পূর্বে প্রচলিত ছিল না। তাই পঞ্চ-কন্যার কাছে চণ্ডীপূজার বিধান শিখে নিল খুল্লনা।

বনের মধ্যেই খুল্লনা চণ্ডীপূজা সমাপ্ত করল। দেবীর কৃপায় সে ফিরে পেল সর্বশী ছাগল। দেবী চণ্ডী খুল্লনাকে স্বামী-দর্শন ও পুত্র লাভের বর দিলেন। অন্যদিকে দেবী লহনাকেও স্বপ্নে দেখা দিলেন এবং খুল্লনার প্রতি পূর্বের মতো আদর-যত্ন করতে আদেশ দিলেন। লহনার অন্তরে অনুতাপ জাগ্রত হল, প্রভাত হতে না হতেই খুল্লনার গৃহে উপস্থিত হল লহনা। দেবী চণ্ডীর আদেশ স্মরণ করে লহনা পরম যত্নে খুল্লনাকে গ্রহণ করল। উভয়ের মধ্যে পুনরায় গড়ে উঠল সুমধুর সম্পর্ক।

সুবর্ণপিঞ্জর সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ধনপতি সদাগর গৌড়ে গেছেন। দীর্ঘদিন হয়েছে তিনি সেখানে অবস্থান করছেন। সুখে-আনন্দে মত্ত হয়ে ধনপতি ঘরের কথা ভুলেই গেছেন তাই বাড়ী ফেরার কোন উদ্যোগ নেই।

খুল্লনার প্রতি অপরিসীম কৃপাবশত দেবী চণ্ডী ধনপতিকেও স্বপ্ন দেখালেন। এই স্বপ্নের মাধ্যমেই ধনপতি জানতে পারলেন খুল্লনার প্রতি লহনার অত্যাচারের কথা। কালক্ষেপণ না করে অতিসত্তর তিনি উজানি নগরের পথে রওনা হলেন। স্বামীর আগমনসংবাদ শুনে খুল্লনার মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়। সুন্দর বেশ-ভূষা ধারণ করে সে পরম আনন্দে সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছে, স্বামী সেবা করছে। ধনপতির গৃহে প্রত্যাবর্তনের কারণে অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তাদের ভোজের ব্যবস্থা করতে হবে, রান্নার ভার পড়ল খুল্লনার ওপর। চণ্ডীর বরে খুল্লনার রন্ধন সুস্বাদু ও মুখরোচক হল। নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ খুল্লনার রন্ধনের প্রশংসা করলেন।

সুখ-শান্তিতে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ধনপতির পিতৃবিয়োগ হল। পিতৃ-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানা স্থান থেকে স্বজাতিসহ অনেকেই এসেছে। শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে কে আগে মালা-চন্দন দেবে, এ নিয়ে কলহ দেখা দিল। স্বজাতিরা ধনপতিকে অপদস্থ করার একটা কারণ খুঁজছিল, তারা মনে করল এটাই উৎকৃষ্ট সময়। 'খুল্লনা যে বনে বনে ছাগল চরাতো', এই অভিযোগ তুলে তারা শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত আহার করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা না করাতে চাইলে, এর পরিবর্তে দণ্ডস্বরূপ 'এক লক্ষ টাকা' দিলে স্বজাতিরা আহার করবে–এমন কথাও তারা জানিয়ে দিল।

ধনপতি সদাগর এবার মহাবিপদের সম্মুখীন হলেন। কৃত-কর্মের জন্য তিনি লহনাকে ভর্ৎসনা করলেন। ধনপতি 'এক লক্ষ টাকা' দণ্ডস্বরূপ দিয়ে সভাসদগণের মুখ বন্ধ করতে চাইলে খুল্লনা তাতে বাধা দেয় এবং সতীত্বের পরীক্ষা দিতে চায়। এই পরীক্ষা খুল্লনার জন্য অস্তিত্ব-রক্ষার পরীক্ষা। কারণ সে জানে সতীত্বের পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হলে এই সভাসদগণই ভবিষ্যতে প্রশ্ন তুলবে খুল্লনার চরিত্রের। সুতরাং

Dhaka University Institutional Repository

শুরু হল সতীত্ব রক্ষার পরীক্ষা। খুল্লনাকে জলে ডুবিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হল, সর্প দ্বারা দংশন করা হল, প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে বিদ্ধ করা হল, অবশেষে জতুগৃহে রেখে অগ্নিসংযোগ করা হল, কিন্তু কী অবাক কাণ্ড! খুল্লনার কিছুই হল না। সে সতী, বিধায় সতীত্বের সকল পরীক্ষায় খুল্লনা উত্তীর্ণ হল। দেবীর অসীম কৃপা ছিল খুল্লনার উপর। সকলেই খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন।

সুখ-শান্তিতে আরও কিছুদিন যাওয়ার পর এবার রাজভাণ্ডারে চন্দনের অভাব দেখা দিল। ধনপতি চন্দনের খোঁজে সিংহল যাত্রা করবেন বলে মনস্থির করলেন। খুল্লনা তখন সন্তান-সম্ভবা। ধনপতি যাত্রার অশুভ লগ্ন উপেক্ষা করে নানা পণ্যে সপ্ত-ডিঙ্গা পূর্ণ করে। স্বামীর শুভযাত্রার জন্য খুল্লনা চণ্ডী পূজায় মগ্ন হল। কিন্তু স্বামী ধনপতি ছিলেন শিবভক্ত। স্বামীর কাছে খুল্লনাকে চক্ষুশূল করার ইচ্ছা আবারও লহনার মনে আসে, সে ধনপতিকে খুল্লনার চণ্ডীপূজার কথা জানিয়ে দিল। ধনপতি এ সংবাদ শোনামাত্র ক্রোধে অন্ধ হয়ে চণ্ডীকে 'ডাকিনী দেবতা' বলে আখ্যায়িত করলেন এবং চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে সিংহল যাত্রা করলেন।

দেবী বলে কথা! সামান্য ধনের অধিকারী ধনপতিকে দেবী চণ্ডীকে অপমানিত করার ফল অচিরেই পেতে হল। অকূল সমুদ্রে ধনপতি মহাবিপদে পড়লেন। চণ্ডীর নির্দেশেই সমুদ্রে ডুবে গেল তার সুশোভিত ছয় ডিঙ্গা, নষ্ট হল তার দেহকান্তি। অবশিষ্ট ডিঙ্গাটি নিয়ে তিনি বহু কষ্টে সিংহল পৌঁছলেন। সিংহল সমুদ্রে দেবী চণ্ডী ধনপতিকে 'কমলে কামিনী'র[১৬] মূর্তি দেখালেন। সিংহল পৌঁছেই ধনপতি সিংহলরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সিংহলরাজ ধনপতির পরিচয় পেয়ে তাকে যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে বন্ধুত্বের পরিচয় দিলেন।

কিন্তু ধনপতির মুখে 'কমলে কামিনী'র অদ্ভুত কাহিনি শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। সিংহলরাজ কিছুতেই ধনপতি সদাগরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিলেন না। অনেক চিন্তা ভাবনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যদি ধনপতি তাকে গভীর সমুদ্রে 'কমলে কামিনী'র মূর্তি দেখাতে পারেন, তবে তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব দেবেন, আর যদি 'কমলে কামিনী'র মূর্তি দেখাতে না দেখাতে পারেন, তবে ধনপতিকে সিংহলরাজের কারাগারে যাবজ্জীবন বন্দি হিসেবে থাকতে হবে। ধনপতি সিংহলরাজের প্রস্তাবে সম্মত হলেন আর হবেনই না কেন? নিজের চোখকে কি অবিশ্বাস করা যায়? কিন্তু দেবী চণ্ডীর ছলনায় গভীর সমুদ্রে তিনি সিংহলরাজকে 'কমলে কামিনী'র মূর্তি দেখাতে ব্যর্থ হলেন। শর্ত অনুযায়ী সিংহলরাজের কারাগারে শুরু হল ধনপতি সদাগরের বন্দিজীবন।

উজানিনগরে সন্তান-সম্ভবা স্ত্রীর কোনও খবর ধনপতি পায়নি। খুল্লনা পুত্রসন্তান জন্ম দিয়েছে, তার নাম শ্রীমন্ত, এই সুখবরও শোনে নাই ধনপতি, অদৃষ্টের একি পরিহাস! ইতোমধ্যে শ্রীমন্ত বড় হয়েছে, পাঠশালায় ভর্তিও হয়েছে। কিন্তু একদিন ঘটল এক দুর্ঘটনা। পাঠাভ্যাসকালে শ্রীমন্ত গুরু মহাশয়কে পরিহাস করল। ক্রুদ্ধ হয়ে গুরু মহাশয় শ্রীমন্তের জন্ম সম্বন্ধে কটাক্ষ করলেন। গুরুর কটাক্ষে রাগান্বিত হয়ে শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রার সিদ্ধান্ত নিল। কোনকিছুই তার গতিরোধ করতে পারল না। পিতা ধনপতির মতোই শ্রীমন্ত নানা পণ্যে সপ্তডিঙ্গা পূর্ণ করে পিতৃ-সন্ধানে সমুদ্রপথে সিংহল যাত্রা করল। বহুদূর পথ যাত্রা করে, অথৈ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অবশেষে শ্রীমন্ত সিংহল পৌঁছাল। পিতার ন্যায় সেও 'কমলে কামিনী'র অপূর্ব মূর্তি দর্শন করল। সেও সিংহল রাজের কাছে 'কমলে কামিনী'র মূর্তির কথা বলল। এবারও 'কমলে কামিনী'র মূর্তির কথা রাজা বিশ্বাস করলেন না। শ্রীমন্ত রাজাকে 'কমলে কামিনী'র মূর্তি দেখানোর কথা বললে রাজা বললেন, যদি তুমি 'কমলে কামিনী'র মূর্তি দেখাতে পারো তাহলে আমার রাজত্বের অর্ধেক তোমাকে দেবো শুধু তাই নয় আমার প্রাণপ্রিয় কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবো। আর যদি মূর্তি দেখাতে না পারো তবে তোমার শিরচ্ছেদ হবে। এবারও পিতার পরিণতিই হল শ্রীমন্তের ভাগ্যে। শ্রীমন্ত 'কমলে কামিনী' দেখাতে ব্যর্থ হল। শ্রীমন্তের শিরচ্ছেদের হুকুম জারি হল।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীমন্ত একাগ্রচিত্তে দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করল। ভূত-প্রেতসহ দেবী চণ্ডী সেখানে হাজির হলেন। ভূত-প্রেতের ভয়ে রাজার সৈন্যরা পালিয়ে গেল। দেবী চণ্ডীর কৃপায় শ্রীমন্ত প্রাণে বেঁচে গেল। শ্রীমন্ত এবার সিংহল রাজকে 'কমলে কামিনী' দেখাতে সক্ষম হল। রাজা খুব খুশী হলেন। শ্রীমন্তের চেষ্টায় পিতা ধনপতির সঙ্গে তার পরিচয় হল। শর্ত অনুযায়ী সিংহলরাজ আপন কন্যা সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ দিলেন এবং অর্ধেক রাজত্ব দান করলেন। পিতা-পুত্র কিছুদিন সিংহলে থাকার পর রাজ্য আর রাজকুমারী হাতে পেয়ে নিজগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হল। পথে দেবী চণ্ডীর কৃপায় ধনপতি ডুবে যাওয়া ছয় ডিঙ্গা ফিরে পেলেন। উজানিনগরে এসে শ্রীমন্ত উজানিনগরের রাজা বিক্রমকেশরীকে 'কমলে কামিনী'র মূর্তি দেখিয়ে মুগ্ধ করল। রাজা খুশী হয়ে কন্যা জয়াবতীর সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ দিলেন। এভাবেই দেবী চণ্ডীর কৃপা পেয়ে চণ্ডীপূজা প্রচলিত হল। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা পুনরায় স্বর্গে চলে গেলেন। ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানটি এভাবেই শেষ হল।

Dhaka University Institutional Repository

অন্নদামঙ্গল কাব্য

মঙ্গলকাব্যের বহুমুখী বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্য রচনা করলেও *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের বিষয়বস্তু এবং চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় এতে কতগুলো বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে। যেমন: *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় স্বাধীন তিনটি কাহিনি আছে। এজন্য যে সকল মঙ্গলকাব্যে একটি অখণ্ড কহিনির ভিতর দিয়ে আদ্যোপান্ত একটি রস নিবিড় হয়ে প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে, *অন্নদামঙ্গলে* সেটা সম্ভব হয়নি। ভারতচন্দ্রের জন্ম যে বংশে, সে বংশের পরিবেশ প্রাচীনকাল হতে সংস্কৃত শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে সমৃদ্ধ। স্বাভাবিক সংস্কারের উপর ভারতচন্দ্রের জীবনের ছিল বিশেষ শিক্ষা–সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা ও ফারসী ভাষা তিনি আয়ত্ব করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের বাংলার জীবনে ফারসী ও হিন্দী শিক্ষার গতি অত্যন্ত দ্রুত ছিল। ফারসী ও সংস্কৃত শব্দের প্রাণধর্ম একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির, উভয়ের ভিতর সাম্য নেই বললেই চলে কিন্তু ভারতচন্দ্রের শিল্প-নৈপুণ্যের অদ্ভূত কৃতিত্ব এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির শব্দের অপূর্ব মিল ও সামঞ্জস্য স্থাপনে। সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> ভারতচন্দ্র শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান কবি নন; তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিনিধি। পলাশীর পূর্বেকার পঞ্চাশ বৎসরের তিনি মুখপাত্র, পলাশীর পরেকার পঞ্চাশ বৎসরের তিনি আদর্শ স্থাপয়িতা এবং সাহিত্যিক কুশলতায় রবীন্দ্রনাথের যুগেও তিনি প্রমথ চৌধুরীর মতো বিদগ্ধ সমালোচকদের অকুণ্ঠিত প্রশংসাভাজন, অশ্রু বিলাসী বাঙালী জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক তিনি।[১৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দীর্ঘ দশ বছর পরিশ্রম করে অন্যান্য প্রাচীন কবিদের সঙ্গে ভারতচন্দ্রেরও জীবন-কাহিনি সংকলন করে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে মঙ্গলকাব্য বিশেষজ্ঞ শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন :

> কতিপয় প্রামাণ্য লোকের কথাই প্রধানত: এই সমস্ত বৃত্তান্তের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ যাবৎকাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের লেখকগণ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বিবরণ সঙ্কলন করিবার কালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রদত্ত বিবরণীর উপরই নির্ভর করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত অন্যান্য দিক হইতেও বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে এবং সেই প্রচেষ্টা সম্প্রতি কিছু কিছু আরম্ভও হইয়াছে।[১৮]

ভারতচন্দ্রের জন্মকাল ও জন্মস্থানের পরিচয় দিতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য আরো বলেন :

> আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান বর্ধমান জেলার ভুরসুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠ পরগণায় এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, প্রতিষ্ঠাতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ইনি ফুলিয়ার মুখটি-বংশজাত। যে বংশে বাংলার আর এক প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজা কৃষ্ণ রায় সেই বংশেরই সন্তান। রাজা কৃষ্ণ রায়ের মূল বংশ রাজা প্রতাপ নারায়ন নামে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভুরসুট পরগণায় তিনটি প্রধান গড় ছিল। ইহাদের মধ্যে ভাবানীপুরের গড়ই প্রাচীনতম এবং রাজবংশের প্রধান শাখা এখানেই বাস করিত। ভুরসট রাজ্যের দ্বিতীয় গড় ছিল পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে। রাজা কৃষ্ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্র রায় ও তাঁহার পর তাঁহারই বংশধরগণ এই গড়ের অধিকারী ছিলেন। জানিতে পারা যায় যে, সমগ্র ভুরসুট রাজ্যের ৯০ আনা অংশের ইহারা মালিক ছিলেন। ভুরসুট রাজ্যের তৃতীয় গড় দোগাছিয়ায় অবস্থিত ছিল। ইঁহারাও ৯০ আনা অংশে মালিক ছিলেন। রাজা কৃষ্ণ রায়ের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায় হইতে এই শাখার উৎপত্তি। রাজবংশের যে শাখা

Dhaka University Institutional Repository

ভুরসুট রাজ্যের দ্বিতীয় গড় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে অবস্থিত ছিল সেই শাখাতেই কবি ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়।[১৯]

ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ জমিদারী সূত্রে 'রায়' উপাধি লাভ করেছিলেন। ভারতচন্দ্র পিতার কনিষ্ঠ পুত্র; ইতোমধ্যে বর্ধমানের রাজাদের কোঁপে তাঁর পিতা বিষয় সম্পত্তি সব হারান। তখন ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে আশ্রয় পান। প্রথম শিক্ষারম্ভ করেন সংস্কৃতে; ব্যাকরণ অভিধান শেষ করে চতুর্দশ বৎসর বয়সেই তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।[২০] জমিদারী-ঐতিহ্য অনুসারে কবি ভারতচন্দ্র এবার ফার্সীতে শিক্ষালাভ করতে যান দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে। এরপর বর্ধমানে আসেন বিষয়-সম্পত্তি তদারকীর কাজে। ইতোমধ্যে বর্ধমানের রাজারা 'রায়'দের ইজারা-তালুক খাশ করে নিয়েছিলেন। আমলাদের চক্রান্ত তিনি বর্ধমানে কারারুদ্ধ হন। কোনোক্রমে পালানোর সুযোগ পেয়ে তিনি বর্ধমান থেকে সেই রাজ্য ছেড়ে একেবারে কটক হয়ে পুরী চলে যান।

কবির কাছে এই জীবন বৈরাগীর মতো মনে হয়, আশ্চর্য নয় সত্য যে, তিনি তখন বৈরাগ্য-সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। বৈষ্ণববেশে সংসারবিরাগী হয়ে তিনি তখন যাত্রা করেন বৃন্দাবনে। পথে খানাকুলে কুটুম্ববাড়ির লোকেরা কবিকে চিনে ফেলে সুতরাং ভারতচন্দ্রের আর বৈরাগী-সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভব হল না। তিনি শ্বশুরবাড়ি হয়ে স্বগৃহে ফিরে এলেন। বর্গীদের হামলায় দেশে তখন অরাজকতা বিরাজ করছে। ভারতচন্দ্র বিষয়ান্বেষণে ফরাসডাঙার ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর কিছুদিন উমেদারি করতে শুরু করলেন। তারই সুপারিশে তিনি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাস্দ নিযুক্ত হলেন। কবির কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে উপাধি দিলেন 'রায়গুণাকর'। কৃষ্ণচন্দ্রের কথায় তাঁর অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষ্য করে কবি লেখেন কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের ও তাঁর স্থাপিত সেই রাজবংশের প্রশস্তি। সেই গ্রন্থের নাম *অন্নদামঙ্গল*।

অন্নদামঙ্গল কাব্য তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই তিন খণ্ড তিনটি স্বতন্ত্র কাব্য, মুকুন্দরামের *কবিকঙ্কণ চণ্ডীর* অনুকরণে ভারতচন্দ্র প্রথম খণ্ড রচনা করেন। দ্বিতীয় খণ্ডে কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহের বাংলা আক্রমণ ও প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড : অন্নপূর্ণামঙ্গল

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডে দেবদেবীর বন্দনা ও কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনের পরে গীত আরম্ভ হয়। প্রথমেই পঞ্চদেবতা ও লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা বন্দনা, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-বর্ণনা, সতীর দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, প্রসূতির স্তবে দক্ষের পুনর্জীবন লাভ, একান্ন পীঠের বর্ণনা, শিব বিবাহের মন্ত্রণা, নারদ কর্তৃক শিবের বিবাহ-সম্বন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মদনভস্ম, রতি-বিলাপ, রতির প্রতি দৈববাণী, শিবের হিমালয় যাত্রা, শিবের বিবাহ, শিব নিন্দা, শিবের মোহিনীমূর্তি ধারণ, সিদ্ধি-ভক্ষণ, হর-গৌরীর কথোপকথন, হর-গৌরীর বিবাদ সূচনা, হর-গৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ, সখী জয়ার উপদেশ, দেবী অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, শিবের ভিক্ষায় যাত্রা, ভিক্ষুক শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ, শিবকে অন্নদান, অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য, শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা, বিশ্বকর্মার প্রতি পুরী নির্মাণের অনুমতি, অন্নপূর্ণার পুরী নির্মাণ, দেবগণের নিমন্ত্রণ, শিবের পঞ্চতপ, ব্রাহ্মাদি দেবগণের তপ, অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, শিবের অন্নদাপূজা, অন্নদার বরদান, ব্যাসের পরিচয়, বেদব্যাস কর্তৃক শিব পূজা নিষেধ, শিব-স্তোত্র, ঋষিগণের কাশীযাত্রা, হরি-সঙ্কীর্তন, ব্যাসের শিব নিন্দা, ব্যাসের ভিক্ষা বারণ, কাশীবাসী লোকের প্রতি বেদব্যাসের শাপ, অন্নদার মোহিনী রূপ, শিব ও ব্যাসের কথোপকথন, ব্যাসের দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগ, গঙ্গাকর্তৃক ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি, ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার, গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার, বিশ্বকর্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন, ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য, অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসকে ছলনা, ব্যাসের প্রতি দৈববাণী, কুবেরের পুত্র বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ, বসুন্ধরের বিনয়, অন্নদার শাপে বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, হরিহোড়ের প্রতি অন্নদার দয়া, হরিহোড়ের প্রতি বর দান, বসুন্ধরার জন্ম, কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরের প্রতি অন্নদার শাপ, মর্ত্যলোকে নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্ম, অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা ইত্যাদি বিষয় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত হয়েছে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের এই খণ্ডের লৌকিক অংশটুকু কাহিনির দিক দিয়ে মৌলিকতা দাবী করতে পারে। দেবী অন্নপূর্ণা মর্ত্যে পূজা প্রচারের সঙ্কল্প করে সখী জয়া ও বিজয়াকে এর উপায় নির্দেশ করলেন। উত্তরে তারা বললেন যে, 'কুবের তোমার পূজা করতে চাইলে অনুচর বসুন্ধরের উপর ফুল তোলবার ভার দেবে তবে তার পুষ্পবনে রমণী সম্ভোগের কারণে তুমি তাকে অভিশাপ দেবে এই বলে যে, সে মর্ত্যলোকে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করবে।' তুমি তাকে ধন-প্রাপ্তিরও বর দেবে কারণ এতে তোমার পূজার প্রচার সম্ভব হবে। কুবেরের পুত্রকেও তুমি শাপ দেবে যেন সে ভবানন্দ নামে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। হরিহোড়কে পরিত্যাগ করে তুমি ভবানন্দের গৃহে যাবে কারণ এভাবেই তোমার পূজার প্রচার হবে। তার বংশে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করবেন তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সঙ্কট হতে উদ্ধার করবে। এভাবেই তোমার পূজার ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটবে। জয়া-বিজয়ার পরামর্শ মত অন্নপূর্ণা তাই করলেন ফলে মর্ত্যলোকে দেবী অন্নপূর্ণার পূজার প্রচার হল।

এই খণ্ডের বসুন্ধরের কাহিনিতে অন্ত্যজ শ্রেণির রূপ পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের বাগুয়ান পরগনার বড়গাছি গ্রামে অন্নদা এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সখী জয়াকে বললেন :

এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া ॥
তার ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর।
বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর।
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯২)

এমন সময় এক হতদরিদ্রা রমণীকে দেখলেন দেবী। তার নাম পদ্মিনী, সৎকায়স্ত বংশের বধূ, কিন্তু দারিদ্র্যের শেষ নেই। কবির বর্ণনায় সে চিত্র :

হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায় ॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন ॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম সার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার ॥
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯২)

এরপর,

বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা।
কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা ॥
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৩)

Dhaka University Institutional Repository

যথাসময়ে তার গর্ভে বসুন্ধরের জন্ম হল। বসুন্ধরের নাম হল হরিহোড়। একদিন হরিহোড় ঘুঁটে কুড়াতে বের হয়ে একটিও ঘুঁটে পেল না। অবশেষে এক বৃদ্ধার দেখা পেল যার কাছে অনেক ঘুঁটে ছিল। বৃদ্ধা হরিহোড়কে ঘুঁটেগুলো বহন করতে বলল। সন্ধ্যা আসন্ন দেখে কাছেই হরিহোড়ের ঘরে ঘুঁটেসহ বৃদ্ধা উপস্থিত হল। বৃদ্ধা বলল, আজ রাত এখানেই কাটাবো, হরিহোড় এবার মহাবিপদের সম্মুখীন হল এইভেবে যে, ঘরে তার একমুঠো খুদ নেই, কি দিয়ে অতিথি সেবা করবে, কোথায় শয়নের ব্যবস্থা করবে। হরিহোড়ের চিন্তার শেষ নেই :

ভাঙা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে ॥
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৬)

শেষ পর্যন্ত দেবীঅন্নদা বললেন :

দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে বর দিতে।
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০০)

হরিহোড় ধন গ্রহণ করার পূর্বে দেবীকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল :

তবে লব ধন আগে দেহ এই বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর ॥
কিঞ্চিত ভাবিয়া দেবী তথাস্তু বলিলা।
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০১)

দেবীঅন্নদা এবার স্থির করলেন কুবের পুত্রকে মর্ত্যে পাঠাবেন, বসুন্ধরকে স্বর্গে ফিরে আনবেন। কুবেরপুত্র নলকুবেরকে অভিশাপ দিয়ে ভবানন্দরূপে মর্ত্যে পাঠালেন দেবী। তারপর একদিন হরিহোড়কে ছলনা করে দেবী ভবানন্দ-গৃহে যাত্রা করলেন, সেখানে ঈশ্বরী পাটনীর সঙ্গে দেবীর সাক্ষাৎ হল। দেবীর কাছে ঈশ্বরী পাটনী বর চাইলেন কারণ :

> চিরাচরিত জীবনধারার মধ্যে একটা ক্রমাগ্রসর বিপর্যয়ের পদধ্বনি শুনা যাইতেছে, সমসাময়িক সামাজিক চিত্রের মধ্যে তাহার আভাস সুস্পষ্ট। এই ধরনের অবস্থার মধ্যে সমাজজীবনের নানা অনাচার ও অব্যবস্থা, নানা ফাঁক ও ফাঁকি অনিবার্য। এইসব অনাচার, অবিচার, ফাঁক ও ফাঁকি কাহারও চোখে ধরা পড়ে নাই, একথা বলিবার মতো সাক্ষ্য প্রমাণ যেমন কিছু নাই, তেমনি ধরা পড়িয়াছিল, তাহা বলিবার মতো সাক্ষ্যও নাই। নানা ফাঁকি ও ফাঁক নানা অনাচার ও অবিচার, নানা ছলাকলা, নানা অভাব-অভিযোগ যেন জনসাধারণের স্বভাব ও চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।[২১]

দ্বিতীয় খণ্ড : বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল

দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতে মানসিংহের বাঙলায় আগমন ঘটে। প্রতাপাদিত্যকে দমন করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু বর্ধমানে এসেই মানসিংহ কানুনগো ভবানন্দ মজুমদারের কাছে শুনতে চাইলেন *বিদ্যাসুন্দরের* কাহিনি। সমগ্র খণ্ডের মধ্যে *বিদ্যাসুন্দর* শুনতে শুনতে রাজা মানসিংহের বা কবির কেউই মনে করতে পারেন না মূল আখ্যান কী। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন :

> কালিকার মাহাত্ম্য-কীর্তনও নিতান্ত গৌণ, 'আসলে বিদ্যা ও সুন্দরের সুরঙ্গ-ভেদী প্রণয়-কাহিনীই ঐ খণ্ডে কবির মুখ্য অবলম্বন।'[২২]

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি

বর্ধমানের রাজা বীর সিংহের কন্যা বিদ্যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বিচারে যে তাকে জয় করতে পারবে সেই হবে তার পতি। কেউ তাকে হারাতে পারে না তাই বিবাহও করতে পারে না। রাজা গোপনে ভাট পাঠালেন কাঞ্চীতে, কাঞ্চীর রাজা গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দর যেমনি অসাধারণ পণ্ডিত তেমনি সুদর্শন যুবক। ভাটের কাছে বিদ্যার খ্যাতি শুনে সুন্দরও এলেন পড়ুয়ারূপে বর্ধমানে। সুন্দর বর্ধমানে প্রবেশ করে তার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হল। কবির ভাষায় :

দেখি পুরী বর্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।
(অন্নদামঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ০৭)

সুন্দরের বর্ধমান দর্শনের পাশাপাশি সুন্দরকে দেখে নাগরীগণের খেদ :

আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগরপারে ॥
(অন্নদামঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬)

এদিকে সুন্দরের সঙ্গে ঘটল রাজবাটীর মালিনীর সাক্ষাৎ 'বাঙলা সাহিত্যে মালিনী (কুট্টনীরই উত্তরাধিকারিণী) অনেক আগেই পরিচিতি পেয়েছে কিন্তু হীরা মালিনী তাদের চূড়ান্ত পরিণতি।[২৩] বিদ্যার খোঁজ-খবর পাওয়ার আশায় সুন্দর হীরা মালিনীর ঘরে বাসা ভাড়া নিলেন। মাল্য রচনা করে শ্লোক রচনা করে হীরার হাতে পাঠালেন সেই 'করভোরু রতি প্রাজ্ঞার উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য ব্যর্থ না হয়ে বরং বিদ্যার কাছ থেকে এল তেমনি শ্লোকে রচিত উত্তর। এরপর মালিনীর সহযোগিতায় একের পর এক কার্য সমাধা হতে শুরু করল। প্রথম উভয়ের দর্শন, সুড়ঙ্গপথে একেবারে রাজকন্যার গৃহে সুন্দরের উদয়, উভয়ের কৌতুকারম্ভ, বিচার, গন্ধর্ব-বিবাহ, বিহার। ফলে বিদ্যার গর্ভ, রাণীর কন্যাকে তিরস্কার, রাজার ক্রোধ, রাজাদেশে কোটালের চোর ধরা, বিদ্যার আক্ষেপ, বন্দী সুন্দরকে দেখে নারীগণের পতিনিন্দা; 'রাজার নিকট চোরের শ্লোকপাঠ' এদিকে মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি, কালীর অভয়দান, সুন্দর-কৃপায় বীরসিংহের দিব্যজ্ঞান লাভ এবং বিদ্যা ও সুন্দরের পুনর্মিলনের শেষে বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশ যাত্রা', এইরূপে দ্বিতীয় খণ্ডটি সমাপ্ত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড : মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান

ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যটির পরিচয় দিতে গিয়ে মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম যুক্ত করেছেন, তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনি নিয়ে তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের তৃতীয় খণ্ড অর্থাৎ 'মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান' রচিত। বাংলা ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা নিয়ে *চণ্ডীমঙ্গলের* কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও বলার চেষ্টা করেছেন। তিনি মানসিংহের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন। মানসিংহের সঙ্গে বাংলার বারভূঞার যুদ্ধের বৃত্তান্ত বাংলার ইতিহাসের অতি মূল্যবান সম্পদ। ভারতচন্দ্র এই সম্পদ তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন ঐতিহাসিক সত্যের বিচারে নয় কাব্যকে শিল্পোত্তীর্ণ করতে শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিকে তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছেন। মানসিংহ ব্যতীত এই কাব্যে জাহাঙ্গীর, প্রতাপাদিত্য, ভবানন্দ প্রমুখ ঐতিহাসিক

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রের সঙ্গেও আমরা পরিচিত হই। প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের দিক বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে, জাহাঙ্গীর সম্পর্কে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য এই কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং তাঁর সম্পর্কে যা পাওয়া যায়, তা ইতিহাস-বিরোধী। এ সম্পর্কে সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> মানসিংহ কাব্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য-কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মহিমা-কীর্তন। এমনকি অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনাও নহে, কিংবা ইতিহাসেরও মর্যাদা রক্ষা নহে। নবদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য তিনি মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন–ইহাই প্রধানত মানসিংহ-কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।[২৪]

অন্নদামঙ্গল কাব্যের মূল কাহিনির মধ্যে প্রতাপাদিত্যের কোনও স্থান নাই, কেবল মানসিংহের স্তুতি করার জন্যই প্রতাপাদিত্যের অবতারণা করা হয়েছে। কাহিনির ঐতিহাসিক অংশটির সংক্ষিপ্ত রূপ হল : যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক বসন্ত রায়ের হত্যার পর বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায় দিল্লীতে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্যকে দমন করবার জন্য মানসিংহকে বাংলায় পাঠালেন। কচু রায়কে সঙ্গে নিয়ে মানসিংহ বর্ধমান পর্যন্ত আসলেন। ভবানন্দ মজুমদার তখন সামান্য একজন কানুনগোর কাজ করতেন, তিনি বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে মানসিংহকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের বিস্তৃত অবস্থা তাঁকে জানালেন।

যশোরের পথে মানসিংহ বাগোয়ান এসে পৌঁছলেন, বাগোয়ানে ভবানন্দ মজুমদারের নিবাস ছিল। এখানে এসে ঝড়-বাদলে মানসিংহের সৈন্যগণ বিড়ম্বনায় পড়ল। ভবানন্দ মানসিংহকে এই বিপদে সাহায্য করলেন। যশোর যাওয়ার সময় মানসিংহ ভাবনন্দকে সঙ্গে করে নিলেন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করলেন এবং তাঁকে নিয়ে দিল্লীর পথে ফিরে চলে গেলেন। ভবানন্দও তাঁদের সঙ্গী হলেন। পথিমধ্যে অনাহারে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হল। ভবানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত মানসিংহ তাঁকে জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত করলেন। মানসিংহের কাছ থেকে সকল বৃত্তান্ত শুনে জাহাঙ্গীর ভাবনন্দকে 'রাজা-ই ফরমান্' দিলেন।[২৫] দিল্লীশ্বরের ফরমান নিয়ে ভবানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। কবি অন্নদার মুখ দিয়ে ভবানন্দের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কিছুটা ঐতিহাসিক সত্য আছে। 'রাজ-ই ফরমান' সম্পর্কে কাব্যে আছে :

অন্নপূর্ণা নামে দেবী তাঁহার চরণ সেবি
কেরামত কামাল ইহার।
সে দেবীর পূজা দিয়া ঝড় বৃষ্টি মিটাইয়া
যোগাইল সকলে আহার ॥
রাজ্য দিব কহিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি
গোলাম কবুলে পার পায়।
স্বদেশে রাজাই পায় দোয়া দিয়া ঘরে যায়
ফরমান ফরমাহ তায় ॥
দেখা কৈল হজরতে বজা আনে খেদমতে
গোলামের এ বড়ই নাম।

(অন্নদামঙ্গল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫-১৮৬)

Dhaka University Institutional Repository

'মানসিংহ-ভবানন্দ' উপাখ্যানের ঐতিহাসিক অংশটি কবি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য ইতিহাস-কীর্তন নয় বরং কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের মহিমা-কীর্তন। মানসিংহ যখন বর্ধমানে আসেন, তখন ভবানন্দ তাঁর সঙ্গে গিয়ে হয়ত সাক্ষাৎ করেছিলেন তখন তিনি মুঘল সম্রাটের অধীনে দুই-তিনটি পরগণার জমিদার ও হুগলীর কানুনগো ছিলেন। এই সূত্রেই মানসিংহকে তাঁর অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করা সম্ভব। মানসিংহের বাগোয়ান যাওয়া সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ভবানন্দ মানসিংহের নিকট হতে তাঁর বিস্তৃত জমিদারী লাভ করেছিলেন, এটাও ঐতিহাসিক সত্য নয়। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষরিত যে দুটি 'ফরমান' কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে এখন পর্যন্ত রক্ষিত আছে, তাদের প্রথমটির তারিখ ১৬০৬ খ্রি. এটা হতে জানা যায় যে, ভবানন্দ মানসিংহের নিকট হতে মাহমুদপুর নামক একটি পরগনা লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অভিমত :

> তাঁহার জমিদারীর সংলগ্ন এই সাধারণ জনবিরল পরগণাটি ভবানন্দ স্বাভাবিকভাবেই পাইয়াছিলেন–এইজন্য প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন সাহায্যদানের প্রয়োজন হয় নাই।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধর্মমঙ্গল কাব্য

মঙ্গলকাব্য ধারায় ধর্মঠাকুর নামে কোন এক পুরুষ দেবতার পূজা হিন্দু সমাজের নিচুস্তর তথা অন্ত্যজ শ্রেণির লোকদের মধ্যে বিশেষত 'ডোম' সমাজে প্রচলিত রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, ধর্মঠাকুর হলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রচ্ছন্ন রূপ তবে আধুনিক পণ্ডিতেরা তাকে বৌদ্ধ দেবতার না বলে সুদূর বৈদিক যুগের দেবতা রূপে বিবেচনা করেন। রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুর এখনও জাগ্রত দেবতা, এখনও তাকে স্মরণ করে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য মহাসমারোহে তার পূজা হয়ে থাকে। ধর্মঠাকুরকে কখনও বিষ্ণু, কখনও শিব, কখনও বুদ্ধরূপে প্রচার করা হলেও তিনি অনার্য দেবতা এবং অনার্য ডোমদের দ্বারাই পূজিত। আর্য সমাজে ধর্মঠাকুর গৃহীত হলেও মনসা, চণ্ডীর মত মর্যাদা পাননি। শূকর, ছাগল, সাদা মোরগ, পায়রা মদ ইত্যাদি ধর্মঠাকুরের পূজার উপকরণ। ধর্মঠাকুর গ্রাম দেবতা, মাঠেই তার আস্তানা। স্থানভেদে তার নামও বৈচিত্র্যময়, বাকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, কালু রায়, বুড়া রায় ইত্যাদি। *ধর্মমঙ্গল* ও ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত সমালোচকের অভিমত :

> ধর্মঠাকুর পূজার উৎপত্তির বিষয় কেহ কেহ অনুমান করেন, ডোম জাতীয় রামাই পণ্ডিত উহার প্রবর্তক ও প্রথম প্রচারক। রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মঠাকুর বিষয়ে কয়েকটি খণ্ড খণ্ড কাব্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করেন। রামাই পণ্ডিতের কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত আছে, কোন কোন গবেষক মন্তব্য করছেন তিনি খ্রিঃ ১০০০ সালে, অন্যেরা বলেন খ্রিঃ ১৫০০ শতকের লোক ছিলেন। ...পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বহু ধর্মমঙ্গলের কবিদের রচনা পাওয়া গিয়েছে, মুদ্রিতও হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রূপরাম, মাণিক গাঙ্গুলি, ক্ষেমান্দ, রামদাস, সহদেব প্রভৃতি। ইঁহাদের রচিত কয়েকটি ধর্মমঙ্গল কাব্য এত উচ্চস্তরের যে সেগুলি বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী ও অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকার করতে হয়। কোন কোন ধর্মমঙ্গলে পাল যুগের কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয়ে উল্লেখ করছি, কলকাতা শহর হবার আগে এর কেন্দ্রস্থলে ধর্মঠাকুরের পূজার একটি কেন্দ্র ছিল, যে কারণে ওই স্থানের নাম হয় 'ধর্মতলা' পরে এ অঞ্চলের রাস্তাটি 'ধর্মতলা স্ট্রিট' নামে অভিহিত হয়, বর্তমানে লেলিন সরণি নাম হয়েছে। আদি কলকাতার ধর্মঠাকুর এখনও আছেন। রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের উত্তরে 'বাঁকা রায়' নামে পূজিত হন।[২৭]

ধর্মঠাকুর প্রধানত দাতা, নিঃসন্তান নারীকে সন্তান দান করেন, অনাবৃষ্টি হলে ফসল দেন, কুষ্ঠরোগীকে রোগ থেকে মুক্ত করেন। ধর্মঠাকুর ক্রুদ্ধ হলে কুষ্ঠ হয়। তিনি নিরাকার হলেও সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ বা ফকিরের বেশ ধারণ করেন। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের ধারার সূত্রপাত হয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের দুটি কাহিনি–

১. রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি এবং
২. লাউসেনের কাহিনি

এর মধ্যে লাউসেনের কাহিনিই *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের উপজীব্য বিষয়,অধিকতর প্রাধান্যের সৃষ্টিকর্ম।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি

রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তার রাণী মদনাবতী নিঃসন্তান ছিলেন বলে লজ্জায় মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারছিলেন না। কবির বর্ণনা :

রাজার ভার্যার নাম রাণী মদনাবতী।
বয়স বহিল তবু না হল সন্ততি ॥
স্ত্রী পুরুষে দুঁহে দুঃখ ভাবে দিবানিশি।

Dhaka University Institutional Repository

পুত্রহীন ব্যক্তি হয়ে প্রেতলোকবাসী ॥
আত্মজ বিহনে আত্মা অকারণে রাখি।
পরকালে পুত্র বিনে পার নাহি দেখি ॥
এইরূপ আক্ষেপ করয়ে রাজরাণী।
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৫০)

মনের দুঃখে তারা ঘুরতে ঘুরতে বল্লুকা নদীর তীরে এসে দেখলেন সেখানে ভক্তেরা ধর্মের পূজা করছে। রাজারাণীও ধর্মের পূজা করে তার কাছে পুত্রবর প্রার্থনা করলেন। ধর্ম তাদের পুত্র লাভের বর দিলেন।

কবির বর্ণনা :

প্রাণ দান দিলে যদি প্রভূ পরাৎপর।
পুরহ বাসনা মোর দিয়ে পুত্রবর ॥
ধর্ম কন ধেয়ে শুন বর যদি লবে।
কহ তবে পুত্র হলে আমাকে কি দিবে ॥
অচলা ঈশ্বর কন এই পদ সার।
আমি কি কহিব কহ কি ইচ্ছা তোমার ॥
পুনরপি প্রভূ কন পার যদি তবে।
পুত্র হলে দ্বাদশ বৎসরে বলি দিবে ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৫৪-৫৫)

রাজা পুত্রের মুখ দেখার আশায় তাতেই রাজি হলেন। পুত্র জন্মালে তার নাম রাখা হল লুইচন্দ্র বা লুইধর। এক সময় রাজারাণী প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন। একদিন ব্রাহ্মণের বেশে ধর্মঠাকুর উপস্থিত হয়ে রাজপুত্রের মাংস ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা জানালেন। কবির ভাষায় :

ভূপতির ভাব বুঝে ভূলোকেশ কন।
অপর মাংসেতে কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
পুত্র হলে বলি দিব পূর্বে বলেছিলে।
পূর্ণ হয় পারণ তাহার মাংস পেল্যে ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৬২)

রাজারাণী প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে পুত্রের দেহ কেটে মাংস রান্না করলেন। এতে ধর্মঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে নিজমূর্তি ধারণ করে রাজপুত্রকে ফিরিয়ে দিলেন। রাজা মহাসমারোহে ধর্মের পূজা করলেন।

লাউসেনের কাহিনি

বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্বে *ধর্মমঙ্গল* কাব্য সর্বাপেক্ষা পূর্বগামী। 'প্রায় প্রত্যেক *ধর্মমঙ্গলের* ঘটনার কাল নির্দেশ রূপে ধর্মপাল ও তার পুত্রে রনাম উল্লিখিত হয়েছে।[২৮] সম্রাট ধর্মপালের মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন তার পুত্র। রাজার শ্যালক মহামদ পাত্র শঠ কুচক্রী অকৃতজ্ঞ প্রকৃতির হলেও তারই বশীভূত ছিলেন গৌড়েশ্বর। একদিন তিনি শিকারে যাওয়ার সময় দেখলেন মন্ত্রী মহামদ পাত্রের ষড়যন্ত্রে কারারুদ্ধ হয়েছে তারই অনুগত সোম ঘোষ। সোম ঘোষকে কারামুক্ত করে পাঠানো হলো নিজের অনুগত সামন্তগড়ের

Dhaka University Institutional Repository

শাসক কর্ণসেনের কাছে। ইছাই নামে সোম ঘোষের পুত্র দেবী চণ্ডীর বরে পরাক্রমশালী হয়ে কর্ণসেনের প্রাসাদ আক্রমণ করে বিতাড়িত করল তাকে। নতুন গড় নির্মাণ করল ইছাই, নাম তার ঢেকুর গড়। এদিকে কর্ণসেন স্বপরিবারে গৌড়ে আশ্রয় নিলে রাজা গৌড়েশ্বর সামন্তের দুর্দশা দেখে নয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করল ঢেকুর। কিন্তু প্রকৃতির করাল গ্রাসে তার বহু সৈন্য প্রাণ দিল। কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হল; সহমরণে গেল পুত্রবধূরা। শোকে দুঃখে আত্মঘাতিনী হল রাণী। বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়ে কোন রকমে দিন কেটে যায় কর্ণসেনের। তার দুরবস্থা গৌড়েশ্বরকে ব্যথিত করায় তিনি অনুরোধ করলেন কর্ণসেনকে সংসারী হতে। কুমারী শ্যালিকা মহামদের প্রিয় ভগ্নী রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন গৌড়েশ্বর। এ কাজে বাধা দিতে পারে মহামদ এই আশঙ্কায় তাকে রাজকাজে পাঠানো হল অন্যত্র। কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিয়ে দিয়ে তাকে সুদূর ময়নার সামন্ত করে পাঠালেন গৌড়েশ্বর, মহামদের অনুপস্থিতিতেই। গৌড়ে ফিরে সমস্ত তথ্য জানতে পেরে ক্ষোভে, দুঃখে অভিশাপে মহামদ প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে সে ভগ্নীপতির মুখদর্শন করবে না। ভগ্নীর সঙ্গেও চুকিয়ে দিল সমস্ত সম্পর্ক। এদিকে ময়নায় এসে দীর্ঘদিন পিতামাতার কোন সংবাদ না পাওয়ায় কর্ণসেনকে গৌড়ে যাওয়ার অনুরোধ করল রঞ্জা। কর্ণসেন মহামদের আচরণ সম্পর্কে অবগত ছিল তথাপি সে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করল, স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষার্থে। কিন্তু মহামদ রাজসভায় সর্বসমক্ষে রঞ্জাকে উদ্দেশ্য করে 'বন্ধ্যা' বলে এবং অপমান করে সেনকে। অপমানিত সেন ময়নায় ফিরে এলে স্বামীর কাছে সব কথা শুনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে রঞ্জা, পুত্র কামনায়।

প্রথমে তুকতাক মন্ত্র, মানত, সংস্কারের সাহায্যে চেষ্টা করে বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার কিন্তু ব্যর্থ হয় তার এসব প্রচেষ্টা। অবশেষে ধর্মঠাকুরের কাছে পুত্রবর চেয়ে কঠোর ব্রত পালন করে রঞ্জাবতী। যথাসময়ে রাজা ও রাণী পুত্রমুখ দেখল এবং নাম রাখাল লাউসেন। শৈশবেই লাউসেনের কর্পূর নামে এক সহদরও জুটল। লাউসেন ও কর্পূর বেড়ে উঠলে তাদের শিক্ষা দেওয়া হল, মল্লবিদ্যা। ধর্মঠাকুরের অযাচিত কৃপায় দু'ভাই অল্প দিনের মধ্যেই এই বিদ্যা আয়ত্ব করে পরাস্ত করল বড় বড় বীরদের। লাউসেন ক্রমে আদর্শ যুবক হয়ে উঠল ধর্মের আশীর্বাদে ও মাতাপিতার শিক্ষার গুণে। একদিন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়ে গিয়ে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করল লাউসেন। রাজা ও রাণী প্রথমে সম্মতি না দিলেও নিরাশ করল না শেষ পর্যন্ত। শুভদিন দু'ভাই যাত্রা শুরু করল। গৌড়ের পথে যেতে যেতে দু'ভাইয়ের হল বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রথমে তারা চণ্ডীর বরপুষ্ট একটি কামদল বাঘকে পরাজিত করল, পরে বধ করল এক কুমীরকে। কিন্তু পথের বাধা যেন বেড়েই চলল। জামতি নগরে এসে বারুই রমণীর শিকার হল তারা। বারুই নারী লাউসেনকে প্রেম নিবেদন করলে লাউসেন তা প্রত্যাখ্যান করে ফলে ভ্রষ্টা নারী তাকে ছল চাতুরী করে কারাবাস করায় পুত্র হত্যার দায়ে। অবশেষে ধর্মের কৃপায় মৃত পুত্রকে জীবিত করায় কারামুক্ত হয় লাউসেন।

এরপর গোলাহাটের গণিকা সুরিক্ষার চক্রান্ত। যদিও ব্যর্থ হল তার কামজালে বিদ্ধ করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। তাই সে হেয়ালির মাধ্যমে লাউসেনকে বন্দী করার প্রয়াস করল কিন্তু তারও প্রয়াস ব্যর্থ হল। ধর্মের আদেশে হনুমানের কৃপায় জয়ী হল লাউসেন। এদিকে ভ্রাতৃদ্বয়ের গৌড় যাত্রার খবর মহামদের কানে পৌছালে সেও চক্রান্ত করে ঘোষণা করল, যদি কারও ঘরে প্রবাসী ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় তবে তাকে রাজদণ্ড ভোগ করতে হবে। এ আদেশ জারির ফলে লাউসেন ও কর্পূরসেন এক গাছতলায় আশ্রয় নিল মানুষকে বিপদমুক্ত করার জন্য।

কিন্তু মহামদেরই চক্রান্তে রাজার পাটহাতি বেঁধে রাখা হল তাদের শিয়রদেশে। 'হাতি চোর' বলে দু'ভাইকে কারাগারে দেওয়া হলেও নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করল তারা এবং শেষ পর্যন্ত আত্মপরিচয় দিল রাজার কাছে। পরিচয় পেয়ে রাজা অত্যন্ত প্রীত হলেন। সন্তুষ্ট হয়ে অশ্বশালা থেকে সর্বোত্তম অশ্ব ও

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে ভ্রাতৃদ্বয়কে খুশী করল রাজা। রাজসম্মান লাভের পর ঘরে ফেরার সময় তাদের সঙ্গে তের ঘর ডোমের দেখা হলে সঙ্গে নিল তাদেরও। এদের মধ্যে ডোম প্রধান কালুডোমকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করলে, পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে তারা লাউসেনকে সেবা ও সম্মান প্রদর্শন করল।

এদিকে লাউসেনকে বিপদে ফেলার জন্য নিত্য নতুন পন্থা উদ্ভাবনে ব্যস্ত মহামদ। সে রাজাকে পরামর্শ দিল, সদ্য স্বাধীনতা ঘোষণাকারী কামরূপের রাজার বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠানো হোক সেনকেই। মন্ত্রীর কথামত লাউসেনকে কামরূপ আক্রমণের নির্দেশ দিল রাজা। সে সেনাপতিসহ কামরূপ আক্রমণের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মপুত্র তীরে উপস্থিত হয়ে দেখল, তার জল কানায় কানায় পূর্ণ। লাউসেন জানতে পারল, গৌড়েশ্বরের মায়ের কাছে একটি কাটারি ও জপমালা আছে, জল শুকিয়ে ফেলা ও কামরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মন্দির থেকে দূর করা যায় এরই সাহায্যে। কাটারি ও জপমালা যোগাড় করে সে সাফল্য অর্জন করল কামরূপ অভিযানেও। সেখানকার রাজা লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নিজের কন্যা কলিঙ্গাকে অর্পণ করল তার হাতে। প্রত্যাবর্তনের পথে লাউসেন মঙ্গলকোট এবং বর্ধমানের রাজ কন্যাদ্বয় সুয়াগা ও বিমলাকেও বিয়ে করে ফিরে এল ময়নায়। পরম স্নেহে পুত্র, পুত্রবধূদের ঘরে তুলল কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী। কিছুদিন পর গৌড়েশ্বর মহামদের প্ররোচনায় সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানড়াকে বিয়ে করতে উদ্যত হলে প্রত্যাখ্যাত হন কন্যা পক্ষের দ্বারা। ফলত হরিপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করল রাজা।

কানড়ার প্রতিজ্ঞা, একটি লৌহগণ্ডারকে যে এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে, সে বিয়ে করবে তাকে। শত চেষ্টাতেও তা পারল না বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর। মহামদ লাউসেনকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে তাকে ডেকে আনতে পরামর্শ দিল গৌড়েশ্বরকে। তবে অনায়াসে গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করলে লাউসেনকে প্রতিজ্ঞামত বিয়ে করতে চাইল কানড়া। কিন্তু সে সম্মত না হওয়ায় তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হল, শর্ত কানড়া যুদ্ধে লাউসেনকে পরাজিত করতে পারলেই সে বিয়ে করবে কানড়াকে। চণ্ডীর ছলনায় লাউসেন পরাজিত হল, প্রতিজ্ঞামত কানড়াকে বিয়ে করল লাউসেন।

এরপর লাউসেন প্রেরিত হল ঢেকুরের ইছাই ঘোষকে দমন করার জন্য। ইছাইয়ের সেনাপতি লোহাটাবজ্জর কালু ডোমের হাতে নিহত হলে সে লোহাটার কাটামুণ্ডু পাঠিয়ে দিল মহামদের কাছে। এবার মহামদ কাটামুণ্ডুটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করল। লাউসেনের মাথার অবয়ব তৈরি করে প্রেরণ করল ময়নায়। স্বামী নিহত হওয়ার খবরে সহমরণে উদ্যত হল পত্নীরা; ময়না জুড়ে হাহাকার রব উঠল। কিন্তু ধর্ম চিল হয়ে সেই মুণ্ডু নিয়ে গিয়ে কলিঙ্গার কাছে সব তথ্য প্রকাশ করলে, নিশ্চিত হল রাজ-পরিবার।

এদিকে লাউসেন হনুমানের সহায়তায় অজয় নদের প্রতিকূলতা অতিক্রম করে প্রবেশ করল ঢেকুর গড়ে। ইছাই ঘোষ দেবী চণ্ডীর বরপুষ্ট সুতরাং সহজ নয় তাকে পরাজিত করা। যুদ্ধের প্রথম পর্বে কালু নিহত হলেও প্রাণ ফিরে পেল সে ধর্মের কৃপায়। লাউসেনের সঙ্গে যুদ্ধে ইছাইয়ের মুণ্ডু ধড়চ্যুত হলেও পুনরায় জীবিত হল দেবী চণ্ডীর কৃপায়। এইভাবে একাধিক বার মুণ্ডু ছিন্ন হওয়া এবং বাঁচাবার পর কোপে নিজেই লাউসেনকে বধ করার সিদ্ধান্ত নিল দেবী। দেবতারাও লাউসেনের মায়ামূর্তি নির্মাণ করে যুদ্ধ করাল ইছাইয়ের সঙ্গে। দেখেশুনে চণ্ডী লাউসেনকে বধের জন্য কৈলাসে গমন করলে সেই অবসর সময়টুকুতে ইছাইকে বধ করে তার মাথা ধর্মঠাকুরের চরণে সমর্পণ করল সেন। ইছাই মুক্ত হল; গৌড়ে ফিরে এল লাউসেন। কিছুদিন পর লাউসেনের এক পুত্র জন্মাল, নাম তার চিত্রসেন। সেনের গর্ব খর্ব করার উদ্দেশ্যে ধর্মপূজা আরম্ভ করল মহামদ।

কিন্তু ভক্তিহীন পূজায় অসন্তুষ্ট হয়ে ধর্ম গৌড় ভাসিয়ে দিল ভীষণ বর্ষণ ও জলপ্লাবনে। গৌড়েশ্বর এবার স্মরণ করলেন সেনকে। সেন এলে তাকে পশ্চিমে সূর্যোদয় করতে বলল মহামদ। এই অবাস্তব কাজে

Dhaka University Institutional Repository

সম্মত না হওয়ায় বন্দী হল সেন। খবর পেয়ে গৌড়ে এসে রাজাকে সূর্যোদয়ের প্রতিশ্রুতি দিল কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী। লাউসেন মুক্ত হয়ে হাকন্দ যাত্রা করল ধর্ম উপাসনা করতে, সঙ্গী হল সামুলা মাসী।

এই সুযোগে মহামদ রাজাকে বোঝাল গণ্ডার ময়না শহর ধ্বংস করছে, তাকে অনুমতি দেওয়া হোক সেখানে যেতে। সহজেই সম্মতি পেয়ে সসৈন্যে যাত্রা করল সে ময়নার অভিমুখে। অনতিদূরে শিবির স্থাপন করে ইন্দ্রজালের সাহায্যে ময়নাবাসীকে নিদ্রাভিভূত করে শেষ করল আক্রমণের প্রাথমিক প্রস্তুতি। এদিকে কালু ডোম স্ত্রী লখার উপর নগর রক্ষার ভার অর্পণ করে দেবীর আরাধনায় মেতে উঠল; পূজায় তামসিক আচারের বাহুল্য ঘটায় অসন্তুষ্ট হল দেবীও। মহামদ নগর আক্রমণ করলে লখা সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করে অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়ে। বীরাঙ্গনা লখাই স্বামীকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলে তাকে যুদ্ধভার গ্রহণ করতে বললে কালু তা অস্বীকার করায় লখা আত্মজ সাখাকে যুদ্ধে পাঠালে প্রাণ হারায় সে। পুত্র শোকাকুলা লখা নগর রক্ষার দায়িত্ব পালনে যুদ্ধে পাঠায় পুত্র শুকাকেও। কিন্তু তারও পরিণতি একই ঘটে। পুত্রদের মৃত্যুর খবর শুনে কালু যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে মহামদ শিবিরে সৃষ্টি হয় মহাত্রাসের। মহামদ ঘোষণা করে, ময়না নগর তাকেই দান করা হবে যে কালুর কাটা মুণ্ডু এনে দেবে।

এ খবর শুনে দাদার দুর্বলতা ও সরলতার সুযোগ দিয়ে তার কাছে মুণ্ডু প্রার্থনা করল ভাই কাম্বা। কালু তার ইচ্ছা পুরণ করলেও কাম্বা কিন্তু মহামদের কাছে কাটা মুণ্ডু পৌঁছাতে পারেনি কারণ তাকে হত্যা করেছে পতিশোকে বিহ্বলা লখা। 'কালু নিহত' এই খবরে শোকের ছায়া নেমে এল ময়নায়। লখা সমস্ত বৃত্তান্ত রাজ পরিবারকে অবগত করলে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল রাণীসকল। প্রথমে কলিঙ্গা যুদ্ধে নিহত হলেও দেবীর বরপুষ্টা কানড়া জয়লাভ করল সহজেই।

এদিকে লাউসেন ময়নার খবরের জন্য ব্যাকুল। শুককে দিয়ে খবর আনিয়ে জানল সে সমস্ত বৃত্তান্ত। কিন্তু সামুলার অনুরোধে গৃহে ফেরার সিদ্ধান্ত বাতিল করে ব্রতী হতে হল আরও কঠোর তপস্যায়। কোনভাবেই অভীষ্ট পূরণ না হওয়ায় অবশেষে নিজের দেহ ন'টি খণ্ড করে ধর্মপূজার অর্ঘ্য দিলে মুগ্ধ হয়ে সেনের প্রাণদান করল এবং পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাল স্বীয় ধর্মঠাকুর। হরিহর বাইতিকে এই ঘটনার সাক্ষী করে ময়না প্রত্যাবর্তন করলে মর্মাহত হল সে রাজ্যের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে। মহামদ চক্রান্ত করে লোভ দেখিয়ে বাইতিকে বশীভূত করলেও যথাসময়ে পত্নীর নির্বন্ধে এবং ধর্মের ভয়ে সত্য সাক্ষ্যই প্রদান করে সে। ফলে চোর অপবাদ দিয়ে মহামদ তাকে শূলে চড়ালেও মুক্তি পেল হনুমানের সহায়তায়। ধর্মকে অবহেলা ও মিথ্যাচারের জন্য কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হল মহামদ। পরিশেষে লাউসেনের কৃপায় তার কুষ্ঠ দূর হল। কিন্তু মুখে শ্বেতকুষ্ঠের দাগ রয়েই গেল কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। লাউসেন ময়নায় ফিরে মৃতদের আবার জীবিত রূপে পেল ধর্মের কৃপায়। এইভাবে ধর্মের পূজা প্রচারিত হলে পুত্র চিত্রসেনের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে যথাসময়ে স্বর্গারোহণ করলেন লাউসেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে জানতে পারা যায় যে 'কবি ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর ১০/১৫ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে *শিব-সঙ্কীর্ত্তন* পালা রচনা করেন।'[২৯] সুতরাং *শিব-সঙ্কীর্ত্তন* পালা আজ থেকে দুইশ' বছর পূর্বে রচিত হয়েছে বলা যায়। জনপ্রিয়তার কারণ বলতে গিয়ে বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন :

> বাংলার লোকজীবনে বৃষভধ্বজ *শিবপ্রমথেশ* অপেক্ষা গঞ্জিকাধস্তুরসেবী, পরস্ত্রীলোলুপ কৃষক-শিব অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন– যাঁহাকে কেহ কেহ অস্ট্রিক সংস্কৃতিজাত কৃষিদেবতার প্রতীক বলিয়া মনে করেন। পরে আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির সমন্বয়ের সময় পৌরাণিক মহেশ্বর ও কুচনীরূপমুগ্ধ বৃদ্ধ শিব এক হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য, পৌরাণিক ও লৌকিক, ভারতীয় ও বাঙালী শিবের সমন্বয়ী রূপের পরিচয় পাইতে হইলে বাংলার স্বল্পসংখ্যক শিবায়ন কাব্যেই তাহার পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইবে। অবশ্য মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখার মতো এই শাখাটি ততটা প্রাধান্য অর্জন করিতে পারে নাই। অথচ অদ্যাপি লোকজীবনে, নানা ব্রতকৃত্যে, শিবের গাজনে এই আর্যেতর শিবের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।[৩০]

শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়নের কাহিনি

একদিন দেবতাগণ এক সভায় সমবেত হয়েছেন, এমন সময় প্রজাপতি দক্ষ সেই দেবসভা দর্শন করতে আসেন। প্রজাপতি দক্ষ সভায় আগমন করামাত্রই শিব ব্যতীত অন্য সকল দেবতা সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হয়ে প্রজাপতি দক্ষকে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু শিব স্বীয় শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষের প্রতি এই বিপরীত আচরণ প্রদর্শন করাতে দেবতাগণ এর কারণ জানতে চাইলেন। প্রত্যুত্তরে শিব বললেন, 'তিনি নারায়ণ ব্যতীত আর কাউকে সম্মান প্রদর্শন করবেন না, যাকে সম্মান প্রদর্শন করা হবে ,সে অল্পায়ু হবে।' এই ভীতি থেকে তিনি আপন শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষকে উপস্থিত সভায় সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করতে পারেন নি।

প্রজাপতি দক্ষ শিবের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ক্ষুণ্ন মনে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। অচিরেই তিনি স্বগৃহে শিবহীন এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন। দেবর্ষি নারদের নিকট শিব ও পার্বতী এই সংবাদ শুনে বিশেষ মর্মাহত হলেন। যজ্ঞদর্শন করতে পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য সতী শিবকে বহু অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। কিন্তু শিব বিবাদ আশঙ্কা করে সতীকে পিতৃগৃহে বিনা নিমন্ত্রণে যেতে আপত্তি জানালেন। সতী শিবের নিষেধাজ্ঞা না মেনে যজ্ঞদর্শন করবার আশায় এবং স্বামী মহেশ্বর শিবকে পিতা প্রজাপতি দক্ষ নিমন্ত্রণ করেনি বলে তাঁকে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যেই পিতৃগৃহে উপস্থিত হলেন। সতী যজ্ঞশালায় উপস্থিত হলে, প্রজাপতি দক্ষ শিবের অশেষ নিন্দা করতে শুরু করলেন।

দেবগণ শিবনিন্দা শুনে কানে হাত দিয়ে কান বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। আর স্বামীপ্রাণা সতী স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে যোগবলে দেহত্যাগ করলেন। সতী দেহত্যাগ করলে নন্দী সতীর মৃতদেহ নিয়ে কৈলাসে গমন করল। নন্দীর মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে শিব মুহূর্তের মধ্যে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। স্বীয় জটাজল ছিন্ন ভিন্ন করে রুদ্র মূর্তিতে তিনি দক্ষের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হলেন। শিবের অনুচরগণ এবং শিবজটা সমুদ্ভুত বীরভদ্র-শিব প্রজাপতি দক্ষের সেই যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দিলেন। বীরভদ্র দক্ষের মুণ্ডুচ্ছেদ করলেন। দেবগণের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে আশুতোষ শিব ছাগ-মুণ্ড কেটে দক্ষের কবন্ধে যুক্ত করতে উপদেশ দিলেন দেবগণকে।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর শিব সতীর প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে গ্রহণ করে উম্মাদের ন্যায় "সতী জাগ", "সতী জাগ" রবে মর্ম্মভেদী বিলাপ করতে করতে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করতে লাগলেন। সতীর অঙ্গ ছিন্ন হয়ে "এক পঞ্চাশৎ পীঠস্থান" হলে শূলী শিব শ্মশানে হাড়মালা পরিধান করে সর্বাঙ্গে চিতাভস্ম মেখে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। আর অন্যদিকে জগম্মাতা সতী নগাধিপতি গিরির ঔরসে মেনকার গর্ভে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। গৌরী পূর্বজন্মের সংস্কারবশত শৈশব থেকে শিবের সেবায় রত হলেন। শিবকে প্রাণেশ্বর জ্ঞান করে পূজা করতে শুরু করলেন। গৌরীর আন্তরিক অভিলাষ অবগত হলে গিরিরাজ শিবের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ সুসম্পন্ন করলেন।

অতঃপর গৌরী গিরিরাজের প্রাসাদ পরিত্যাগ করে কৈলাসে শিবের কুটিরে এসে নতুন সংসার পাতলেন। দরিদ্রের সংসার, দিন কোন রকমে চলছে। শিব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে কোন প্রকারে সামান্য তেল সংগ্রহ করে আনেন আর স্বামীপ্রাণা ধৈর্যশীলা গৌরী অতি যত্নে অন্ন ও নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করে স্বামী ও পুত্রগণকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করান। গুণবতী সাধ্বী গৌরীর গৃহিনীপনাতে শিবের ভিক্ষালব্ধ ধনে বহুদিন চলে গেল। আর মাত্র ছয় মাসের সঞ্চয় আছে, এরপর সংসারের কি অবস্থা হবে এই চিন্তায় গৌরীর দেহলাবণ্য অন্তর্হিত হল। সমূহ বিপদ আশঙ্কা করে গৌরী স্বামীকে ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে চাষাবাদ করতে উপদেশ দিলেন। স্বামীকে এও বললেন যে, চাষী চাষলব্ধ ধনে সুখে শান্তিতে পরিজন প্রতিপালন করতে সমর্থ হয়। গুণবতী স্ত্রীর সুপরামর্শে শিব চাষের জন্য উদ্যোগী হলেন। সর্বপ্রথম তিনি ইন্দ্রের নিকট হতে চাষ-ভূমির পাট্টা গ্রহণ করলেন। অতঃপর শিব চাষের সজ্জা প্রস্তুত করে কুবেরের নিকট হতে ভীম ভৃত্যের সাহায্যে বীজধান্য সংগ্রহ করে আনলেন।

মাঘ মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। ভীমের সাহায্যে শুভক্ষণে শিব জমিতে হাল-প্রবাহ আরম্ভ করলেন। চৈত্র মাসের মধ্যে শিব জমিতে চতুর্দশ বার চাষ দিলেন, পরে চাষ-ভূমিতে মাটি চূর্ণ করবার জন্য তিনি জমিতে মই দিলেন। বৈশাখ মাসে শুভক্ষণে শিব চাষ-ভূমিতে বীজ বপণ করলেন। শিবের জমিতে প্রচুর ফসল ফলল। অতঃপর ধান ভানতে ঢেঁকির প্রয়োজন হল। শিবের নিজের ঢেঁকি ছিল না, তাই শিব নারদের নিকট হতে ঢেঁকি চেয়ে আনলেন। শিবের অনুচর ভূতগণ ধান ভেঙ্গে প্রচুর চাল উৎপাদন করল। গৌরীর সাংসারিক দৈন্যের এইখানে সমাপ্তি ঘটল। প্রাচুর্যের মধ্যে না থাকলেও সাধারণ গৃহস্থের অনাড়ম্বর, সরল-সুন্দর জীবনযাপন করবার সুযোগ এবার গৌরীর জীবনে মিলল। গার্হস্থ্যজীবনের দুঃখ ঘুচে গেলেও গৌরীর চিন্তা বেড়ে গেল শিবের জন্য।

মর্ত্যলোকে চাষের কাজে শিব এমনই উন্মত্ত হয়েছেন যে কৈলাসে ফিরবার চিন্তাও তাঁর মনের কোণে একবারও উঁকি দেয় না। সাধ্বী স্ত্রী গৌরীর কথা তিনি যেন একেবারেই ভুলে যেতে বসেছেন। মর্ত্যলোকে কতগুলো নারী সঙ্গিনীও জুটেছে। শিব কোচনীপাড়ায়ও যাতায়াত শুরু করেছেন। এই সঙ্গিনীদের মোহে আর চাষের ফসলের লোভে শিবের দিন ভালই কাটছিল। সাধ্বী নারী গৌরী আর দীর্ঘদিন স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে নারদের পরামর্শে মর্ত্যে উঙানি মশা প্রেরণ করলেন। শিব সর্বাঙ্গে তেল লেপন করে উঙানি মশার উপদ্রব হতে নিজেকে রক্ষা করলেন। অতঃপর গৌরী মর্ত্যে মাছি ও ডাঁশ প্রেরণ করলেন, শিব সকলের শরীরে ঘি মাখিয়ে মাছি ও ডাঁশের দংশন হতে সকলকে রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। মাছি ও ডাঁশের দংশনে হেল্যার গায়ে যে ঘা হয়েছিল তাতে বহু কৃমি জন্মেছিল। শিব কিয়ারি করে এবং ঘায়ে রসুন-তেল দিয়ে ক্ষতস্থান নিরাময় করলেন। সুতরাং শিবকে কৈলাসে আনার জন্য গৌরী যে দুইটি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সে দুইটিই নিষ্ফল হল। গৌরী তখন তৃতীয় পন্থা গ্রহণ করলেন। তিনি মর্ত্যলোকে বহু মশক প্রেরণ করলেন। শিব মশার উৎপাত বন্ধ করবার জন্য খড় জ্বালিয়ে ধূম সৃষ্টি করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মশকের উৎপাত বন্ধ হল। তৃতীয় পন্থায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলেও গৌরী চতুর্থবার বহু সংখ্যক

Dhaka University Institutional Repository

জোঁক প্রেরণ করলেন। শিব চূর্ণ ও লবণ প্রয়োগ করে জোঁক মেরে ফেললেন। এবারেও দেবী পার্বতীর চেষ্টা ব্যর্থ হল।

সর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় পার্বতী বাগদিনীর বেশ ধারণ করে মর্ত্যে আগমন করলেন। মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে তিনি শিবের ধানক্ষেতে মাছ ধরতে আরম্ভ করলেন। এতে শিবের ধান নষ্ট হতে লাগল, এজন্য ভীম ভৃত্যের সঙ্গে ছদ্মবেশী শিবানী বাগদিনীর কলহ আরম্ভ হল। কিন্তু বাগদিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে শিব তাঁর কার্যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা করলেন না, পরন্তু তাকে মিষ্ট বচনে তুষ্ট করে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। শিবানী এমনভাবে শিবকে স্বীয় পরিচয় দিলেন যে শিব তার সেই পরিচয়ে শিবানীকে চিনতে পারলেন না।

অতঃপর শিব কামার্ত হয়ে বাগদিনীর প্রতি ধাবিত হন। বাগদিনী তাঁকে প্রথমত নিরস্ত করে পরে শিব বাগদিনীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ধানক্ষেতের জল সিঞ্চন করে তার মাছ ধরার পথ সুগম করে দিলেন। বাগদিনীকে অত্যাধিক সন্তুষ্ট করার জন্য শিব তাকে অঙ্গুরী প্রদান করলেন। এরপর শিবকে আলিঙ্গন দেবার সময় উপস্থিত হলে ছদ্মবেশিনী শিবানী বাগদিনী শিবের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু করলেন। পরে গায়ের কাদা ধোয়ার ছল করে কৈলাসে চলে গেলেন।

বাগদিনীর ফিরতে বিলম্ব দেখে শিব বুঝলেন যে বাগদিনী তাঁকে প্রবঞ্চনা করে চলে গিয়েছে। অতঃপর পার্বতীর জন্য শিবের মন চঞ্চল হওয়ায় তিনিও কৈলাস যাত্রা করলেন। কিন্তু স্বীয় গৃহদ্বারে উপস্থিত হলে এক নতুন বিপদ উপস্থিত হল। বাগদিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে শিব তাকে আঙ্গুরী উপহার দিয়েছেন বলে পার্বতী শিবকে গৃহে প্রবেশ করতে দিলেন না। শিবের এ বিপদের দিনে নারদ উপস্থিত হলেন। পার্বতী তখন নারদের নিকট শিবের কীর্তি বিবৃত করলেন। নারদ উভয়ের মিলন চাইলেন তথাপি মস্তিষ্কে একটি দুর্বুদ্ধি এল। উভয়ের কলহটি যাতে আরও একটু ঘোলাটে হয় সেই উদ্দেশ্যে নারদ পার্বতীকে স্বামীর নিকট একজোড়া শঙ্খ চাওয়ার পরামর্শ দিলেন। নারদের পরামর্শ মত গৌরী শিবের নিকট শঙ্খ পরবার উদ্দেশ্য-জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু ভিখারী শিব পার্বতীর সেই সাধ পূর্ণ করতে নিজের অক্ষমতার কথা জানালেন। শিবের এই অক্ষমতার অভিমানিনী পার্বতী অভিমান করে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। শিব এতে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হলেন, এবার শিবকে সাহায্য করতে নারদের আগমন ঘটে। নারদ শিবকে পরামর্শ দিলেন যে তিনি যেন শাঁখারির বেশে গিরিরাজপুরে উপস্থিত হন এবং স্বহস্তে গৌরীকে শঙ্খ পরিয়ে দেন। এই পন্থা অবলম্বন করলে গৌরীর ক্রোধের উপশম হবে এবং তিনি শিবের সঙ্গে কৈলাসে ফিরে আসবেন। যেই কথা সেই কাজ শিব শঙ্করের বেশে শঙ্খের ঝুলি কাঁধে নিয়ে গিরিরাজপুরে উপস্থিত হলেন। শঙ্করের বেশে ছদ্মবেশী শিবকে দেখে গৌরীর মন মহা আনন্দে পূর্ণ হলো। তিনি মনোমত একজোড়া শঙ্ক বেছে শিবের কাছে এর মূল্য জানতে চাইলেন। শিব-শঙ্কর উত্তরে বললেন– "অমূল্য শঙ্খের মূল্য আত্ম-সমর্পণ।"

সুতরাং গৌরীর কাছে শিবের আত্ম-সমর্পণ ও শিবপ্রদত্ত শঙ্খ পরিধানের মাধ্যমে গৌরীর অভিমান দূরীভূত হল, শিব সপরিবারে কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), (ঢাকা : বর্ণমিছিল, ১৯৭৮), পৃ. ৪১৫

২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত *পদ্মাবতী* (ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, নতুন সংস্করণ, ১৩৭৬), পৃ. ৩০

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫ (ভূমিকা অংশ)

৪. Shaikh Ghulam Maqsud Hilali, *Perso-Arabic Elements in Bengali* (Dacca : Central Board for Development of Bengali, 1967), P. 133

৫. অমৃতলাল বালা সম্পাদিত *বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ* (রাজশাহী : গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা প্রথম প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯), পৃ. ২

৬. বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সঙ্কলিত বিজয় গুপ্ত প্রণীত *পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল* (কলকাতা : বাণী নিকেতন, ১৩৩৫), (ভূমিকা অংশ)

৭. বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, (ভূমিকা অংশ)

৮. অমৃতলাল বালা সম্পাদিত *বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

৯. প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত, (রামচরণ শিরোরত্ন প্রকাশিত), *বরিশাল আদর্শ যন্ত্র* (বরিশাল : প্রথম প্রকাশ, ১৮৯৬), (সপ্নাধ্যায় পালা)

১০. জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, *পদ্মাপুরাণ* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২), পৃ. ৮

১১. আজহার ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৪০৬/ ফেব্রুয়ারি ২০০০), পৃ. ২১৯

১২. ক্ষেত্র গুপ্ত, *কবি মুকুন্দরাম* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, ৬৭, প্যারীদাস রোড),পৃ. ১১

১৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত *কালকেতু উপাখ্যান* (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার), (ভূমিকা অংশ- সম্পাদনা প্রসঙ্গে)

১৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলবাক্যের ইতিহাস* (কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ পরিবর্ধিত ৫ম সংস্করণ, ১৯৭০), পৃ. ৩২৪-৩২৫

১৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

১৬. 'কমলে কামিনী'র প্রকৃত অর্থ সমুদ্র-মরীচিকা। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য,- আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পাদটীকা-১, পৃ. ৪৪৯

১৭. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ, (কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, পঞ্চম মুদ্রণ ১৪১৫) পৃ. ২০৭

১৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট

Dhaka University Institutional Repository

লিমিটেড, পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬),পৃ. ৬৩৭

১৯. ঐ, পৃ. ৬৩৭-৬৩৮

২০. গোপাল হালদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

২১. মাহবুবুল আলম সম্পাদিত, *সমালোচনা সংগ্রহ* "ভারতচন্দ্র, ড. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য" (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ৬৭ প্যারীদাস রোড, পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, মে ১৯৯৭) পৃ. ১৪২

২২. গোপাল হালদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০

২৩. ঐ, পৃ. ২১০

২৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৬-৬৬৭

২৫. ঐ, পৃ. ৬৬৭

২৬. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *প্রতাপাদিত্যের কথা* (কলকাতা : ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩৮), পৃ. ৩৫৩-৬৩

২৭. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা* (কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮), পৃ. ২০১

২৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৭), পৃ. ৬৫

২৯. যোগিলাল হালদার সম্পাদিত *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭), ভূমিকা অংশ

৩০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব, (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৯-১০), পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় :

মঙ্গলকাব্যের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় :

মঙ্গলকাব্যের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

বাঙলা সাহিত্য দীর্ঘকালের এক ইতিহাস ধারণ করে আছে; সে ইতিহাস প্রমাণনির্ভর ইতিহাস যা স্পষ্ট করে যে, বাঙলা সাহিত্যের সূচনা-পর্ব থেকে আজকের আধুনিক কাল পর্যন্ত তা একই ধারায়, একই ভাবে প্রবাহিত হয়ে আসেনি, যুগে যুগে, কালে কালে বাংলা সাহিত্যের গতিধারার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পালাবদল। ...every history of literature should always have a background of political and social history.[১]

বাঙলা সাহিত্যকে আজ আমরা যে অবস্থানে দেখছি তা একদিনে বা একযুগে গড়ে ওঠেনি। শিল্পী সাহিত্যিকদের দীর্ঘকালের সাধনার ফসল আজকের বাঙলা সাহিত্য।[২] কাজেই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত তাকে কেথাও কখনও বিচ্ছিন্ন করে দেখা সমীচীন হবে না। এ সত্যটুকু শুধু বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত একটি মূল্যবান কথা বলেছেন :

> কতগুলি ঘটনার পুঞ্জীকৃত সমীকরণ যে ইতিহাস নয়, তার যে বিশেষ ধরনের আত্মা আছে, তার বিকাশ আছে, এ কথা মেনে না নিলে চলে না আদপেই। ইতিহাসের মূল কথা হলো অর্থনীতির কথা। তাকে বলবো বনিয়াদ, সমাজ-সাহিত্য, শিল্প-দর্শনের হর্ম্য যদি তৈরি হয় তা বনিয়াদের উপরেই হতে হবে; হতে হবে বনিয়াদকে অবলম্বন করেই।[৩]

আধুনিক যুগে সাহিত্য বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেবল সাহিত্যের মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকতে পারি না। সাহিত্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে আমাদের প্রবেশ করতে হয়, দেশ, জাতি, তার রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-কাঠামো প্রভৃতি সীমারেখার ভিতরে। যে মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করেছে বা করছে, সেই মানুষের ধর্মীয় চেতনা, সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক কাঠামো প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে আমরা যদি আমাদের যোগসূত্র স্থাপন না করি তাহলে তাঁর বা তাঁদের রচিত সাহিত্য বিচার-বিশ্লেষণ আমাদের কাছে থেকে যাবে অপূর্ণাঙ্গ। যে কোন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। দেশের মানুষের সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রক্ষমতা। কাজেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য বিচার বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের পাল শাসন, সেন শাসন, তুর্কী শাসন, মুঘল শাসন, ইংরেজ শাসনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। প্রত্যেক শাসন ব্যবস্থার সাথে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তৎকালীন সৃষ্ট সাহিত্যগুলো পর্যালোচনা করলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়ে। এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় "বাংলা মঙ্গলকাব্য" সময়টা– তুর্কী শাসনামল।

তুর্কীদের আগমনের ফলে বাঙলার মানুষের সার্বিক জীবনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সে বিষয়ে নানা রকম মতামত রয়েছে। স্মরণ করছি তাঁদের যাঁরা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন :

ক. ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তুর্কীদের বাঙলা বিজয়ের কালে দেশের উপর দিয়া একটি পড়ঢ়ও ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। ১২০০ খ্রীস্টাব্দ হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর বাংলাদেশে সাহিত্য বা বিদ্যাচর্চার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহা একটি

Dhaka University Institutional Repository

যুগান্তরের কাল। দেশময় মারামারি, কাটাকাটি, নগর ও মন্দির ধ্বংস, অভিজাত বংশীয় পণ্ডিতদের উচ্ছেদ প্রভৃতি অরাজকতা চলিয়াছিল। এরূপ সময়ে বড়দরের সাহিত্য হওয়া অসম্ভব।[৪]

খ. ড. কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বাদশ শতকের একেবারে শেষে পূর্বভারতে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। ইহার পর দেড়শত বৎসর ধরিয়া এ দেশে ধ্বংসের লীলা বহিয়াছিল। এই লুণ্ঠন ও ধ্বংসের ফলে বাংলাদেশে এ যুগে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বাঙালির মনে সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল নহে। কাজেই সাহিত্য সৃষ্টি তখন ঘটিয়া ওঠে নাই।[৫]

গ. গোপাল হালদার

খ্রীঃ ১২০০ থেকে খ্রীঃ ১৩৫০ কেন, খ্রীঃ ১৪৫০ অব্দ পর্যন্ত বাঙলার জীবন ও সংস্কৃতি তুর্ক আঘাতে ও সংঘাতে ধ্বংসে ও অরাজকতায় মূর্ছিত অবসন্ন হয়েছিল। খুব সম্ভব, সে সময়ে কেউ কিছু সৃষ্টি করবার প্রেরণাই পায়নি। অন্তত বাঙ্‌লা ভাষায় যদি তখন কিছু লেখা হয়েও থাকে তার একটি ছত্রও আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। বাঙ্‌লা ছাড়া অন্য ভাষায় লেখা যা হয়েছে, তাও সামান্য। এই সন্ধিযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস হচ্ছে তাই সাহিত্য-শূন্যতার ইতিহাস।[৬]

ঘ. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তুর্কীরা শুধু দেশ জয় করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহারা বাঙলার ধর্ম ও সমাজজীবনে গুরুতর আঘাত হানিয়াছিল। তাহারা অন্যান্য বিজিত দেশে যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, বাঙলাতেও সেই নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল। হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ-বিহারের মধ্যে একটা ব্যাপক ধ্বংস অভিযান চলিয়াছিল এবং অনেকটা এই কারণেই বোধ হয় তুর্কী বিজয়ের পর প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া বাঙলা সাহিত্য রচনায় আর কোন নিদর্শন মিলে না। মঠ-মন্দিরে রক্ষিত গ্রন্থাবলী বোধ হয় বিনষ্ট হইয়াছিল ও এই অন্তবর্তীকালের সমস্ত বাঙলা রচনাও বিনাশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। সেই জন্য চর্যাপদের পর বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে একটি বিরাট শূন্যতার যুগ।[৭]

ঙ. ড. সুকুমার সেন

তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙালির বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। দ্বাদশ শতকের একেবারে শেষে পূর্বভারতে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। তাহার পর হইতে দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে ধ্বংসের ও অরাজকতার তাণ্ডবলীলা চলে। দেশের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে কেন্দ্র ছিল, সেইগুলি সর্বাগ্রে বিধ্বস্ত হইল এবং বুদ্ধি বিদ্যা কৌশলে যাঁহারা শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন, তাঁহারা রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন, নতুবা আততায়ীর হস্তে প্রাণ বিসর্জন করলেন। দেশে শান্তি নাই সুতরাং সাহিত্য চর্চা তো হইতেই পারে না।[৮]

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ড. সুকুমার সেন এঁর বক্তব্যগুলোকে একসঙ্গে গুছিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা তুর্কী আক্রমণ এবং তাদের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যে ধারণাগুলো[৯] গড়ে তুলতে পারি তা হল :

Dhaka University Institutional Repository

এক. তুর্কীদের বাংলাদেশ আক্রমণ এবং তাদের দুশ বছর শাসনের ইতিহাস আমলে বিপ্লব আর বিদ্রোহের ইতিহাস, দেশময় মারামারি, কাটাকাটি, নগর-মন্দির ধ্বংস, অভিজাত বংশীয় পণ্ডিতদের উচ্ছেদের ইতিহাস।

দুই. তুর্কীদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে প্রতিরোধ আন্দোলন, সর্বাত্মক সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষেরই ফল 'বাঙলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ।'

তুর্কীরা যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করেন, তখন বাঙলার শাসনভার ছিল রাজা লক্ষণ সেনের হাতে। কথিত আছে তুর্কীদের আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের তৎকালীন রাজা লক্ষণ সেন নিজের প্রাণ নিয়ে ছদ্মবেশে কোন রকমে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী মাত্র ১৭ জন মতান্তরে ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নদীয়া বিজয় সম্পন্ন করেন, এটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয় সম্পর্কে ইতিহাসে উল্লেখ আছে :

> In 1201 he left Bihar with a large body of horse and marched so rapidly against Nadiya, the Capital of Bangla that when he arrived at the City, only eighteen of his Companions had been able to keep pace with him. Nadiya was partly deserted at his time, and the Muslim commander and his eighteen companions were able to pass through the city gates unchallenged as horse dealers from the north. Reaching the Raja's palace on the banks of the Ganges, they cut down the guards. But Raja Lakshaman Sena escaped through a pastern gate by boat.[১০]

তবে বাংলাদেশের ইতিহাস প্রণেতা ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয় সম্পর্কে বলেছেন :

> বখতিয়ার যখন নগরদ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, কিন্তু বাকী সৈন্য নিকটেই পশ্চাতে ছিল। কারণ যে সময় বখতিয়ার রাজবাড়ী পৌঁছিয়াছিলেন, সেই সময়েই এই সৈন্য বা অন্তত তাহার এক বড় অংশ শহরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে নগর মধ্যে যে আর্তনাদ উঠিয়াছিল, বখতিয়ার রাজ প্রাসাদে প্রবেশের পূর্বেই রাজার কর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং লক্ষণ সেন যখন পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন বখতিয়ারের বহু সৈন্য নগরমধ্যে ছিল।[১১]

লক্ষণ সেনের শাসনামলে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষয় ও ধ্বংসের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছে। এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ছবি সে যুগের সাহিত্য সংস্কৃতিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'History of Bengal' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য :

> Certain it is that the literature of the Sena period and the religious texts and practics of the later phases of both Hinduism and Budhism occasionally betray a degradation in ideas of decency and sexual morality which could not but seriously affect the healthy development of moral and social life.[১২]

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণ সেনের সময় একদিকে যেমন মানুষের চারিত্রিক অধঃপতনের নিদর্শন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় সাধারণ মানুষের তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের চিত্র। শাসক ও রাজন্যবর্গের রাজপ্রাসাদ ও নাগরিক জীবনের ভোগ-বিলাস এবং চাকচিক্যময় জীবনের পাশেই আমরা দেখতে পাই সমাজের অন্তেবাসী মানুষের অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনাপূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি। তারা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সমাজকে শুধু সেবাই দিয়ে গেছে; প্রতিদানে কিছুই পায়নি, পেয়েছে শুধু ঘৃণা আর অপমান। দুঃখ দারিদ্র্যে আচ্ছন্ন সংসারে এতটুকু সুখ-শান্তির আশায় তারা ছুটে চলেছে উদ্দেশ্যহীনের মতো। এবার তাদের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে কিছু জানা যাক। সেন শাসকরা ছিলেন কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত তাদের মাতৃভাষা। বাংলাদেশ সেনদের দখলে আসবার সাথে সাথে বাঙালির উপর চাপিয়ে দেয়া হয় সংস্কৃত ভাষার বোঝা। নির্দেশ দেয়া হয় কেউ যদি অষ্টাদশ পুরাণ বা রামায়ণ বাঙলায় শ্রবণ করে তাহলে সে অবশ্যই রৌরব নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। 'প্রত্যেক দেশে যুগে যুগে মাতৃভাষাই জাতীয় চেতনার মূল উৎস হিসেবে কাজ করে আসছে। কাজেই বাঙালিদের মাতৃভাষায় যখন সেন শাসকরা আঘাত হেনেছে, তখনকার দিনে বাঙালির জাতীয় চেতনায় এর জন্য কোন প্রতিক্রিয়া ঘটেনি, এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।[১৩]

সুতরাং যে শাসন ব্যবস্থায় উচ্চশ্রেণির মানুষের কাছে সাধারণ মানুষকে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে, ক্ষমতাসীন শাসকের হাতে নারীর মান মর্যাদা নির্বিচারে বিসর্জিত হয়েছে, দু'মুঠো অন্নের জন্য হাত পেতে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। নিজের মাতৃভাষা চর্চার অধিকার থেকে যে দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়েছে, সে দেশের মানুষ এই শাসকশ্রেণির নেতৃত্বে তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে বড় রকমের প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, কঠোর হাতে দমন করবে এটা নিশ্চয়ই অবান্তর। বরং সেন শাসকদের শোষণ-নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আশায় তৎকালীন বাঙলাদেশের আপামর জনসাধারণ তুর্কীদের আগমনকে অভিনন্দন জানিয়েছে। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতাটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তুর্কীরা অন্যায় অত্যাচার ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে এ দেশে নিজেদের শাসন-ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, এমন দাবি ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর কিনা তা আলোচনা সাপেক্ষ।

তুর্কীরা ছিলেন ইসলাম ধর্মের অনুসারী। সেনদের শাসনকালে সাধারণ মানুষ যখন নিজেদের মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অত্যন্ত অসহায়ভাবে দিনাতিপাত করছিল ঠিক তখন নবাগত মুসলমানদের আচরণে এমন একটি ভাব ছিল এবং কণ্ঠে ছিল সাম্য, ভ্রাতৃত্বের এমন এক সুর যা সেই সময়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমনে স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছিল এবং তারা অনেকেই ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ক্ষমতা দেখিয়ে জোরপূর্বক তুর্কীরা এদেশে ইসলাম প্রচার করেছিল এমন অভিযোগের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> বিজয়ী শক্তির ধর্মমতের প্রাধান্য সহজেই সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে, তথাপি এর আকর্ষণের মধ্যে কেহ কেহ এমন সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন যাতে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অন্যান্য সম্প্রদায় ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাতে ইসলামেরও নব রূপায়ণ হয়েছে।[১৪]

তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির মানুষের হাতে যখন বাঙলার সাধারণ মানুষ লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত ঠিক সেই সময় ইসলাম মানুষকে মর্যাদা দিয়েছে। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ইসলামের মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্র শেখায় রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব সবাই সমান। সামাজিক সমানাধিকারের এই আদর্শ এবং শ্রেণিগত সংস্কারের অনুপস্থিতিতেই বর্ণ-সংস্কারে জর্জরিত বঙ্গদেশে ইসলামের বিজয়াভিযানের অন্যতম কারণ বলে বিবেচ্য।

ব্রাহ্মণ্য সামাজিক সংস্কারের নির্মম বিধানে যারা নির্যাতিত হচ্ছিলেন, বর্ণ সমাজের অন্তর্গত নিম্নবর্ণের মানুষ এবং বর্ণ সমাজের বাইরে অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষ, যারা পদে পদে নিগৃহীত হচ্ছিলেন, ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সংস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে তারা সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিধান দাতাদের কাছে যারা ছিল শূদ্র এবং অস্পৃশ্য পর্যায়ের, ইসলাম তাদেরকে দিল মুক্ত মানুষের অধিকার এবং শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণদের ওপরেও প্রভূত্ব করবার ক্ষমতাও তারা ইসলাম থেকে গ্রহণ করেছিল। ইসলাম জনসাধারণের সামনে যে অনাড়ম্বর, বিলাসব্যসনহীন জীবনের আদর্শ তুলে ধরেছিল, বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারে তার অবদানও কম নয়। বাঙলাদেশে ইসলাম প্রচার করার জন্য যে সমস্ত পীর-দরবেশ এসেছিলেন, তাদের জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা অথবা বিলাসিতার কোন স্থান ছিল না। এই সমস্ত পীর-দরবেশের সাধুতা, নিষ্ঠা ও নির্লিপ্ত জীবন বাঙলাদেশের অসংখ্য নির্যাতিত শান্তিকামী মানুষের হৃদয়কে জয় করতে সমর্থ হয়েছে। তুর্কী শাসনামলে বাঙলাদেশে যিনি প্রথম ইসলাম প্রচার করতে আসেন তাঁর নাম মুখ্‌দুম শেখ জালালুদ্দীন তব্‌রীজী। তিনি বাঙলাদেশে এসে পাণ্ডুয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ, একখানি উদ্যান রচনা ও একটি 'খানকাহ' প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জনশ্রুতি আছে তাঁর এই 'খানকাহ্'তে প্রতিদিন অসংখ্য দরিদ্র, নিরন্ন, দুস্থ মানুষ ও পরিব্রাজকরাও আহারাদি গ্রহণ করত। তিনি কীভাবে হাজার হাজার মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন তার বহু কাহিনি 'শেক শুভোদয়া' নামক সংস্কৃত একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। মুসলমানদের বিজয়লাভ সম্ভব হয়েছে তাদের মানবিকতার জন্যই এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

বঙ্গদেশ তথা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তুর্কীদের আগমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তুর্কীদের আগমন বাঙলা সাহিত্য এবং তার জাতীয় জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তুর্কীদের আগমনের ফলাফল ও দেশের জন্য শুভ অথবা সত্যিকারভাবে বুঝতে হলে আমাদের বিচরণ করা উচিত ইতিহাসের সেই প্রাচীন অধ্যায়ে। প্রাচীন ইতিহাসের জীর্ণ পাতাগুলো ওলট পালট করে জানতে হবে একটি জাতির ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-কল্পনা, চিন্তা-সাধনার উৎসকে। তাই বাঙালি জাতির ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনা থাকা অত্যন্ত জরুরি। তবে এটাও ভুললে চলবে না যে, সাহিত্য ও সমাজের যোগসূত্র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ঐতিহাসিকের সততা নিয়ে যদি আমরা আজ এদেশে তুর্কীদের আগমনের সত্যিকার মূল্যায়ন করতে পারি, তাহলে তৎকালীন সমাজ-সাহিত্যে, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া কত ব্যাপক হয়ে উঠেছিল তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

বঙ্গদেশে তুর্কীদের আগমনের অব্যবহিত পূর্বে শাসনভার ছিল সেন রাজাদের হাতে। সেনদের পূর্বে এ দেশ দীর্ঘদিন শাসন করেছেন পাল বংশীয়রা। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কাজেই তাদের শাসনকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। জানা যায়, 'অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পালরাজগণের অভ্যুদয়ে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।'[১৫] পাল শাসকদের প্রায় সবাই অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। তাদের শাসনকালে দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনে কখনও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়নি সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রেও দেশের মানুষের স্বাধীনতা ছিল। তবে তৎকালীন ধর্ম ও সম্প্রদায়গত প্রশ্নে নানা জটিলতা, দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, সমস্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি ছিল যা বর্ণনাসাপেক্ষ। যেমন: প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের লেখকরা সমস্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে যে চর্তুবর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) কাঠামোর মধ্যে বেঁধেছিলেন; বহুদিন ধরে আর্যপ্রবাহ বাংলাদেশে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করায় আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেই বর্ণাশ্রমের যুক্তি ও আদর্শও এদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। শুধু তাই নয় এই চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যেও আবার নানা বর্ণ, উপবর্ণ ও শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল। পাল আমলে করণ কায়স্থ, অম্বষ্ঠ বৈদ্য, বৈদ্য প্রভৃতি বর্ণ, উপ-বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা যায় এই সময় বৃত্তি ক্রমেই বর্ণে এবং বর্ণ ক্রমেই শ্রেণিতে পরিণত হতে চলেছে। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব) 'গ্রন্থের বর্ণবিন্যাস' অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন, 'করণ বা কায়স্থ এখনও নিঃসন্দেহে বর্ণ বা উপবর্ণ হিসেবে বিবেচিত হইতেছে না; এই দুই

Dhaka University Institutional Repository

শব্দের ব্যবহার মোটামুটি বৃত্তিবাচক তবে বৃত্তি ক্রমশ বর্ণে বিধিবদ্ধ হইবার দিকে ঝুঁকিতেছে।[১৬] এভাবেই পাল আমলে প্রাচীন বাংলার ধর্ম, বর্ণ, সমাজ, সংস্কৃতির কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। আমরা যদি সপ্তম শতকের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে, রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পালবংশ বৌদ্ধধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক হলেও তাদের সমাজাদর্শ ছিল একান্তই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অনুযায়ী, ব্রাহ্মণ্য আদর্শ অনুযায়ী। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ সংস্কারাশ্রয়ী পাল রাষ্ট্র ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও বর্ণ ব্যবস্থা পুরোপুরি স্বীকার করত। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থায় ধারক ও পালক হলেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসন তাদের কাছে একান্ত হয়ে উঠতে পারেনি। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য বর্ণ বিন্যাসের আদর্শ ছিল উদার ও নমনীয়। এই যুগে সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপারে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণে কিছু পার্থক্য ছিল না।[১৭] কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারেনি। সময়ের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় এবং সেই সাথে পরিবর্তিত হয় সামাজিক রীতি। কাজেই পাল বংশের সুদীর্ঘ চারশত বৎসরের রাজত্বকালে এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পাল রাজত্বের অভ্যুদয়ের পর তাদের পরম পৃষ্ঠপোষকতায় যে বৌদ্ধ ধর্ম উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল, সমগ্র সাম্রাজ্য মধুচক্রের মতো পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেই বৌদ্ধ ধর্মই এই রাজ্যের পতনোন্মুখ সময়ে মধুহীন, মৌহীন মৌচাকে পরিণত হয়।

পাল সম্রাটগণ বহু বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশেষ করে ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল মহাবিহার খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এছাড়া সোমপুর, ওদন্তপুর, দেবীকোট, জগদ্দল প্রভৃতি বিহারের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবর্ধনে (উত্তর বঙ্গে) ২০টি বিহারে তিন শতেরও অধিক হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের ভিক্ষু[১৮] বাস করতেন। কিন্তু এর এক দুই শত বৎসরের মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমশঃ ক্ষীণবল হয়ে আসছিল। এর কারণ প্রধানত পাল যুগের 'বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমশ তন্ত্র ধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছিল এবং ধর্মাদশ ও ধর্মানুষ্ঠান, পূজা প্রকরণ প্রভৃতি ব্যাপারে নূতন নূতন মত ও পথের উদ্ভব ঘটিতেছিল।[১৯]

যার ফলে বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক মতানৈক্য ও হিংসা-বিদ্বেষের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম সংকটের মুখে পতিত হয়। পাল বংশ বৌদ্ধ হলেও তাদের সমাজাদর্শ যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারানুসারী, ব্রাহ্মণ্যাদর্শানুসারী ছিল এ তথ্য পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমন: বার্ষিক শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ করানো হত ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে ডেকে, এ উপলক্ষে প্রতিবছর অনেক ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হত অথচ এসব ব্যাপারে ভিক্ষুরা সব সময়ই অবহেলিত হয়ে আসছিল। কাজেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও বর্ণ ব্যবস্থার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের সক্রিয় পোষকতায় পাল আমলে ক্রমশ ব্রাহ্মণেরা প্রভাবশালী হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। ভূমিদান-অর্থদান ইত্যাদি কৃপা লাভের ফলে অনেক ব্রাহ্মণ ক্রমশ ব্যক্তিগতভাবে ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠেন।

এ যুগের লিপিগুলি তো প্রায় সবই ভূমিদান সম্পর্কিত; এবং প্রায় সর্বত্রই ভূমিদান লাভ করিতেছেন ব্রাহ্মণেরা এবং সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণদের সমান না করিয়া কোনো দানকার্যই সম্পন্ন হইতেছে না।[২০] তৎকালীন এ বাস্তবতায় রাষ্ট্রও নিজের স্বার্থে সেইসব প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণকে সমর্থকরূপে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। ফলে পাল আমলে অনেক ব্রাহ্মণ, রাজা, সামন্ত, মন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, সৈন্য-সেনাপতি, রাজ-কর্মচারী, কৃষিজীবী ইত্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করেছিল। এই রীতির সূচনা হয়েছিল পরম ভট্টারক ধর্মপাল দেবের সময় থেকে। 'দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রী দর্ভপানি, পৌত্র কেদার মিশ্র ও প্রপৌত্র গুরুমিশ্র রাজা ধর্মপালের সময় হইতেই আরম্ভ করিয়া পর পর চারিজন পাল সম্রাটের অধীনে পাল রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত

Dhaka University Institutional Repository

করিয়াছিলেন।[২১] এছাড়া আরও একটি ব্রাহ্মণ বংশের শাস্ত্রবিদশ্রেষ্ঠ যোগদেব, পুত্র তত্ত্ববোধভূ বোধিদেব এবং তার পুত্র বৈদ্যদেব– এই তিনজন যথাক্রমে তৃতীয় বিগ্রহপাল, রামপাল এবং কুমারপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁরা সবাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে যেমন কুশলী ছিলেন তেমনি ছিলেন রণনীতি ও রাজনীতিতেও। পাল শাসনামলের শেষের দিকে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজ সমাজের শ্রীবৃদ্ধিতে মেতে উঠেছিল। রাষ্ট্রের সংকটময় অবস্থায় এই অধঃপতনের যুগের সম্রাটরা নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ব্রাহ্মণ্য অমাত্যদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল।

পালদের পূর্বে এ দেশের শাসনভার ছিল গুপ্ত সম্রাটদের হাতে। গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে দেশে সাহিত্য চর্চা চলে মূলত সংস্কৃত ভাষায়। সাহিত্য চর্চার কোন নিদর্শন এই যুগে পাওয়া যায়নি। পাল রাজাগণ যখন বাংলাদেশের শাসন লাভ করেন, তখন থেকেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে, সাধারণভাবে সেগুলো চর্যাপদ বলে পরিচিত। কোন শাসন ব্যবস্থা যদি একটি ভাষাকে পঙ্গু করে রাখতে বদ্ধ পরিকর হয়ে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে মধ্যযুগের পরিমণ্ডলে বসে কবি-শিল্পীদের পক্ষে সে ভাষায় সাহিত্য চর্চা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই সেন রাজাদের সময়ে আমরা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখি না। ফলে পালদের শাসনকালে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার যে ধারাটি অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল, বহিরাগত সেনদের আমলে উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এনামুল হকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> বাঙলার শেষ হিন্দু রাজা না হইলেও অন্তত সমগ্র বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। তাঁহার সভায় ধোয়ী, জয়দেব, উপমাপতিধর প্রভৃতি কবি এবং এবং হলায়ুধ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন। কিংবা নানা পণ্ডিত ও কবির সমাবেশে তাঁহার রাজধানীতে যে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়িয়া ওঠে, তাহা জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দের মাধ্যমে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করলেও বাঙলা-ভাষাচর্চার কোন আয়োজন তথায় ছিল না।[২২]

সেন শাসকরা এ দেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন পাল রাজাদের কাছ থেকে। এতে পালরা স্বাধীনতা হারানোর বেদনা অনুভব করবে এটাই সত্য, তারা সেনদেরকে যেমন মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি অন্যদিকে সেনরাও তাদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে পাল ও সেনদের মধ্যে অবিশ্বাস, বিরোধ, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি বিদ্যমান ছিল।

দীর্ঘ দিনের প্রতিরোধ আন্দোলনে অবশেষে পালরা যখন হেরে গেলেন তখন তাদের উপর শুরু হল অকথ্য অত্যাচার আর নির্যাতন। সেন রাজাদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তাদের প্রিয় জীবন, ধর্ম-সংস্কৃত, মান-সম্মান, সাহিত্য-ঐতিহ্য রক্ষার জন্য তারা নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে পালিয়ে যেতে শুরু করল। পালরা যেহেতু বৌদ্ধ ধর্মের সেহেতু আজও যে সমস্ত বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায় সম্ভবত সেগুলো সেনদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক দেবেন্দ্রকুমার ঘোষের বক্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

> পাল বংশের এতদ্দেশে সেন বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অতিশয় ব্যাপক হইয়া ওঠে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবাহ বিশুষ্ক হইয়া পড়ে। সেন বংশের রাজারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, তাহাদের রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও অধিকাংশ প্রজাবৃন্দ তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে রাজা ও রাষ্ট্র উভয়েই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিমুখ হইলে বাঙ্গালার বৌদ্ধরা স্বদেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঙ্গালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

> সদ্যোজাত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিও তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার বাইরে চলিয়া যায়। তাই আদি যুগের বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিও দুষ্প্রাপ্য।[২৩]

অধ্যাপক ঘোষের এ উক্তি যে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল 'চর্যাপদ' গ্রন্থটির আবিষ্কারের ঘটনাই তার বড় প্রমাণ। সেন শাসকদের ষড়যন্ত্রের ফলে তুর্কীদের আগমনের আগেই বাঙলা সাহিত্য চর্চার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বাঙলা সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত যদি কেউ করে থাকে তাহলে তার দায় সেন শাসকদের। সেন রাজাদের শাসনকালে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা যে কীভাবে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের উক্তিতে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> জনসাধারণ পালদের সময় নূতন গ্রাম্য গীতি রচনা করিত রূপ-কথা, গীতিকথা প্রভৃতি বাঙলা ভাষায় রচিত হইত এবং রাজারা তাহা শুনিতেন। কিন্তু সেনদের সময় কি সাধ্য যে জনসাধারণ বাঙলা গান লইয়া রাজদ্বারে প্রবেশ করে?[২৪]

ভালো ফসল ফলাতে হলে প্রয়োজন উর্বর ভূমির। আর এই উর্বর ভূমিকে তৈরি করতে হয় যত্ন সহকারে। অনেক সময় উপযুক্ত কর্ষণের অভাবে উর্বর ভূমিও পতিত ভূমিতে পরিণত হয়। আমরা জানি তুর্কীরা এ দেশের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন সেন রাজাদের কাছ থেকে। সেনরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। যখন একটি বিদেশি শক্তি নতুন কোন দেশ দখল করে, ক্ষমতাচ্যুত শক্তিকে সে কখনও মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ দেয় না, যেমনটি করেছিল তুর্কী শাসকরা। তবে এ কথা ভুললে চলবে না যে, সেনদের অত্যাচারে পালদের যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল তার কথা। সে জীবন্ত চিত্রের কথা বলেছেন ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান :

> The evidence indicates that after any major change in political power, religious persecutions tended to follow presumably to stamp out allegiance to the new. In some instances the old literature was suppressed and actively discouraged for the same reason. Scholars believe, for example, that when the Sena dynasty succeeded the pala kings, Buddhists were put to the sword.[২৫]

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের যতগুলো শাখা আছে, তার মধ্যে মঙ্গলকাব্য শাখা বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে। মঙ্গলকাব্য উদ্ভবকাল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা রকম মতপার্থক্য আছে। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবকাল সম্পর্কে বিশিষ্ট মঙ্গলকাব্য বিশারদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন :

> আনুমানিক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ একশ্রেণির ধর্ম বিষয়ক আখ্যান কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।[২৬]

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব কাল বলে উল্লিখিত হলেও ঐ সময়ের লেখা কোনো মঙ্গলকাব্য এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। তবে অনেকের ধারণা মঙ্গলকাব্য প্রথম রচিত হয়েছিল লোক-কবিদের মুখে মুখে। সঠিক সময় কবে, কখন কেউ বলতে পারবেন না তবু সুদূর প্রাচীনকাল থেকে যে মঙ্গলকাব্যের কাহিনিগুলো লোক-সমাজে প্রচলিত ছিল, এমন ধারণা একেবারে অসত্য নাও হতে পারে। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য মনীষীর অভিমত :

> The legeds which the Mongol poems certain are old, though few of the poems themselves seen to be earlier than the fifteenth century, it is certain

Dhaka University Institutional Repository

that they were passed down orally over many centuries before being put by particular writer into the from in which we have then to day. The dating of a particular version of the poem does not necessarily reflect the dating of the legend itself.[২৭]

মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনত্ব ও উদ্ভবকালের কথা বলতে গিয়ে অনেকে এর উদ্ভবকাল পাল বংশের শাসন সময়কে চিহ্নিত করেছেন।[২৮] বিশেষজ্ঞ ক্ষুদিরাম দাস মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের বিষয়টিকে চারটি[২৯] স্তরে বিভক্ত করে দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন :

প্রথম স্তর- লৌকিক দেবতা ও ধর্মবিশ্বাস, বৃক্ষ প্রস্তরাদির পূজা ও মানত থেকে উন্নীত হয়ে ব্রত পালন, ব্রতকথা, আবৃত্তি, আচার ও নিয়ম-নিষ্ঠার সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। এর সময়কাল আনুমানিক পাল বংশের রাজত্বকাল।

দ্বিতীয় স্তর– হয়তো কোন প্রসিদ্ধ ঘটনাকে অবলম্বন করে লোকমুখে কাহিনির প্রচলন হয় এবং কোন লোক কবি হয়তো তাকে সুরে আবৃত্তিযোগ্য ছড়ায় পরিণত করেন। এই স্তর নারীমহল থেকে পুরুষের মধ্যে মঙ্গলধর্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সময়কাল আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী।

তৃতীয় স্তর– লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচলন এবং উচ্চতর সম্প্রদায় কর্তৃক লোকায়াত ধর্মকে স্বীকৃতি দান। এর সময়কাল আনুমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী। এই স্তর পর্যন্ত কোন লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি, লোকমুখে রচিত এবং প্রচলিত হয়ে থাকবে হয়তো।

চতুর্থ স্তর– শিক্ষিত কবিগণ পুরাণ মিশ্র লৌকিক কাহিনি নিয়ে লৌকিক শিব, চণ্ডী, মনসাকে পৌরাণিক পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ করে জনসমাজে পূর্ব-প্রচলিত কাহিনি অবলম্বন করে কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন। এর সময়কাল আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দী।

প্রকৃত অর্থে লিখিত মঙ্গলকাব্যের নিদর্শন পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই মেলে। তার আগে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়ে থাকলেও সম্ভবত তা রচিত হয়েছে লোক-কবিদের মুখে মুখে। লোক-কবিদের মুখে মুখে রচিত ও প্রচলিত সেই কাহিনিগুলো হয়তো পঞ্চদশ শতাব্দীতে শিক্ষিত কবিদের হাতে পরে মঙ্গলকাব্যের কাহিনিগুলো মার্জিত রূপ লাভ করেছিল। কাজেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের লিখিত রূপ পেলেও এর জন্মলগ্ন যে কয়েক শতাব্দী আগের, এমন অনুমান মনে হয় ভিত্তিহীন নয়। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপী যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে, সেগুলো পাঠ করলে মঙ্গলকাব্য রচনার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমরা অনুধাবন করি। যেমন :

প্রথম অংশে নানা দেবদেবীর বর্ণনা করা হয়। এই বন্দনা একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক। দ্বিতীয় অংশে গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা। প্রাচীন পুরাণাদির মত এই অংশে কবিগণ দাবী করেছেন যে, তাঁরা স্বেচ্ছায় কাব্য রচনা করেন নি। আলোচ্য দেবতার প্রদত্ত নির্দেশ, স্বপ্নাদেশ অথবা দেববাণী শুনে দেব কৃপার বলেই তাঁরা কাব্যের রূপদান করতে পেরেছিলেন।

তৃতীয় অংশে– দেবখণ্ড, এখানে পৌরাণিক দেবতার সাথে লৌকিক দেবতাদের সম্বন্ধ স্থাপন এর মূল কথা।

চতুর্থ অংশ– নরখণ্ড এবং আখ্যায়িকা বর্ণনা। দেবতার পূজা প্রচারের জন্য কোন কোন দেবতা বা দেবপুত্র শাপভ্রষ্ট হয়ে নরলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশেষ কোন দেব-দেবীর পূজা প্রচার শেষ করে অভিশাপের মেয়াদ শেষে আবার তিনি স্বর্গে যাত্রা করেন। পুরো প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে পাঠকের মনে সহজেই প্রশ্ন জাগে

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্গের দেব-দেবীর মর্ত্যে আসার প্রয়োজনই বা কি আবার বিশেষ কোন দেবতার পূজা প্রচারের হেতুই বা কি? প্রকৃত পক্ষে দেবদেবীর গুণগান মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য হলেও তার উদ্দেশ্য সমাজকেন্দ্রিক।[৩০]

তুর্কী বিজয়ের পর বহু বর্ণে বিভক্ত বর্ণাশ্রম প্রথাশ্রয়ী তৎকালীন বাঙলার অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত নিম্নবর্ণের, নিম্ন-আয়ের, নিম্নবৃত্তির হিন্দুগণ অতি স্বাভাবিকভাবেই একটি ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এই ধর্মটি সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্ববোধের ধর্ম- ইসলাম।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও মুসলমানদের এই বিজয়কে অবদমিত করার জন্য বিজিত হিন্দুগণ (উচ্চবর্ণের) প্রতিরোধের প্রাণপণ প্রয়াস চালায়, ফলে হিন্দু ধর্মের দুই মেরুতে অবস্থিত নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণের মধ্যে একটা আপোষরফা চলে। ফলাফল দাঁড়ায় মনসা, চণ্ডী, বাশুলী, শীতলা প্রভৃতি নিম্নবর্ণ পূজিত দেবীগণ উচ্চবর্ণের হিন্দু কর্তৃক যেমন স্বীকৃতি লাভ করে তেমনি উচ্চবর্ণের বেদ-পুরাণ আশ্রিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম তাদের জন্য (নিম্নবর্ণের) উন্মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু বেদ-পুরাণাশ্রিত এই ধর্মকে যথাযথভাবে গ্রহণ করার বা ধারণ করার ক্ষমতা তাদের সবটুকু ছিল না। সে যাই হোক এর ফলে বাঙলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল। 'একান্তভাবে লৌকিক জীবনাশ্রয়ী, সমাজের সর্বপ্রান্ত বিস্তৃত গণমানব জীবনের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, ব্যথা-বেদনা চিহ্নিত জগতটিকে বক্ষে ধারণ করেই সৃষ্ট হল বাঙলা সাহিত্যের নতুন পথিকৃৎ মঙ্গলকাব্য।[৩১] ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত ও সামন্তবাদী-বর্ণবাদী শাসন-শোষণের বহু ধাপ বিশিষ্ট নিষ্ঠুর শাসনযন্ত্রের শিকার গণমানস তাঁদের বহু যুগসঞ্চিত ক্ষোভ-বেদনাকে রূপ দিল লৌকিক ধর্মের কাহিনির আবরণে, সৃষ্টি হলো মঙ্গলকাব্যের মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের অভিমত:

> ধর্ম দিয়েই যেকালে জাতির পরিচয় সেকালে রাজার ধর্ম ও প্রজার ধর্ম যদি এক না হয় তাহলে 'রাজার জাতি' যে 'প্রজার জাতি'র উপর নানা অজুহাতে অত্যাচার করবে, তা জানা কথা। তাই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে-চৈতন্যদেবের জীবনীতে (বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে), বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে, এমনকি ১৬ শতাব্দীর শেষ দিককার রচনা মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' পর্যন্ত মুসলমান শাসক-গোষ্ঠীর এরকম নানা অত্যাচারের উল্লেখ পাওয়া যাবে। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যই একটা ব্যাপক অর্থে হচ্ছে এই শাসক-ধর্ম ও শাসক-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শাসিত-ধর্মের ও শাসিত-সংস্কৃতির প্রতিরোধের সাহিত্য।[৩২]

মঙ্গলকাব্যগুলো ধর্মীয় কাহিনির আবরণে যেমন বৃহত্তর গণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, চাওয়া না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস মণ্ডিত কাহিনি স্থান পেয়েছে তেমনি দেবী হিসেবে যাঁদের কল্পনা করা হয়েছে তাঁরা স্বর্গের অধিবাসিনী নন বরং নিপীড়িত, অত্যাচারিত, অধিকারহীনার শাসকের প্রতীক।

মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবতাগণ একেবারেই ন্যায়নীতি বিবর্জিত। কবিগণ চারপাশের শক্তির যে অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, সর্বোপরি ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকেই প্রতিফলিত করেছেন তাঁদের শক্তির চরিত্রে। তৎকালীন সমাজের শক্তির ন্যায়নীতি বিবর্জিত রূপ সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন :

> এই দয়ামায়াহীন ধর্মাধর্ম বিবর্জিত শাক্তিকে বড়ো করিয়া দেখা তখনকার কালের পক্ষে বিশেষ স্বাভাবিক ছিল। তখন নিচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্বদাই দেখা যাইত। হীনাবস্থার লোক কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অরণ্য কাটিয়া নগর বানাইয়াছে এবং প্রতাপশালী রাজা হটাৎ পরাস্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। তখনকার নবাব-বাদশাহদের ক্ষমতাও বিধি-বিধানের অতীত ছিল; তাহাদের খেয়ালমাত্রে সমস্ত হইতে পারিত। ইহারা দয়া করিলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নিচ মহৎ হইত; ভিক্ষুক রাজা হইত। ইহারা নির্দয় হইলে ধর্মের দোহাইও কাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পরিত না। ইহাই শক্তি।[৩৩]

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোয় হিন্দু জনসাধারণের দুর্দশা প্রসঙ্গে ইবনে বতুতার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

Dhaka University Institutional Repository

> The lot of the Hindu population in Fakhruddins time was not very enviable for "they are mulcted" says Ibn Batuta, of half of their crops and have to pay taxes over and above that.[৩৪]

তুর্কী আক্রমণের ক্ষণটি পর্যন্ত সমাজের উচ্চবর্ণের যারা শাসকের শ্রেণিতে ছিল, সিংহাসন লাভের পর যখন বিজয়ীগণ শাসনদণ্ড হাতে নিল, উচ্চবর্গ বা উচ্চশ্রেণির বলে যারা খ্যাত ছিল তারা নিম্নবর্ণের বা নিম্নবর্গের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেল। ফলে নিম্নবর্ণের পূজিত লৌকিক দেবতাসমূহের মাহাত্ম্য, উচ্চবর্গের মানুষের দ্বারা যেমন স্বীকৃত হল ঠিক তেমনি নিম্নবর্ণের বা নিম্নবিত্তের মানুষ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে তাদের সামর্থ্য অনুসারে উপলব্ধি করার চেষ্টা করল। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ গোপাল হালদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> উচ্চবর্গের ও নিম্নবর্গের এই সংযোগের ও সামাজিক আপোষ-রফার ফলে বাঙলা সাহিত্য দুইভাবে ঐশ্বর্য লাভ করল: একদিকে বাঙালির নিজস্ব লৌকিক ধর্ম ও আখ্যায়িকাগুলি (Matter of Bengal) 'মঙ্গলকাব্য' রূপে বিকাশ লাভ করল; অন্যদিকে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি অমর আখ্যায়িকাও (Matter of Sanskrit) বাঙলায় অনূদিত ও রচিত হতে লাগল।[৩৫]

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস নিরন্তর রাজনৈতিক দুর্যোগ ও ক্ষমতালিপ্সুদের ক্ষমতার কামনা ও দ্বন্দ্বের ইতিহাস, যে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা প্রভাবিত করেছে অনুগৃহীত রাজকর্মচারী, এমনকি দাসদেরকেও, উদ্বুদ্ধ করেছে তাদের কূটচক্রান্তে ও বিদ্রোহে; আর তারই ফলে বিশৃঙ্খলা-অরাজকতা-অস্থিরতা আবৃত করেছে সমগ্র মধ্যযুগের রাজনৈতিক আকাশকে।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসনের শুরু। অতঃপর প্রায় পৌনে তিনশ' বছর বঙ্গ তুর্কী-আফগান শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়। ১৩৩৯ থেকে ১৪০৬ খ্রি. আবার ১৪৪২ থেকে ১৪৮১ খ্রি. পর্যন্ত সুলতান ইলিয়াস শাহ ও তার বংশধরগণকে আমরা বাংলার সিংহাসনে দেখতে পাই। মাঝে স্বল্পকালের জন্য এদেশীয় রাজা গণেশ এবং তার উত্তরাধিকারীরা বাংলায় স্বাধীন শাসক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[৩৬]

১৪৮৬ থেকে ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের এই স্বল্পকাল বাংলার সিংহাসন দাস-হাবসীগণের দখলে চলে যায়। ১৪৯৬ থেকে ১৫৩৮ পর্যন্ত হুসেন শাহ ও তার বংশধরগণকে বাংলার মসনদে শাসক হিসেবে দেখা যায়। এরপর বাংলার পট আবার পবির্তন হয় শেরশাহ যখন ক্ষমতায় আসীন হন। কররাণী ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুলাই[৩৭] রাজমহলের যুদ্ধে সম্রাট আকবরের মুঘল বাহিনির কাছে দ্বিতীয়বার পরাজিত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। এর ফলে বাংলায় আফগান শাসনের প্রায় অবসান ঘটে, মুঘল শাসনের জয়যাত্রা শুরু হয়। ১৫৭৬ থেকে ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে মুজাফ্ফর খান, খান-ই-আজম, শাহবাজ খান, সাদিক খান, ওয়াজির খান, সাঈদ খান প্রমুখ মুঘল সুবাদার কর্তৃক উত্তর পশ্চিমবঙ্গ শাসিত হয়। কিন্তু তাদের কেউই পূর্ববঙ্গের বার ভূঁইঞাদের অধিকার খর্ব করতে পারেনি। এমনকি তারা মুঘল অধিকৃত এলাকাতেও পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে সক্ষম হননি। প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে জনসাধারণের উপর চলতো অস্বাভাবিক নির্যাতন-নিপীড়ন। বিশেষ করে রাজস্ব-কর্মচারীদের শোষণ নির্যাতনে প্রজা সাধারণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা প্রজারা কিভাবে নিগৃহীত হতো তার পরিচয় পাওয়া যায় মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে। কবি বলেছেন :

> উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
> ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।

Dhaka University Institutional Repository

মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
(কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, পৃ. ৩০)

কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে এই দুঃশাসনের কিছুটা অবসান হয় মানসিংহের সুবেদারী লাভের পর। মানসিংহের প্রতি কবি মুকুন্দরামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা থেকে এই অনুমানের সমর্থন মেলে :

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।
(কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, পৃ. ২৯)

বিভিন্ন দিক বিচারে মুঘল সম্রাটদের মধ্যে আকবর ছিলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যে কারণে ইতিহাস তাঁকে সম্মানিত করেছে "মহামতি" বলে। মহামতি আকবর (Akbar the Great) নামেই এই মহান সম্রাটকে সাধারণত স্মরণ করা হয়। বাবর প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যকে সম্রাট হুমায়ুন দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করাতে পারেননি। আফগান নেতা শেরশাহকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন হুমায়ুন। শিশু মুঘল সাম্রাজ্য সাময়িকভাবে আফগানদের করতলগত হয়। এইদিক বিচারে মুঘল সাম্রাজ্যকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠা, এর ব্যাপক বিস্তার, দৃঢ়ীকরণ সাময়িক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী নীতি নির্ধারক ইত্যাদি। নানা বিষয়ে সফল ভূমিকা রেখে 'আকবর মোঘল ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছেন।'[৩৮] মহামতি আকবরের স্তুতি করার কারণ হচ্ছে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে যে শাসন-ব্যবস্থা ও জমিদারী শোষণের চিত্র এঁকেছেন 'সে হল সুলতানী তথা তুর্ক-আফগান রাজত্বের অবসান ও সম্রাট আকবরের অধিকার-বিস্তারের প্রথমাবস্থার ছবি।[৩৯]

ভারতে তখন মুঘল রাজত্বকাল। সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে (১৫৩০-১৫৫৫) বাংলাদেশ নামেমাত্র মুঘলদের অধিকারে আসে। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর (১৫৫৫) তাঁর পুত্র সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) উত্তর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা তাঁর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণে থাকে। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর তদানীন্তন বাংলার শাসনকর্তা দাউদ খান কররানীকে বহিষ্কৃত করে মুনিম খানের ওপর বাংলার শাসনভার অর্পণ করেন। এর পূর্ববর্তীকালে মুহম্মদ আদিল শাহের রাজত্বকালে শূর রাজারা বাংলাদেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। শূর রাজাদের রাজত্বকাল ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৫৬৩ সালে সম্রাট গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর তার পুত্র (নাম অজ্ঞাত) মাত্র সাত মাস রাজত্ব করেন।[৪০] অতঃপর এই তরুণ রাজা ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিদের দ্বারা নিহত হলে দেশব্যাপী দেখা দেয় অরাজকতা। এই সুযোগ গ্রহণ করেন দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্তা সুলেমান কররানী। ১৫৬৫ থেকে ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ শাসন করেন। এ সময় তিনি সম্রাট আকবরের প্রতি বাহ্যিক সৌজন্য প্রদর্শন করে রাজত্ব পরিচালনার কৌশল গ্রহণ করেন। সুলেমান কররানীর পর দাউদ খান কররানী ১৫৭২-৭৪ পর্যন্ত বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। এই দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে আকবর বঙ্গদেশে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তবে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অসহযোগিতার কারণে আকবরের শাসনকার্য বাধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে মুজাফফর খান তুরবতীর নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সোনারগাঁয়ের ঈশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ, যশোরের প্রতাপাদিত্য প্রমুখ মুঘলদের অধীনতা অস্বীকার করে সর্বদা বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। আকবর শাসনের বিরুদ্ধে এসব বৈরী ও শত্রুভাবাপন্ন শক্তি থাকা সত্ত্বেও তার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ একক শাসনের আধিপত্যে চলে আসে। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ হামিদা খাতুন নাকভীর অভিমত :

Dhaka University Institutional Repository

> And yet what Emperor Akbar had accomplished in the course of fifty years of his reign was a remarkable feat. Apart from his conquests and consolidation, the mere fact that he encountered rebellious forcess lined up against him on as many as hundred and forty four occasions shows the tremendous and overwhelming odds against which he was working complete success in a vast Empire of Akbar's size can seldom be achieved specially when one is working under the medieval conditions of 16th century Hindustan. But the extent to which Emperor Akbar did succeed is equally rare.[৪১]

শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়, বিহার এবং উড়িষ্যায়ও মুঘল প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকে। এ অবস্থায় বিরোধী শক্তিকে দমন করার জন্য সম্রাট আকবর মানসিংহকে প্রথমে বিহার ও উড়িষ্যায় সুবেদার নিযুক্ত করেন। বিহারের প্রতিরোধ দমন করে মানসিংহ ১৫৯২ সালে উড়িষ্যায় মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার সুবেহদার হিসেবে নিযুক্ত হন। মানসিংহের যোগ্য নেতৃত্বে খণ্ড-বিখণ্ড রাষ্ট্রব্যবস্থা অখণ্ডতা অর্জন করল, বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হল এবং মানুষের মধ্যে এল এক ধরনের আশা ও বিশ্বাস। মানসিংহের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এ প্রসঙ্গে আকবরের সমকালীন প্রখ্যাত ইতিহাসকার আবুল ফজল তাঁর "আকবরনামায়" লিখেছেন :

> The Rajah (Man Singh) united ability with courage and genius with strenuous action; he administered the province excellently; the refractory became obedient.[৪২]

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য রচনার সমকালীন এই রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরার প্রাসঙ্গিকতা এখানে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার ও অব্যবস্থার মধ্যে কাব্যের নায়ক কালকেতু কিংবা স্বয়ং কবি মুকুন্দরাম বসবাস করতেন, তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য কালকেতু গুজরাটে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করে। স্বদেশে বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকার জন্যই কালকেতুর গুজরাট গমন। অতএব, কাব্য-বর্ণিত রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে বাস্তব রাজনীতির সম্পর্ক যে অত্যন্ত নিবিড়, তা যথার্থভাবেই প্রমাণিত হয়।[৪৩] সমগ্র বাংলার সমাজজীবন হয়ে উঠেছিল অনিশ্চিত পাঠান ও মুঘল শক্তির ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের কারণে। আফগান শাসনের অবসান ও মুঘল অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশে প্রায়ই স্বৈরতন্ত্র দেখা দিয়েছিল, তার মূলে ছিল স্বার্থপরতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য। পুরো ষোড়শ শতাব্দী ধরেই এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। কেন্দ্রীয় শাসন না থাকার কারণে সমগ্র দেশে নেমে এসেছিল ব্যাপক অরাজকতা।

সম্রাট আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকে দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ শিথিল থাকার কারণে কোনো স্থায়ী শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে অর্থনীতিও পায়নি কোন সুদৃঢ় ভিত্তি। মধ্যযুগীয় উৎপাদন ব্যবস্থার কর্ণধার অবহেলিত কৃষকসমাজ কেন্দ্রীয় প্রশাসননীতি ও স্থানীয় প্রশাসননীতির বেড়াজাল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন তাঁর The History of Bengal গ্রন্থে। তাঁর মতে :

> The history of the years 1575-1594, is a sickening monotonous tale of local offensives with varying results but no final decision, and the temporary expansion and retreat of the imperial power, while the weak and innocent suffered at the hands of both the parties.[৪৪]

শেরশাহের আমলে রাজপদাধিকারীদের জন্য রাজস্বের একটা অংশ পৃথক করে রাখা হত। তিনি কর সংগ্রহ করে তহশীলদের জন্য রাজস্বের একটা অংশ পৃথক করে রাখতেন।[৪৫] ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ধরনের সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করতেন। 'এই সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ কালক্রমে ভূস্বামীতে পরিণত হয়। মোঘল আমলে এই ব্যবস্থা আরো বিস্তৃত হয় এবং এভাবে গড়ে ওঠে একটা আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন।[৪৬] তাদের শোষণের চিত্র বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে, সমাজ ইতিহাসকারদের ব্যাখ্যায় ধরা পড়েছে শোষণের, শিকারের, প্রতারণার জ্বলন্ত উদাহরণ।

অ. গীতা মুখোপাধ্যায়

নতুন ভূমিব্যবস্থার ফলে সরকারী তহবিলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমা দেবার দায়িত্ব ছিল জমিদার, ডিহিদার বা তালুকদারের ওপর এবং এই রাজস্ব আদায়ের তাগিদ দেবার জন্য আরও এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। নির্দিষ্ট অর্থ জমা না দিতে পারলে জমিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর পীড়ন হত। এই কারণে তারা প্রজাদের ইচ্ছামত শোষণ করে মোটা রকমের টাকার অংক নিজেদের জন্য আদায় করে রাখত। অর্থাৎ সকল উচ্চশ্রেণির অত্যাচারই শেষ পর্যন্ত পড়ত ভূমিজীবী প্রজাসাধারণের ওপর।[৪৭]

আ. অতুল সুর

এই প্রতুলতার মধ্যেও ছিল নিম্নকোটির লোকদের দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণ ছিল সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার ও জুলুম। কবিকঙ্কণ- চণ্ডীর রচয়িতা মুকুন্দরাম বলেছেন যে, যদিও ছয় সাত পুরুষ ধরে তারা দামুন্যা গ্রামে বাস করে এসেছিলেন, তথাপি ডিহিদার মাহমুদের অত্যাচারে তারা ভিটাচ্যুত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ...একজন সমসাময়িক বৈদেশিক পর্যটক (মানরিক) লিখে গিয়েছেন যে, রাজস্ব দিতে না পারলে, যে কোনও হিন্দুর স্ত্রী ও ছেলেপুলেদের নীলাম করে বেচা হতো। এছাড়া, সরকারী কর্মচারীরা যখন তখন কৃষক রমণীদের ধর্ষণ করত এর কোনও প্রতিকার ছিল না।[৪৮]

সম্রাট আকবর রাজত্বের ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন কারণ– প্রজাকল্যাণ ও সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য রাজকোষের আয়বৃদ্ধি যে অপরিহার্য এ বাস্তবতা তার অজানা ছিল না। শের শাহের রাজস্ব সংস্কার ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছিল। আকবর গভীরভাবে তা পর্যবেক্ষণ করেন কিন্তু শের শাহের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময় শের শাহের সংস্কারকে অক্ষুণ্ন রাখা যায়নি। সুতরাং নতুনভাবে সংস্কারের দায়িত্ব অর্পিত হয় আকবরের ওপর। প্রথমেই দায়িত্ব দেন দিউয়ান খাজা আবদুল মজিদ খানের ওপর। তার কাজ ছিল রাজস্ব স্থির করে দিয়ে উৎপাদিত শস্যের মূল্য নির্ধারণ। এরপর দায়িত্ব অর্পণ করেন মুজাফফর খান তুরবতীর ওপর। তিনি সহযোগিতা পান রাজা টোডরমলের। রাজস্ব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য দশজন কানুনগো নিয়োগ করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে সম্রাট এতে মনোযোগ দিতে পারেন নি। ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে গুজরাট অধিকার করার পর সম্রাট পুনরায় রাজস্ব সংস্কারে মনোনিবেশ করেন।

আকবরের রাজস্ব সংস্কারের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ফসল ও জমি পরিদর্শন বাধ্যতামূলক করা। বিভিন্ন প্রথার মাধ্যমে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো যেমন: জাবতি প্রথা, গল্লাবখশ প্রথা, নাসক প্রথা ইত্যাদি। 'কৃষকের ওপর এ সময়ে নির্ধারিত রাজস্ব ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং তা সফলভাবে আদায়ও করা হতো। উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ আদায়কে কারো নিকট অতিরিক্ত মনে হতে পারে কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে সম্রাট জিজিয়া, তীর্থকরসহ নানা ধরনের কর থেকে প্রজাসাধারণকে রেহাই দিয়েছিলেন। রায়তের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার জন্য সম্রাট রাজস্ব আদায়কারী আমীনদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে কোনো কোনো অঞ্চলে কর্মচারীদের অদক্ষতা ও অসাধুতার কারণে রাজস্ব সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি। এগুলো অবশ্যই ব্যতিক্রম ঘটনা এবং তা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত দায়। এ কারণে সম্রাটের রাজস্ব সংস্কারকে দায়ী করা যায় না।[৪৯] সম্রাট আকবরের সময় ভূমির

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান মালিকানাস্বত্ত্ব ছিল রাষ্ট্রের তথাপি 'জমিদার' নামে ব্যক্তিগত জমির মালিকের অস্তিত্বও ছিল। জমিদার কথাটি আকবরের সময়ই বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল। একদিকে রাজস্ব আদায়কারীরা যেমন কৃষকদের শোষণ করতো, তেমনি আবার শাসক-শ্রেণির সঙ্গে রাজস্ব আদায়কারী ও জমিদারদের মধ্যে অর্থ ভাগাভাগি নিয়েও সংঘর্ষ হতো। কৃষক, রাজস্ব আদায়কারী, জমিদার এবং শাসক-শ্রেণির মধ্যে এ সংঘর্ষকে সমাজ ইতিহাসকাররা শ্রেণিতে শ্রেণিতে সংঘর্ষ বলে আখ্যায়িত করেছেন :

> The pre-colonial South Asian Society was marked by a developed class structure, with in which two major contradictions stood pre-eminent : One, the contradiction between the suling class and the peasantry, arising out of the demand for tax-rent; and the other, between the ruling clas ad Zamindars, resting on the conflict over the sharing of the surplus.[৫০]

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলে* 'ডিহিদার' শ্রেণির পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট আকবর এই 'ডিহিদার' নিযুক্ত করেছিলেন রাজস্ব আদায়ের জন্য। 'ডিহিদার'রা ছিল ক্ষুদ্র জমিদার শ্রেণিভুক্ত। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত একটি মৌজা, আর কতকগুলি মৌজা নিয়ে একটি 'ডিহি'। ডিহিদারদের একটি ডিহির ভূখণ্ডের সরকারী অধিকার দেয়া হত। তাদের কাজ রাজস্ব আদায় করা তবে এই অর্থ তারা নিজেরাও ভোগ করত। রাজস্বের কিয়দংশ রাষ্ট্র পালনে জমা দিত, বাকি অংশ নিজেরা ভোগ করত। রাজস্ব আদায়ের নামে ডিহিদাররা প্রজাসাধারণের উপর চরম অত্যাচার, নিপীড়ন চালাত। ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে স্বয়ং মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার পৈতৃক নিবাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক মুহম্মদ আব্দুর রহিম এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

> The Dihidars... originally entered into contract with the government and they were given the right to collect revenues of some specified territories or their promise to pay stipulated sums of money to the state.[৫১]

মুঘল আমলে বাংলার কৃষক শ্রেণি ও কৃষি ব্যবস্থা নতুন রূপ ধারণ করে। কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সে সময়ের কৃষি ব্যবস্থাপনাকে 'জায়গীর জমি ও খালিশা জমি', এই দুই খাতে বিভক্ত করা হয়। রাজস্ব আদায়ের উক্ত বিবিধ ব্যবস্থাপনায় ক্রমে গড়ে ওঠে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যাদের 'রাজস্ব কৃষক' বা 'রেভিনিউ ফার্মার' বলা হতো।[৫৮] রাজস্ব আদায়কারীরা অনেক সময় জমিদারদের কথামত চলতে বাধ্য ছিল না। বরং রাজস্ব আদায়কারীরাই কখনো কখনো আমলাতান্ত্রিক উপায়ে জমিদারদের উপর প্রভাব বিস্তার করত।[৫৩]

মুঘল আমলে বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর ক্ষমতার বিন্যাসে পাঁচটি প্রধান স্তর বা শ্রেণি শনাক্ত করা হয়েছে। সমালোচকের মতে এই শ্রেণিগুলি হচ্ছে, (ক) রাজা বা রাষ্ট্র, (খ) জায়গীরদার, (গ) চৌধুরী, লস্বরদার, মণ্ডল, মাতব্বর ও সরপঞ্চ পদবীধারী ব্যক্তিবর্গ, (ঘ) 'খোদকাস্ত' কৃষক এবং (ঙ) 'পাইকাস্ত' কৃষক।[৫৪] 'পাইকাস্ত' কৃষকরাই পরবর্তী সময়ে শোষণ ও জনসংখ্যার চাপে কালক্রমে পরিণত হয় ভূমিদাসে। অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঠান শাসনামলে বাংলায় 'লগ্নিপুঁজির' প্রচলন হওয়ায় গ্রামীণ সমাজকাঠামোয় এক ধরনের পেশাদার মহাজন শ্রেণির উদ্ভব হয়। এসব বিবেচনা করে মুঘল আমলে ভূমি ব্যবস্থা ও লগ্নিপুঁজির উপর নির্ভরশীল সমাজকে মার্কসবাদী লেখক ইরফান হাবিব পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন।[৫৫]

এক. জায়গীরদার, জমিদার, রাজস্ব সংগ্রহকারী মহাজন ও ব্যবসায়ী, দুই. ধনী কৃষক; তিন. সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যস্তরের কৃষক; চার. নিম্নস্তরের কৃষক এবং পাঁচ. ভূমিহীন কৃষক।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত শ্রেণিগুলিকে আবার দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটা সংখ্যালঘিষ্ঠ ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন। আর দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পর্যন্ত সবগুলি শ্রেণির সমন্বয়ে গঠিত গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এদের প্রত্যেকটি উৎপাদনের সঙ্গে কম বেশি জড়িত। সমাজবিজ্ঞানীগণ মধ্যযুগের বাংলার সমাজকে যে চারটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেন তা হল :

ক. সমাজের অর্থনৈতিক সম্পদের বৃহৎ অংশের মালিক; খ. শিল্পের মজুরি অর্জনকারী; গ. অবসরহীন অবশিষ্ট গোষ্ঠী; যাদের ভেতর রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শ্রমজীবী ও বিভিন্ন উদারনৈতিক পেশাধারী লোকজন; এবং ঘ. কৃষক। এই শ্রেণিগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজপাদোপজীবী, ভূম্যধিকারী, আমলা, পুরোহিত, কৃষক, শ্রমশিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী, মহাজন এবং কায়িক শ্রমিক।[৫৬]

মুঘল আমলের সামন্তসমাজে রাজার পরেই ছিল অভিজাত শ্রেণির স্থান। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পাশ্চাত্যের অভিজাত শ্রেণি ছিল যেখানে জমির মালিক, সেখানে ভারতীয় অভিজাতরা ছিল কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়কারী।[৫৭]

আবার গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে জড়িত সামাজিক শ্রেণিগুলো হচ্ছে (পর্যায়ক্রমে) গ্রামের ক্ষমতাবান হিন্দু উচ্চ জাতিবর্ণের লোক, কৃষক ও গ্রামীণ কারিগর, ভূমিহীন মজুর, গ্রামের সংগতি সম্পন্ন লোকদের বাড়ি ঘরে নিয়োজিত চাকর-বাকর, গ্রাম্য ঝাড়ুদার ও আবর্জনা পরিষ্কারক।[৫৮] নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বাঙালিসমাজ গঠনে উচ্চ-নিম্ন তথা অন্ত্যজ শ্রেণির ভূমিকা স্পষ্টত তার বিবরণ দিয়েছেন।অন্ত্যজ শ্রেণিকে অবস্থান দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> রাজা, রাজপাদোপজীবী, শিল্পী, বণিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, ভূমিবান সম্প্রদায় প্রভৃতি শ্রেণীর অসংখ্য লোকের বিচিত্র প্রয়োজনের সেবার জন্য ছিল আবার অগণিত জনসাধারণ। ইহাদের অশন-বসন, বিলাস-আরাম, সুখ-সুবিধা, দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র কর্তব্য প্রভৃতি সম্পাদনার জন্য প্রয়োজন হইত নানা শ্রেণীর, নানা বৃত্তির সমাজসেবক ও সমাজশ্রমিক শ্রেণীর অসংখ্যতর 'ইতর' জনের–প্রাচীন লিপিমালায় যাঁহাদের বলা হইয়াছে 'অকীর্তিত' বা অনুল্লিখিত জনসাধারণ। ইঁহাদের ছাড়াও সমাজ চলিত না, এই অকীর্তিত জনসাধারণও সমাজের অঙ্গবিশেষ এবং সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ইঁহাদেরও স্থান ছিল। অথচ, ইঁহাদের কথাও আমরা কমই জানি। ইঁহাদেরও ধর্মবিশ্বাস ছিল, দেবদেবী ছিল, পূজানুষ্ঠান ছিল, সংস্কৃতির একটা ধারা ছিল। উৎপাদিত ধনের খানিকটা-খুব স্বল্পতম অংশ সন্দেহ নাই–ইঁহাদের হাতে আসিত কোনও না কোন সূত্র ধরিয়া। এসব সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আজও যথেষ্ট সচেতন নয়। কাজেই, রাজা, রাষ্ট্র, রাজপাদোপজীবী, শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ী, শ্রেষ্ঠী,মানপ, ভূমিবান মহত্তর, ভূমিহীন কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবক, সমাজশ্রমিক, 'অকীর্তিতান্-আচণ্ডালান' প্রভৃতি সকলকে লইয়া প্রাচীন বাঙলার সমাজ। ইঁহাদের সকলের কথা লইয়া তবে বাঙালীর কথা, বাঙালীর ইতিহাসের কথা এই অর্থেই আমি 'বাঙালীর ইতিহাস' কথাটি ব্যবহার করিতেছি। বাঙালী সমাজও এই বৃহত্তর অর্থেই বুঝিতেছি।'[৫৯]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অভিজাত শ্রেণির নীচেই ছিল বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব।[৬০] এই সমাজের অপর গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী হচ্ছে যাজক বা পুরোহিত শ্রেণি। তাঁরা সমাজে অত্যন্ত সম্মানজনক অবস্থানের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু অভিজাত শ্রেণি হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি এই শ্রেণিটি। সমাজের নিম্নস্তরে ছিল সাধারণ কৃষক শ্রেণি ও কুটির শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রমিক সমাজ।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অন্ত্যজ শ্রেণিটি ছিল শোষণ, বঞ্চনা আর অত্যাচারের শিকার। স্থানীয় জমিদার ও সামন্তপ্রভুরা যেমন শোষণ করতো তেমনি অত্যাচার করতো পুরোহিত সম্প্রদায়ের লোকেরা। এরূপ একটি চিত্র প্রাণগোবিন্দ দাশ তাঁর 'রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে উন্মোচন করেছেন :

> জমিদার ও পুরোহিত সম্প্রদায় একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে অত্যাচার চালাতেন এবং ভূমিদাস ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণী যাতে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে না পারে তার জন্য তাঁরা জনগণের মনে বিপ্লব বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

> মনোভাব নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করে তৈরি করেছিলেন। পুরোহিত ও সামন্তপ্রভুরা জানতেন, জনগণ রাজনীতি সচেতন হয়ে পড়লে তাঁদের শোষণের গতি অব্যাহত থাকবে না। ধর্ম, পাপ, পুণ্য, আনুগত্য এবং ভগবান ইত্যাদি ধারণাগুলো সম্পর্কে যাজকরা অবিরাম প্রচার চালাতেন। আর এ কাজে সহায়তা করতেন জমিদাররা। সমাজের স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হোক– এটা কারুর কাম্য ছিল না। মানুষ যাতে প্রগতিমূলক চিন্তাধারা গ্রহণ করতে না পারে তার জন্য তাদেরকে অন্ধ-সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা হত। সেইজন্য সমস্ত মধ্যযুগের সমাজকে বলা হয় 'শ্রেণীসমাজ' এবং এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শোষণ।[৬১]

সমাজের সেইসব অধঃস্তন মানুষের উপর শোষণ ছিল সেই সমাজের সাধারণ চিত্র কিন্তু তাদের উপর শোষণ ও অত্যাচার যখন চরম আকার ধারণ করত তখন তারা রাজ্য ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা সে সময় ধর্মান্তরিত হয়েছিল। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাংলাদেশের নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে এই ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা বিভিন্ন যুগে পরিলক্ষিত হয়েছে।

যেমন : প্রথম ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়াটি ঘটে, প্রাচীনযুগে পালরাজাদের আমলে। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থার নিষ্পেষণের শিকার সাধারণ শ্রমজীবীদের একাংশ সে সময় বৌদ্ধধর্মের 'অহিংসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। দ্বিতীয়বার এদেশে মুসলমানদের আগমনের ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা পুনরায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। ...তৃতীয় বারের মতো ধর্মান্তর-প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় মোগল যুগের শেষ পর্যায়। এ সময় 'খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচারণায় এবং কিছু আর্থিক সুবিধা প্রদানে অন্ত্যজশ্রেণী ও শ্রমজীবীদের একটি বড় অংশ ধর্মান্তরিত হয়।'[৬২] মুঘল আমলে হিন্দু অন্ত্যজ শ্রেণির ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করেছেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপধ্যায় :

> একদিকে রাষ্ট্রের চণ্ডনীতি, নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের অপ্রীতিকর ব্যবহার, আর একদিকে উদারতর ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্বের আহ্বান, পীর-ফকির-মুরশিদের অধ্যাত্ম কলা-কৌশল ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দু সমাজের এক প্রান্তে ধর্মান্তীকরণের যে ধারা বহিয়া চলিয়াছিল, তাহা মুঘল যুগেও বিশেষ হ্রাস পায় নাই।[৬৩]

প্রাচীন বাংলায় বর্ণবিন্যাস ও শ্রেণিবিন্যাস ছিল প্রায় এক ও অভিন্ন। বংশগত পরিচয় ও বর্ণপ্রথার উপরই সমাজে বৃত্তিনির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হতো। বর্ণ ও বৃত্তি পরবর্তীতে মধ্যযুগের মানুষের শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক, ইতিহাসবেত্তা নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য :

> বৃত্তি বা জীবিকা ছিল বর্ণনির্ভর আর বর্ণ ছিল জন্মনির্ভর। বৃত্তি যেখানে বর্ণ অনুযায়ী সেখানে বর্ণ ও শ্রেণি একে অন্যের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিবে এবং শ্রেণীর মর্যাদাও সেই সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী হইবে তাহা বিচিত্র নয়।[৬৪]

মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি বরং তারা সমাজের দাস, এই ছিল উচ্চবিত্তদের ধারণা। শুধু উচ্চবিত্তই নয় মুঘল আমলের রাজশক্তিও আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল অন্ত্যজ, নিম্নবর্গের উপর যেন তারা স্বপেশায় নিয়োজিত থাকে। বস্তুত অন্ত্যজ শ্রেণি ও নিম্নবৃত্তিজীবীরা ধর্মান্তরিত হয়ে বৃত্তি, আর্থিক সাশ্রয় কিংবা সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই, শাসক বদলের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম বদলেছে বহুবার কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের অবস্থান থেকে গেছে একই স্তরে। ঘটেনি শোষণ, বঞ্চনা ও দারিদ্র-দুর্দশার পরিসমাপ্তি।[৬৫]

অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার, সমাজের অন্তে বসবাসকারী একটি শ্রেণির সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ, অধিকার-অনধিকারের চিত্র সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। যাঁর সম্পর্কে বলছি সেই শ্রেণিটি, 'নারী'। আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় পরিবার ছিল মাতৃপ্রধান। পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদন শক্তির বিকাশের সাথে সাথে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন উপকরণের

Dhaka University Institutional Repository

আবিষ্কার, একই সঙ্গে মানসিকশক্তির বিকাশ ও অভিজ্ঞতাবৃদ্ধি উন্নয়নের হারের দ্রুত অগ্রগতি সাধন করে, জন্ম দেয় সামাজিক শ্রমবিভাগের। নারীর কর্মক্ষেত্র প্রথম বারের জন্য হয় সীমিত। ব্যক্তি স্বার্থকে দৃঢ়মূল করার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় দাসযুগ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণি-বৈষম্য ও শ্রেণি শোষণের মত নারী নির্যাতনও দাসযুগেই সর্বপ্রথম শুরু হয়। এ যুগে পৌঁছেই পুরুষ নারীকে তার স্থাবর সম্পত্তি ও ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে, নারীর উপর চলে অকথ্য নির্যাতন।

দাস সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে সমাজব্যবস্থার উত্তরণ ঘটে সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায়। এ সময় জীবিকার প্রধান উপায় ছিল কৃষি। এ যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সামন্ততন্ত্র আখ্যা দেয়া হয়েছে। এই সমাজব্যবস্থায় সামাজিক অনাচার চরম আকার ধারণ করে। এই সমাজব্যবস্থায় উপনীত হয়ে নারী সামন্ত-প্রভুগণের বিলাসসামগ্রী ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই শুধু বিবেচিত হয়নি, বেশ্যাবৃত্তি স্বাভাবিক ব্যবস্থা হিসেবে বহুল প্রচলিত হয়। বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহের কতিপয় নারী চরিত্রের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে। অথচ অন্ত্যজ শ্রেণির এসব নারীদের তাঁর কৃতকর্মের জন্য তাকে পুরস্কৃত না করে তথাকথিত পুরুষশ্রেণি তাঁদেরকে নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করেছে।

নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী নারীকে সম্মান প্রদর্শন করে কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> সেকালে সাধারণত উচ্চবর্ণের নারীর নিজস্ব কোন অর্থকরী পেশা ছিল না। কিন্তু চরম পারিবারিক দারিদ্র্যই নিম্নবর্গের নারীকে বিভিন্ন অর্থকরী পেশায় টেনে এনেছিল। আর এসব নারীরা সামাজিক মর্যাদায় অবহেলিত এবং শিক্ষায় অতি অনগ্রসর থাকলেও দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। আজও সামাজিক উৎপাদন ক্ষেত্রে এদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নানাবিধ অর্থকরী বৃত্তিতে থাকা সত্ত্বেও প্রধানত দারিদ্র্যের কারণেই এদের পারিবারিক জীবনেও একটি বিশেষ মাত্রা ছিল এবং এখনও আছে। আর এসব কারণেই উচ্চবর্গের নারীদের থেকে নিম্নবর্গের নারীরা অনেকখানি স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখেন।[৬৬]

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী সব নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানই হল তথাকথিত শূদ্র, পাপী এবং পশুর সাথে একাসনে। তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণভাবে পাহাড়ে, বনাঞ্চলে, সমুদ্রোপকূলে এবং সমাজের এক প্রান্তে বসবাসকারী (অন্তেবাসী) তথাকথিত শূদ্র, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, ব্রাত্য ও দলিত নারীরা উচ্চবর্গের নারীদের থেকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। মঙ্গলকাব্যসমূহে যে সকল বীরাঙ্গনা নারীদের স্থান দেয়া হয়েছে তাঁরা জাতিগতভাবে নিম্ন, অন্তেবাসী, অধিকারহীনা হলেও সংগ্রামী জীবনে পুরুষের সমকক্ষ, কখনও কখনও তাঁদের বীরত্বে পুরুষের ভূমিকা ম্লান হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ :

১. Sushil Kumar De, *Bengali literature in the Nineteenth Century* (Calcutta : Calcutta University, 1962), p. 5

২. আবদুল খালেক, *অন্ধকার যুগ ও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য চর্চা* (ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪), পৃ. ১২

৩. ক্ষেত্র গুপ্ত, *প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন* (কলকাতা : সাহিত্য প্রকাশ, পরিমার্জিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩), পৃ. ১

৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* (কলকাতা : ৮ম সংস্করণ, ১৯৭৪), পৃ. ২৭

৫. কণক বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা : প্রথম সংস্করণ), পৃ. ২৪-২৫

৬. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ*,(কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪১৫), পৃ. ৩৯

৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা* (কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, প্রথম সংস্করণ), পৃ. ১৯

৮. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ,১৯৪৮), পৃ. ৫৯

৯. আবদুল খালেক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৭

১০. Abdul Karim, *The Muslim Rule in India* The Asiatic Society of Pakistan 1959, p. 35

১১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৭৭), পৃ. ১০৪

১২. *History of Bengal* প্রথম খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৬১৮

১৩. আবদুল খালেক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

১৪. অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাঙলা কাব্যে মধ্যযুগ* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০৫), পৃ. ৪২

১৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* প্রাচীন যুগ, (কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৭ম সংস্করণ , ১৯৮১), পৃ. ২১০

১৬. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১১), পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ঐ, পৃ. ২৩৩

১৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯

১৯. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪

২০. ঐ, পৃ. ২৩২

২১. ঐ, পৃ. ২৫৭

২২. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাঙলা সাহিত্য* (ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৫৫), পৃ. ১২

২৩. দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস* (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা: লি: ১৯৭৫), পৃ. ৯-১০

২৪. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (কলকাতা : স্যান্যাল এন্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০১), পৃ. ৩৮

২৫. Kazi Abdul Mannan, *The Emergence and Development of Dobhasi literature in Bengal* (Dhaka : Department of Bengali and Sanskrit, University of Dhaka ,1966),p. 4

২৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৮), পৃ. ৮

২৭. Edward. C. Dimock, *The thief of love* (The University of Chicago press,1963), P. 167

২৮. ক্ষুদিরাম দাস, *বৈষ্ণব রস প্রকাশ* প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং, ১৩৭৯), পৃ. ৭

২৯. ঐ, পৃ. ৮

৩০. শামীম আরা, "মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য : অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* সপ্তবিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪১৬/ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ২১৩

৩১. জয়া সেনগুপ্তা, *মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী* (ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, ৩৬, বাংলাবাজার, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০), ভূমিকা, পৃ. ১

৩২. গোপল হালদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য* (কলকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৬৪), পৃ. ১৪৬-১৪৭

৩৪. *The History of Bengal* Volume II, Published by The University of Dhaka, p. 102

৩৫. গোপাল হালদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৩৬. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৬), পৃ. ১০

৩৭. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৪৮৯

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস* মধ্যযুগ : মোগলপর্ব, (ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, পুনর্মুদ্রণ , মার্চ ২০০৭), পৃ. ৬২

৩৯. গীতা মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা* (কলকাতা : কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮১), পৃ. ১

৪০. Jadu-Nath Sarkar (ed.), *The History of Bengal* Vol. II (Dacca : The University of Dacca, 1972), p. 180

৪১. Hamida Khatoon Naqvi, "Incidents of Rebellions During the Reign of Emperor Akbar" in S. Nurul Hasan et al (ed.) *Medieval India-A Miscellany* Vol. II, (Bombey : Asia Publishing House ,1972), p. 164-165

৪২. Jadu-Nath Sarkar (ed.), op. cit., note 12, p. 207

৪৩. শিপ্রা সরকার, *সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য* (ঢাকা : আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, প্রথম আজকাল প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৭), পৃ. ৫৩

৪৪. Jadu-Nath Sarkar (ed.), op. cit., note 13, p. 193

৪৫. রামশরণ শর্মা, *ভারতের সামন্ততন্ত্র* (কলকাতা : কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭), পৃ. ১৫৪

৪৬. ইরফান হাবিব (সম্পাদক) , *মধ্যকালীন ভারত* প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯০), পৃ. ৯৯

৪৭. গীতা মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৪৮. অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন* (কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৮৬), পৃ. ২৪৩

৪৯. এ কে এম শাহনাওয়াজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

৫০. Irfan Habib "Theories of Social Change in South Asia" (Dhaka : *The Journal of Social Studies* No. 33, Dhaka CSS ,1986), pp. 45-46

৫১. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal* Vol. II, (Karachi : Pakistan Publishing House, 1967), p. 113

৫২. রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৫৩

৫৩. গীতা মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৫৪. রংগলাল সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৫৫. Irfan Habib, op. cit., pp. 45-46

৫৬. মুস্তফা পান্না, *বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৮৫), পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. রংগলাল সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

৫৮. Angus Maddison, *Class Structure and Economic Growth : India and Pakistan Sicne the Mughals* (London : 1917), p. 33

৫৯. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব), (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৪১৬), পৃ. ৭

৬০. এ. কে. নাজমুল করিম, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৯), পৃ. ১৫২; রংগলাল সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

৬১. প্রাণগোবিন্দ দাশ, *রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত* (কলকাতা : সেন্ট্রাল, ১৯৮৮), পৃ. ৫৫-৫৬

৬২. মুস্তফা পান্না, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৬৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* তৃতীয় খণ্ড, (প্রথম পর্ব : সপ্তদশ শতাব্দী) (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ , ২০০৬-২০০৭), পৃ. ৩১-৩২

৬৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), (কলকাতা : ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় ও লেখক সমবায় সমিতি, ১৩৮২), পৃ. ১৬০-৬১

৬৫. মুস্তফা পান্না, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৬৬. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, *নারী শ্রেণী ও বর্ণ* (নিম্নবর্গের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান), (কলকাতা : মিত্রম, প্রথম মিত্রম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯), পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় :
মনসামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ

সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন

মনসামঙ্গল কাব্য সৃষ্টির পেছনে সামাজিক ইতিহাসের স্বাক্ষর যেমন পাওয়া যায়, তেমনি কাব্যের মর্মকথায় সমাজ ও সমাজের আভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডসমূহের এক বিশাল ক্যানভাস দৃষ্টিগোচর হয়। সমাজের উচ্চ শ্রেণিটি জনমানসের যে অংশকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল, প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যই তাদেরকেই গৌরবের আসন দিয়েছে। যখনই অমানবিক রীতি-নীতির বেড়াজালে সাধারণ মানুষ ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ আবদ্ধ হয়ে মুক্ত হতে পারছিল না, তখনই লোকায়ত ধর্ম, মত ও পথকে আশ্রয় করেই সেইসব গণ-জীবনে নেমে এসেছিল আনন্দ। জাগরিত হয়েছিল তাদের অধিকারের আন্দোলন। একজন সমাজ-বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন :

> ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যাধীন শ্রেণীসমাজের সংস্কৃত দেবতাদের মুখোমুখি যখন দাঁড়াতে হল আদিম সমাজের এই মানুষদের, তখন শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনেই তাদের দেবতাদের আদিম অমার্জিত জঙ্গীরূপকে আরো তীব্র করে নিতে হয়েছিল, ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই লৌকিক দেবতারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।[১]

সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণি বলতে যাদের স্থান এই অংশের আলোচ্য বিষয় তারা দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ থাকতে চায়। কারণ তার চাহিদা স্বল্প কিন্তু আবশ্যিক বিধায় এই শ্রেণির মানুষের কাছে অসহনীয় পরিস্থিতিতেও ইহলোকের সুখ-শান্তিটিই মুখ্য, পরলোক নয়। পৌরাণিক দেবতার কাছে মানুষ স্বর্গ প্রার্থনা করে কিন্তু লৌকিক দেবীর কাছে মানুষ কামনা করে তাৎক্ষণিক সুখ-সম্ভোগ তথা জীবনের সুখ-শান্তি।

সমাজে যাদের স্থান নিম্নে তারাই নিম্নবর্ণের তা নয়; অর্থ যাদের নেই, অর্থনৈতিকভাবে যারা পঙ্গু, তারাও সমাজের চোখে এক ধরনের নিম্নবর্ণ, অন্ত্যজ। এদের অবস্থান সমাজের অন্তে, সমাজ যাদের অন্ত্যজ আখ্যা দিয়েছে তাদের মূলোৎঘাটন করাই এখন মুখ্য উদ্দেশ্য।

মনসামঙ্গল কাব্যের সমাজে যে দাস প্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় তাদের জীবন-ব্যবস্থা খুব একটা সহজ ছিল না। মনসামঙ্গলের কাজী হাসানের বাড়িতে আমরা যে দাসদের কর্মরত দেখি এরা সবাই দাস নয় ,এদের মধ্যে ক্রীতদাসও রয়েছে। ক্রীতদাসের অস্তিত্ব এটাই প্রমাণ করে যে, সমাজে একটি শ্রেণির অর্থ আছে যারা দাস ক্রয় করতে পারে। আর অন্য শ্রেণিটি দাসরূপে বিক্রি হয়ে যায় ,এটি ভয়াবহ অবস্থার সংকটকেই নির্দেশ করে। দাসদের সেবায় উচ্চকোটির মানুষেরা বেশ সুখেই ছিল আবার যখন এই দাসেরাই বাজারে পণ্যের মতই কেনা-বেচা হচ্ছে, কিংবা বিয়ের আসরে যৌতুক সামগ্রীর মত আসবাব হিসেবে আদান-প্রদানের বস্তুতে পরিণত হচ্ছে তখনই সমাজের উচ্চ-নিম্ন ধারণাটি প্রকাশিত হয়। এভাবেই সমাজের নীচুতলার মানুষগুলো আরও নীচু অন্ত্যজ'
ঽ

ওঢ়ঽ;ঢ়;তে পরিণত হয়, এদের অন্তে আর কোন স্তর থাকে না।

সমাজে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে যেমন নিম্ন আয়ের ছিল ,বর্ণগত দিক থেকেও তারা সামাজিক অসাম্যের পদতলে পতিত হত। তাই 'এদের' পতিতও বলা হয়। সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> আর এই বর্ণের উৎপত্তি ঘটেছিল প্রাক-শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যা পরে শ্রেণীসমাজে দৃঢ়মূল ও পবিত্রীকৃত হয়ে উঠে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সামাজিক অবস্থা নারী জীবনকে সবচেয়ে বেশি কলঙ্কিত করেছিল যে তিনটি প্রথা তা হল কৌলিন্য, সতীদাহ ও দাস-দাসী কেনা-বেচা।[৩] আজীবন পরাধীন দাসী-বাঁদীরা মনিবদের ভোগ বিলাসের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও মনিব কর্তৃক বাঁদীর গর্ভে যদি কোন সন্তান জন্ম নেয় সে সন্তান না পায় সামাজিক স্বীকৃতি না পায় সামাজিক মর্যাদা। এরাও এক ধরনের 'পতিত' শ্রেণি হিসেবে সমাজে বসবাস করতে থাকে।

মনসামঙ্গল কাব্যে নর্তকী ও দেহ-পসারিণীর যে শ্রেণিটি চোখে পড়ে, অন্ত্যজ অন্যান্য শ্রেণির মতো এদের পুঁজি যেমন ছিল না তেমনি সামাজিক কোন অবস্থানও ছিল না। অথচ বাধ্য হয়ে বা উচ্চ শ্রেণির সুখ-সম্ভোগের জন্য তারা এই পেশা গ্রহণ করেছে। বেহুলা 'নটী' সেজেই দেব সভায় নৃত্য করেছিল সে 'নটী' হয়ে তবেই তার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা পেয়েছিল। আর ফিরে পেয়েছিল ছয় ভাসুরের জীবন এবং শ্বশুরের ডুবে যাওয়া ধন-সম্পদ। নটিনীরা নৃত্যগীত পরিবেশন করে যে অর্থ বা উপহার পায়,তাই দিয়ে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। নটীর জীবনে সাধ-আহ্লাদ বলে কিছু নেই, তার ভালোবাসতে নেই, কিন্তু তার জীবনে প্রেম আসে এবং সেই প্রেম ব্যর্থ প্রেমে পরিণত হয়। অভিজাত শ্রেণির পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের ব্যবহার করা হত। বিশ্লেষকের মন্তব্য :

> নারীর পতিতাবৃত্তি তখনকার দিনে পরবর্তী যুগের বিভিন্ন দেশের ধনতান্ত্রিক সমাজের মত আইন-কানুন স্বীকৃতি পণ্য-চরিত্রে পরিণত না হলেও অলিখিতভাবে সামাজিক স্বীকৃতি তার পিছনে ছিল। আর রাজা-রাজড়া, কুলীন ব্রাহ্মণ অভিজাত শ্রেণীর বেলায় তো কোন বাঁধা নিষেধই ছিল না।[৩]

মধ্যযুগের সমাজ সাধারণ মানুষের শ্রমে গঠিত একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে স্তর বিভাজন, শ্রেণি-ক্রমবিন্যাস চোখে পড়ার মতো। কাব্যগুলোর মূলরস আবর্তিত হয়েছে সাধারণ মানুষ তথা শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উৎসব, খাদ্য, পোশাক, অলঙ্কার, ঘর-গৃহস্থালী , সংগ্রাম-প্রতিরোধ প্রভৃতি পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার রূপায়ণের মধ্য দিয়েই।

মনসামঙ্গল কাব্যের সমাজে ধনীদের কথা এসেছে সমাজের উচ্চ-নীচ সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বৈষম্যকে তুলে ধরার জন্য। 'দেবখণ্ডে' দেবতাদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তারা মূলত 'তৎকালীন সমাজের মানব চরিত্রেরই আদর্শে রচিত, তাদের চরিত্রে দেবত্বের লেশমাত্র নেই।'[৪] মনসা এখানে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা পরায়ণ বিবেকহীনা এবং হিংস্র আক্রমণকারিণীর প্রতীক। আপন শক্তি প্রদর্শন করার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত। মধ্যযুগের সেই সমাজ কেমন ছিল তার বর্ণনা একজন কাব্য বিশ্লেষকের ভাষায় :

> বাংলার মধ্যযুগ নানা অসংগতি বিশৃঙ্খলায় চিহ্নিত। বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সঙ্গে মিশেছে সমাজের আভ্যন্তরীণ গলদ, শ্রেণীগত বৈষম্য বর্তমান ; সুতরাং উৎপীড়ন ও সুদ বট্টাভোগী মহাজনরা রীতিমত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করেছে। রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়, স্থানীয় সংহত জীবন বিন্যাসের অভাব ও সামাজিক অসংগতির চাপে বৃহত্তর জনসমষ্টির জীবন নানাদিক থেকে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। জীবনে স্থিরতা নেই, সুখ অচিন্তনীয়, শান্তি সুদূর পরাহত।[৫]

এই বৃহত্তর জনসমষ্টি হচ্ছে অন্ত্যজ শ্রেণি সমাজ যাদেরকে নিম্নে স্থান দিয়েছে , না আছে তাদের অর্থ না আছে তাদের পদমর্যাদা। 'হিন্দু সমাজের শোষণ এবং অবমাননা নীতির ফলেই নিম্নশ্রেণির মধ্যে বহু মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল।[৬] এই কারণটি ছাড়াও আরও কিছু কারণ রয়েছে যা হিন্দু সমাজের সামাজিক অবস্থানকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। এদেশের প্রশাসনিক যন্ত্রটি মুসলমানদের হাতে চলে যাওয়ার ফলে হিন্দু ধর্মের প্রচার প্রসার অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

সমাজের উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ধর্মীয় দ্বন্দ্বের কারণে এইসব সাধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষ তাদের দেবতা শ্রেণির প্রতি আস্থা হারিয়েছে। এছাড়া বহিঃশক্তির বার বার ধর্মের উপর আঘাত ও

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণের কোনরূপ প্রতিকার না পেয়ে সাধারণ মানুষ ধর্মের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে পারেনি। তবে এটাও সত্য যে, মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় নিম্ন-শ্রেণিটির মধ্যে ধর্মের পরিবর্তন সূচিত হলেও তাদের পেশার পরিবর্তন নিশ্চিত করতে পারেনি। যার ফলে স্ব-স্ব বৃত্তি নিয়েই তাদেরকে জীবন যাপন করতে হয়েছে। মধ্যযুগের বর্ণ ব্যবস্থার অধীন সমাজের সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল এই, 'মানুষ সমাজের দাস।'[৭] তাই সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রম যথাযথ সম্পন্ন করাকে নিম্নশ্রেণির, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ কুলাচার বা ধর্মাচার জ্ঞান করত।

মনসামঙ্গল কাব্যে যে শ্রমজীবী শ্রেণির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সামাজিক ভাবে তারাও নিম্নশ্রেণির, অন্ত্যজও বলা যায় কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে অর্থ নেই এবং সমাজের অন্তে যাদের বসবাস এমন শ্রেণিটিও অন্ত্যজ জ্ঞান করে গবেষণার বিষয় নির্ধারিত হয়েছে। লখিন্দরের বাসর ঘর তৈরির জন্য চাঁদ সদাগর কামারদের নিয়োগ করেছে। কামার শ্রেণির অন্তরে প্রচণ্ড ভয় পাছে কাজের ত্রুটির কারণে চাঁদ সদাগর তাদেরকে মারধর করে এক্ষেত্রে বোঝা যায় যে, সমাজে এসব অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ ভয় পেত উচ্চশ্রেণির সমাজ প্রভুদের আবার চাঁদ সদাগর ভাগ্যদোষে সব হারিয়ে দিনমজুরের কাজ করেছে সেখানে তার যে নিয়োগকর্তা, সে এক মণ্ডল। জগাই মণ্ডল 'আগে কর্ম পরে ভাত' এই শর্তে চাঁদকে কাজে নিয়োগ করে। এ থেকে এটা প্রমাণিত যে মালিকশ্রেণি তথা উচ্চশ্রেণির অত্যাচার সহ্য করত শ্রমিক শ্রেণিটি।

মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল এমন একটি সময়ে যখন মানুষ ছিল আত্মশক্তিহীন। এমতাবস্থায় অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না উচ্চশ্রেণির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের। অন্যদিকে উচ্চশ্রেণির মানুষগুলোও ততটা আন্তরিক ছিল বা যতটা ছিল স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্টত যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সব সময় ধরেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালরাজা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেনরাজা এবং ইসলামপন্থী পাঠান-মুঘলসহ সকল শাসন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা একচ্ছত্রভাবে যে গোষ্ঠী বা শ্রেণি ভোগ করে এসেছে, তারা মূলত ব্রাহ্মণ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈদ্য ও কায়স্থরা। ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের অবস্থান রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো না কোনো সময় ওঠা নামা করলেও সামাজিক জীবনে তা অব্যাহত ছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে। বাংলাদেশের সমাজের মৌল কাঠামোর প্রধান উপাদান যেমন ভূমিব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বরাবর 'উচ্চ জাতি-বর্ণযুক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল।[৮] এই উচ্চ জাতি বর্ণ-ভুক্ত মধ্যে ব্রাহ্মণদের ছিল নিরঙ্কুশ আধিপত্য। কারণ ব্রাহ্মণরা সমাজে প্রভুত্ব করার ধর্মীয় তত্ত্বাগত স্বীকৃতি পেয়েছিল নানাভাবে। স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণই হবে আর শূদ্রের সন্তান শূদ্রই জন্মাবে।

সমাজে দু'টি কারণে মানুষের প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছে প্রথমটি জন্মগত দ্বিতীয়টি বৃত্তি বা পেশাগত। আবার জন্ম উঁচু শ্রেণিতে কিন্তু অর্থনৈতিক ও সম্মানজনক স্থানে নেই এমন শ্রেণিটি দরিদ্র হলেও অন্ত্যজ নয়। অন্যদিকে পেশাগত ভাবে যাদের পেশা নিম্নস্তরের তারা অবশ্যই অন্ত্যজ শ্রেণির কিন্তু যাদের অর্থ আছে, অবলম্বন আছে কিন্তু নিচু জাতে জন্ম সে উচ্চশ্রেণিতে ওঠার জন্য সংগ্রাম করে চিরদিন। সামাজিক কাঠামোর অর্থনৈতিক স্বার্থবোধের ভিন্নতা থেকেই শ্রেণি-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। কার্ল মার্কস বলেছেন, এই পরিস্থিতি মূলত ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত। যে সকল ব্যক্তি এক একটি শ্রেণি গঠন করে, তারা সংশ্লিষ্ট সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় অভিন্ন অবস্থানের অধিকারী, এদের বৈশিষ্ট্য সম-স্বার্থসম্পন্ন এবং সর্বদা অপর শ্রেণি-স্বার্থের বিরোধী মানসিকতাসম্পন্ন।

মনসামঙ্গল কাব্যের সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে উচ্চ-নিম্ন বৈষম্যের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে অর্থনীতিই হচ্ছে সম্পর্কের সূত্র। দেখা যায় সমাজে এক প্রান্তে বিত্তের পাহাড়, অন্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রান্তে সহায়-সম্বলহীন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। নিয়তির এক অমোঘ বৈষম্যের শিকার হয়ে এক সারিতে যারা দাঁড়িয়েছে। অন্য শ্রেণিটি সকল শোষণ ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষের উপর।

চাঁদ সদাগরের মতো উচ্চশ্রেণির যখন 'রত্নপুরী বাসোহর' হীরা মানিক্য, 'মণি মাণিক্য' 'স্ফটিকের স্তম্ভ' 'মুকুতার ঝারা, 'সুবর্ণের খোল', 'নানা ধন' নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সমাজের মাথা হিসেবে তখন একটু সিঁদুরের অভাবে 'ইটের গুড়া' লাগিয়ে সিঁথি রাঙানো মানুষগুলো 'বার তালির কাপড় পড়ছে, 'ভাতের অভাবে' অনন্তকাল অন্ন-বস্ত্রের সংগ্রাম করছে। এরাই *মনসামঙ্গল* কাব্যের বৃহত্তর অন্ত্যজ শ্রেণি। মুক্তা, স্ফটিক, হীরা, স্বর্ণ ইত্যাদি এ শ্রেণির ছোঁয়ার বাইরে, তাই পিতলের অলঙ্কার, বেতের নির্মিত চুড়ি, তাদের পরম পাওয়া, বহু মূল্যবান।

চাঁদ সদাগরের নিজের জবানীতে সমাজের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ অঢেল সম্পত্তির কথা আমরা জেনেছি। চাঁদ পুত্র লখিন্দরের বিবাহে বিচিত্র সোনা-রূপা ঝলমল করার এক সচিত্র সংবাদ আমরা দেখেছি। যেখানে বরবেশে লখিন্দর সোনার খাটে বসে সোনার টোপর মাথায় দিয়েছে, বেহুলা বিয়েতে পেয়েছে ৮০ মন সোনা, চাঁদ সদাগরের দাঁতও ছিল সোনা দিয়ে বাঁধানো। স্বর্ণালঙ্কার প্রদর্শনীর এ মহা সমাবেশের বিপরীত দিকে যাদের অবস্থান তারা জীবনে স্বর্ণের রং কেমন হয় সে বিষয়েই ছিল অজ্ঞাত আর অলঙ্কার পাবে কোথায় ? শুধু তাই নয় শ্রেণিবিভক্ত সমাজের এই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলো নিদারুণ অর্থকষ্টে দিন কাটায়। কোনো প্রকার উপার্জন না হলে উপোসে মৃত্যুর দিন গুণতে হয়। ভিক্ষা দেয়া ও ভিক্ষা পাওয়াও যেন ভাগ্যের উপর নির্ভর ছিল।

সমাজজীবনে একদল অন্নহীন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের অস্তিত্ব ছিল। ভাগ্যের কারণেই হোক আর দুর্দশায় পড়েই হোক চাঁদ সদাগরকে নামতে হয়েছিল ভিক্ষাবৃত্তিতে এটি সামাজিক অস্তিত্বকে সমর্থন করে আমরা যাকে বলছি অর্থনৈতিক অন্ত্যজ শ্রেণি। এই শ্রেণিটির জাত আছে বংশ মর্যাদা আছে কিন্তু অর্থ-বিত্তের শ্রেণি নেই। চাঁদকে এই অর্থে প্রতীকী বলা যায়।

মনসামঙ্গলে অন্ত্যজ শ্রেণির শ্রেণিচেতনা সুস্পষ্ট কারণ অর্থই জগতের সকল কিছুর মানদণ্ড, এ চেতনা চাঁদ সদাগরের এবং তার পরিষদগণের মধ্যে সর্বত্র ক্রিয়াশীল তাহলে বিপরীত শ্রেণিটিও তার অবস্থানে ক্রিয়াশীল হবে না কেন ?

চাঁদ সদাগরের মুখে ধনসঞ্চয় ও ধনব্যবস্থার যে কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যুগে যুগে এই শ্রেণিটিই ধনবান হবে। লখিন্দরের পিতা চাঁদ সদাগর ও বেহুলার পিতা সায় সদাগর দু'জন দু'জনের সঙ্গে যে আত্মীয়তা করেছেন তাও সমতা বিচার করে কুল ও অর্থের মাপকাঠিতে উভয় উভয়ের শ্রেণি চরিত্রকে উদ্‌ঘাটিত করেছিল। বিত্ত আর প্রতিপত্তির দিক থেকে উভয়ই যোগ্য। এদের তুলনা এদেরকে দিয়েই করতে হবে অন্য কারো সাথে নয়। এ ধরনের তুল্য বাক্য থেকে মনে হয় এই শ্রেণিটির আত্মঅহমিকা ও দম্ভ ছিল সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষকে হেয় করার জন্য। উচ্চশ্রেণির মানুষের সমাজবদ্ধতা, একত্রীকরণ আরো বেশি চোখে পড়ে যখন লখিন্দরের বিবাহে আগমন ঘটে বণিক শ্রেণির একদল উচ্চবিত্তের। যারা এসেছিলেন তারা সবাই লক্ষপতি। এক্ষেত্রে বোঝা যায় অর্থই সমাজকে করে রেখেছিল শ্রেণিবিভক্ত। অর্থ, সম্পদের জন্যেই একদল উচ্চশ্রেণি আর একদল নিম্নশ্রেণির মর্যাদা পায় সমাজে। অর্থের কারণে যারা নিম্নকোটিতে অবস্থান করছে আমরা তাদের অর্থনৈতিক অন্ত্যজ বলছি।

মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর ছাড়া আরও একজন প্রবল প্রতাপশালী উচ্চকোটির সমাজপতির কথা বলা হয়েছে। তিনি মুসলমান সমাজের কাজী হাসান। তার দরবার বা বৈঠকখানার চিত্রেও দেখা যায় ,উচ্চের দরবারে নিম্ন করজোড়ে নিবেদন করছে :

Dhaka University Institutional Repository

রাখালে ছাড়ি মোল্লা পাইল অব্যাহতি।
কাজির নিকটে গেল অতি শীঘ্রগতি ॥
বসিয়াছে কাজি আপন কাচারিতে।
আপনার চাকর সব রহিছে জোড় হাতে ॥
সম্মুখে তামার বদনা হাতে ছড়িখান।
কাগজের বত্তাহাতে কিতাব কোরান ॥

(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১২৫)

উচ্চবিত্তের মানুষ তাদের মর্যাদা ও শ্রেণিচেতনা সম্বন্ধে এতটাই সচেতন ছিল যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে উচ্চকোটির সকলেই একজোট হয়েছে। দেখা যায় বিপরীত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও কাজী হাসান ছুটে গিয়েছেন চাঁদ সদাগরের পক্ষে সম্মিলিত লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে। কাজী হাসানের সঙ্গে যাদের লড়াই হয়েছে তারা অন্ত্যজ শ্রেণির, খেটে খাওয়া মানুষ, চাঁদ সদাগরের সঙ্গে নয়। অন্যদিকে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে যাদের লড়াই হয়েছে তারাও শ্রমজীবী, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ, মুসলমান সমাজপতি হাসান কাজী নয়। তাই দু'জন দু'জনের সমাজ রক্ষায় দৃঢ় পরিকর। চাঁদ সদাগরের রণযাত্রার আহ্বান :

সাজ সাজ করি শিঙ্গাতে দিল ফুক।
হাতে অস্ত্র করি আইল হাসন তুরুক ॥
সাজন জয়ে ঢোল বাজে ঘন ঘন।
হাতে পাঁজি পুথি করি সাজিল ব্রাহ্মণ ॥

(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৬৬-৬৭)

সুতরাং *মনসামঙ্গল* কাব্যের ঘটনা বিন্যাসে উঁচু-নীচু শ্রেণির জাতিগত বৈষম্যই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষমতাসীন শ্রেণিটি উচ্চবিত্ত ও আর্য আদর্শরূপী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। অপরদিকে ক্ষমতাহীন শ্রেণিটি বঞ্চিত, নিরাশ্রয়, সর্বহারা, অন্ত্যজ ও অবহেলিত এরা অনার্য এবং লোকায়ত আদর্শের লালনকারী। এই দুই শ্রেণির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটিতে চাঁদ সদাগর অন্যটিতে মনসা অবস্থান করছে। দেবী মনসা এখানে অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতীক।

মনসামঙ্গলের কাহিনিগত দিক এই যে, চাঁদ সদাগর স্বীকৃতি দিলেই মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচলিত হবে তবে একথা সত্য যে, চাঁদ সদাগরের বহু পূর্বেই মনসার পূজা চাঁদ সদাগরের রাজ্য ছেড়ে অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি চাঁদ সদাগরের পরিবারেও স্ত্রী সনকা মনসা পূজা করতেন। চাঁদ সদাগরের স্বীকৃতির অপেক্ষা সমাজের মানুষ করেছে এমন নয়, তবু চাঁদ সদাগরের কাছে পূজা কেন? এর উত্তরে বলা যায় দেবী যেমন সমাজের নিম্নশ্রেণির পূজা পেয়েছেন অপরদিকে চাঁদ সদাগর যিনি নিষিদ্ধ ও বেআইনী ঘোষণা করেছিলেন মনসাপূজা, উচ্চশ্রেণি কর্তৃক দেবত্ব অর্জনের জন্য দেবী তারই পূজা চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদ সদাগর মনসা পূজা নিষিদ্ধ করার কারণে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের পূজা দেওয়ার সাধ যে উবে গেছে এমন নয় তারা বীরদর্পে তাদের আদর্শকে মাথায় তুলে নিয়েছে, যুদ্ধ পর্যন্তও করেছে। তাই চাঁদ সদাগরকে শেষ পর্যন্ত অনার্য সংস্কৃতির প্রসারকে মেনে নিতে হয়েছিল। 'উচ্চকোটির মানুষের কাছে নিম্নকোটির মানুষের এবং তার সংস্কৃতির এ প্রথম বিজয়, বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এ ঘটনা তুলনারহিত মাত্র নয় ; একমাত্র ঘটনাও বটে।'[৯]

চাঁদ সদাগরের মনসাপূজা দেওয়ার মধ্যেই যে সামাজিকভাবে উচ্চশ্রেণির মানুষ মনসাভক্ত হল এমনটি ঘটেনি। তার প্রমাণ আজও বিদ্যমান কারণ সমাজে মনসাপূজা করে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ, উচ্চবিত্তরা নয়। এর পেছনে একটি কারণ ছিল সেটি হচ্ছে কাব্যের কোথাও আনুষ্ঠানিকভাবে দেবী মনসা চাঁদ সদাগরের কাছে স্বীকৃতি প্রার্থনা করেননি। আবার যখন ভেবেছেন চাঁদের কাছে পৌঁছাবেন তার পূর্ব মুহূর্তে চাঁদ সদাগর সেই সব মানুষদের উপর অত্যাচার শুরু করলেন যারা মনসাভক্ত, নিম্নশ্রেণির।

চাঁদের অত্যাচার ছিল ত্রাসের, ভীতি প্রদর্শনমূলক। এ থেকে বোঝা যায়, মঙ্গলকাব্যের শ্রেণিসমাজ ছিল আধিপত্যের আর আধিপত্য বিস্তার করত সমাজের উচ্চশ্রেণির শাসক, প্রতিনিধিরা। অপরদিকে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করত একটি শ্রেণি। এই শ্রেণিটি নিম্নবিত্তের, অন্ত্যজ, খেটে খাওয়া মানুষ যাদের প্রতিনিধি দেবী মনসা। দ্বন্দ্ব-বিরোধের ক্ষেত্রে

দু'টি শ্রেণিই স্বকীয়, স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। অর্থনৈতিক বিন্যাস, শ্রমনীতি ও শাসনব্যবস্থার বলি হয়ে, শিক্ষা সভ্যতার আলো না পাওয়া, কুসংস্কার-ধর্মান্ধতায় জর্জরিত, উদ্বাস্তু হয়ে ফিরে আসা ছিন্নমূল জনসমষ্টি মূলস্রোত থেকে ছিটকে পড়ে অচ্ছুত হিসেবে গণ্য হয়, অবস্থান নেয় সমাজের অন্তে। এরাই অন্ত্যজ সামাজিকভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন

'মানুষ নিয়তির অধীন'—এই বিশ্বাসের কারণে জাতিগত বৃত্তিকে ধর্মীয়বৃত্তি হিসেবে ধারণ করেছিল মধ্যযুগের অধিকাংশ মানুষ। সমাজের অন্তে যাদের বসবাস, উচ্চবর্ণের চোখে যারা অস্পৃশ্য, জাতিগতভাবে নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে অসচেতন, তারাই অন্ত্যজ। মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে ছিল ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত নানা স্তরের মানুষ, সবচেয়ে নিচে ছিল অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী।

পূর্ব-ভারতীয় মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'জাঙ্গুলী' নামের এক দেবীর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের মতে, জাঙ্গুলী দেবী অত্যন্ত প্রাচীনা; এমনকি 'ভগবান বুদ্ধ তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য আনন্দকে এই দেবী-পূজার গোপন মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া' তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত আছে।[১০] এ থেকে অনুমান করা যায় যে অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকেই পূর্ব-ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজে জাঙ্গুলীর পূজা প্রচলিত ছিল। জাঙ্গুলী দেবীর প্রভাব যে পূর্ব-ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সপ্তম শতাব্দীতে বানভট্ট কর্তৃক রচিত 'হর্ষচরিত' ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত একখানি সংস্কৃত নাটক হতে। 'সাপুড়ে' অর্থে বানভট্ট 'জাঙ্গুলিক' কথাটি ব্যবহার করেছেন।[১১] নাটকটির নাম 'কৌমুদী-মিত্রানন্দ'। এর রচয়িতার নাম রামচন্দ্র।[১২] উল্লিখিত জাঙ্গুলী দেবীই পূর্ব-ভারতীয় মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় কর্তৃক 'জাঙ্গুলী' নামে পূজিতা হতেন। পরবর্তীকালে এই দেবীই বাংলাদেশে মনসাদেবী নামে পরিচিতা হয়েছেন। জাঙ্গুলীতারার বৈশিষ্ট্য ও মনসাদেবীর বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে আশুতোষ ভট্টাচার্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জাঙ্গুলীতারাই ক্রমে বিষহরী বা মনসাতে পরিণত হয়েছেন।[১৩]

'জাঙ্গুলী' সম্পর্কে বলা যায় এই দেবী সম্ভবত প্রাচীন বাংলার অনার্য জনগোষ্ঠী-পূজিত কোন গ্রাম্যদেবী; যার সঙ্গে কল্পনা করে নেওয়া হত সাপের সংশ্রব। যখন বৌদ্ধরা 'যান' তন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মের প্রসারে নেমেছিল, তখনই আচারতন্ত্র সমেত গ্রহণ করেছিল অনেক লৌকিক দেবদেবীকেও। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ হলেও সংস্কৃতি সমন্বয়ের সময় অস্বীকার করতে পারেনি বৃহত্তর লোকায়ত ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণকে। তাই শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানা প্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী, শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম-কর্মে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।[১৪]

বাংলার লৌকিক দেব-দেবীর উদ্ভব ঘটেছে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে স্থানীয় লৌকিক বা আর্যেতর ধর্মসংস্কারের সংমিশ্রণে।[১৫] আবার মঙ্গলকাব্যের আধারে লৌকিক দেব-দেবী আশ্রিত সংস্কারগুলির সঙ্গে মিলন ঘটেছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের। প্রসঙ্গত সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের যে কীভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয়।'[১৬] বৌদ্ধ,আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির সার্বিক সংশ্লেষজনিত মিলন ঘটেছে মঙ্গলকাব্যে। এর মূল কারণ ঐতিহাসিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট। তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙলায় ভিন্ন প্রকৃতির ধর্মের ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। তুর্কী আগমনের ফলে একদিকে ম্রিয়মাণ হয়ে যায় বৌদ্ধধর্ম, অন্যদিকে নিজস্ব সংস্কৃতির ভাবধারা ও নিদর্শন হারাতে বসে হিন্দুধর্ম। নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদেই হিন্দুধর্মাবলম্বীরা গোঁড়ামি পরিত্যাগ করল। লৌকিক ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংমিশ্রণের ফলে 'মঙ্গল' দেব-দেবীর ব্যাপক বিকাশ ও বিস্তার। সমাজ-বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পাবার বাসনা এই দেব-দেবীদের কার্যধারায় আরোপিত হল। নিপীড়িত, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ এদের কল্পনা করল সর্বশক্তিমান রূপে।

Dhaka University Institutional Repository

শোষকের সঙ্গে মানবিক শক্তিতে পেরে না ওঠার তাগিদেই অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান দেবতার কল্পনা করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করল বাঙালি সমাজ।

মঙ্গলকাব্যগুলো স্বাভাবিকভাবেই ধর্মগত আবরণের আড়ালে সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে ধর্মই ছিল সমাজ ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান পরিচয়। এছাড়া শাসকশক্তির রোষানলের দাবদাহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যও এটা একটা কার্যকর পন্থা বলে বিবেচিত হয়। তাই ধর্মীয় কাহিনির আবরণে যেমন বৃহত্তর গণমানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, চাওয়া-না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাসমণ্ডিত কাহিনিটি এখানে ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি দেবী হিসেবে যাকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনিও কোনো স্বর্গলোকের অধিবাসিনী নন বরং বহু বঞ্চনা, বহু অত্যাচারের শিকার, শোষিত গণজীবনের প্রতীক। গোপাল হালদার মন্তব্য করেছেন, মঙ্গলকাব্য হচ্ছে 'শাসক ধর্ম ও শাসক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শাসিত ধর্মের ও শাসিত সংস্কৃতির প্রতিরোধের সাহিত্য।'[১৭]

মনসামঙ্গল কাব্যে অঙ্কিত দেব-দেবীর চরিত্র বাঙালি গৃহস্থ ও গৃহিণীর মতোই সংসার করে। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, বিধি-বিধান সবই মেনে চলে। শিব-পার্বতী, মনসা-নেতা, কার্তিক-গণেশ, নারদ, চাঁদ সদাগর– সনোকা, অনিরুদ্ধ-ঊষা এবং বেহুলা-লখিন্দরও এ ধরনের চরিত্র। লৌকিক কাহিনিভিত্তিক কাব্য বলেই সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের একান্ত কাছে এসেছেন এই কাব্যের কবিরা।

মধ্যযুগের সমাজে ধর্ম ও বর্ণ একই সূত্রে গ্রথিত ছিল। হিন্দু সমাজে বর্ণবাদের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। যেহেতু বর্ণবিন্যাস হচ্ছে ভারতীয় সমাজ কাঠামোর ভিত্তি, তাই প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের লেখকগণ বর্ণাশ্রম প্রথা ও অভ্যাসকে যুক্তিপদ্ধতিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চর্তুবর্ণের মধ্যে ভারতীয় সমাজকে বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন। এই চতুর্বর্ণের বাইরে সমাজে আরও অসংখ্য বর্ণ ও কোম বিদ্যমান ছিল।

প্রত্যেক বর্ণ ও কোমের ভেতরে আবার অসংখ্য স্তরবিভাজন ছিল। ধর্মসূত্র ও স্মৃতিকারেরা নানা অভিনব অবাস্তব উপায়ে এইসব বিচিত্র বর্ণ ও কোমের স্তর-উপস্তর ব্যাখ্যাও করতেন। এই ধারা মনু যাজ্ঞবল্ক্যের সময় থেকে শুরু করে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ঐতিহাসিকগণের ধারণা অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের দিকে ঋগ্বেদ রচিত হয়।[১৮] হিন্দু সমাজ বলতে যা বোঝায় তখনও পর্যন্ত তা গড়ে না উঠলেও এই গ্রন্থকেই হিন্দুদের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি শ্লোকে সর্বপ্রথম বর্ণবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়, এ সম্পর্কে পূর্বে বিশদ উল্লেখ করেছি, সেখানে উল্লেখ আছে যে – 'ব্রাহ্মণের জন্ম [পরম] পুরুষের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়ের জন্ম বাহু থেকে, বৈশ্যের জন্ম উরু থেকে এবং শূদ্রের জন্ম চরণ থেকে।'[১৯]

ঋগ্বেদে বর্ণের জন্মস্থানের এই যে অনুক্রম বর্ণনা করা হয়েছে তাতে উঁচু-নিচুর ধারণা ক্রমে কোনো বর্ণকে শ্রেষ্ঠ এবং কোনো বর্ণকে নিকৃষ্ট ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কালক্রমে চার বর্ণের নারী-পুরুষের পারস্পরিক মিলনে জন্ম নেয় অনেকগুলো বর্ণ।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুযায়ী হিন্দু সমাজের পঞ্চাশটি সম্প্রদায় বা 'জাত'-কে মোটামুটি পাঁচটি বৃহত্তর বিভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো হল, ব্রাহ্মণ, উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর, অধম সংকর ও ম্লেচ্ছ। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* শূদ্রকে বিভাজন করা হয়েছে দুইটি বর্ণে : সৎ শূদ্র ও অসৎ শূদ্র। এর ফলে মোট সাতচল্লিশটি জাতকে চারটি বৃহত্তর বিভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো হল : ব্রাহ্মণ, সৎ শূদ্র, অসৎ শূদ্র এবং অন্ত্যজ। কোন সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য জাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ভবদেব ভট্টের *প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ* গ্রন্থ থেকে তা জানা যায়। এই গ্রন্থে যে জাতগুলোর কথা বলা হয়েছে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

রান্না করা বা স্পর্শ করা অন্ন ব্রাহ্মণের ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ এবং এ জাতীয় অন্ন গ্রহণের জন্য উক্ত গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্তের বিধানের কথা বলা হয়েছে।[২০]

মধ্যযুগীয় সমাজে অর্থনৈতিকভাবে যারা ছিল দুর্বল,তারা অর্থনৈতিক অন্ত্যজ পর্যায়ের ; আর ধর্মীয় দিক থেকে যারা নিচু বর্ণের অধম সংকর, তারাই 'ধর্মীয় অন্ত্যজ' শ্রেণি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, সমাজে যশ-মান-প্রতিপত্তির একমাত্র অধিকারী ছিল পুরুষ। এ কারণেই সমাজ অগ্রসর হতো পুরষের মত ও আদর্শের পথ ধরেই। ধর্মবিধি ও সম্পদ-নিয়ন্ত্রিত সেই কাল-পরিবেশে সৃষ্ট সাহিত্যের সামাজিকতাও ধর্ম ও ক্ষমতাশাসিত রীতি-পদ্ধতিকে অস্বীকার করতে পারেনি। তখন সমাজ নিয়ন্ত্রণের প্রধান শক্তি পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা ও খাম-খেয়ালীপূর্ণ ঔদাসীন্যে নারীরা ছিল মূলত অধিকারচ্যুত ও ভোগের সামগ্রী মাত্র। 'অন্ত্যজ অস্পৃশ্য' রমণীদের ভোগ করা উচ্চবর্ণের পুরুষদের কাছে স্বাভাবিক বিষয় ছিল :

> ...ব্রাহ্মণ শূদ্র নারীকে বিবাহ করিতে পারিত না ; কিন্তু শূদ্র-নারীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোন বাধা ছিল না ; নামমাত্র শাস্তিতেই সে অপরাধ কাটিয়া যাইত ইহাই সমসাময়িক স্মৃতি শাস্ত্রের বিধান।[২১]

এক্ষেত্রে বলা সহজ যে ,সমাজে এ ধরনের আনুকূল্যই নিন্দনীয় ও অসামাজিক কাজের ব্যাপারে পুরুষকে অনেকটা উৎসাহী করে তুলেছিল, অধিকারহীনা নারীকে এখানে অন্ত্যজ বলাই শ্রেয়। বঙ্গদেশে বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয় আর্যদের আগমন ও বসতি স্থাপনের পর থেকে। আর্যদের সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত হয়ে যে সব অনার্য আর্যদের দাসত্ব বরণ করে নেয় তারা আখ্যায়িত হয় শূদ্র রূপে। 'শূদ্রগণ ছিলেন ক্ষুদ্র একটি সেবক শ্রেণি, রাজা যাদের ইচ্ছে মতন নিষ্পেষণ ও প্রহার করতে পারতেন'।[২২]

অনার্য সমাজে আর্যরা পরিচিত হয় দ্বিজরূপে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ ছিল দ্বিজবর্ণের অন্তর্ভুক্ত। আর্যদের এই তিন বর্ণের মধ্যে সামাজিক আচার-আচরণে কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রভেদ ছিল না, প্রভেদ ছিল দ্বিজর সঙ্গে শূদ্র বর্ণের। আর্যরা শূদ্রদের সঙ্গে মেলামেশা অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক করতেন না। এর ফলে সমাজে জন্ম নেয় 'অস্পৃশ্যতা' ও 'অনাচরণীয়তা'। এই শূদ্রদের মধ্যে আবার যারা অত্যন্ত হীন, অধম ও বর্বর তারাও অন্ত্যজ নামে পরিচিত হয়। আর্য অধ্যুষিত গ্রামে ও নগরে অন্ত্যজ'দের প্রবেশাধিকার ছিল না। শাস্ত্রে উল্লেখ না থাকলেও এরাই লোকাচার ও দেশাচার অনুসারে পরিচিত হয় 'পঞ্চম বর্ণরূপে'। এইভাবে দ্বিজ, শূদ্র এবং অন্ত্যজ নিয়ে হিন্দু সমাজে প্রথম জাতিভেদের সৃষ্টি হয়।[২৩]

সমাজ পরিবর্তনের পথে তিন শ্রেণি ভেঙে আরো নানা শ্রেণি-উপশ্রেণির উদ্ভব হয়। আর্য সমাজের প্রথম দিকে দ্বিজর অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না ; তবে নানা কারণে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তারা সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করে। অতঃপর ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা ব্রাহ্মণের পরে এবং বৈশ্যের মর্যাদা ক্ষত্রিয়ের পরে নির্দিষ্ট হয়। এর ফলে এই তিন বর্ণের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বন্ধ হয়ে যায়। বাস্তবতার দিক থেকে তা ছিল সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার—যেহেতু যথেষ্ট বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বৈবাহিক মিলন কেউ দমাতে পারেনি। এই নিয়ম থেকে অনার্য শূদ্ররাও বাদ যায়নি। তাদের সঙ্গেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৈবাহিক সম্পর্ক হয়। এর ফলে চার বর্ণ বা জাতি ভেঙে সৃষ্টি হয় বহুবর্ণ বা বহুজাতিক হিন্দু সমাজের।[২৪]

মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে এবং আধুনিক যুগের শুরুতে বাঙালি হিন্দু সমাজে স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। তখন বৈদ্য ও কায়স্থদের পরেই 'নবশাখ' সম্প্রদায়কে গণ্য করা হত। মালী, তেলী, তাম্বুলী, বারুজীবী, গোপ, নাপিত, কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় ও মোদক এই ক'টি ছিল নবশাখের অন্তর্ভুক্ত। উচ্চবর্ণের কাছে খুব একটা হেয় প্রতিপন্ন হত না তারা। মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে জন্মগত

Dhaka University Institutional Repository

আভিজাত্য ব্যতীত অর্থের বা ক্ষমতার আভিজাত্যও যথেষ্ট ছিল। সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি ব্যবসায়ী অর্থের জোরে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ভোগ করতো।[২৫]

মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগর মূলত ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রতিনিধি। ব্রাহ্মণ্য শক্তির অস্তিত্বের প্রশ্নেই চাঁদ সদাগর নিম্নবর্গের প্রতিনিধি লোকায়ত দেবী মনসার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ভারতের ইতিহাসে সমাজ নিয়ন্ত্রণে বণিকদেরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শ প্রচলন করা এবং সমাজে তা ছড়িয়ে দেওয়া, সর্বোপরি টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বণিক শ্রেণি বরাবরই অবদান রেখেছে। এ সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেন :

> সর্বাগ্রে বণিক, বণিকের সঙ্গে বণিকের প্রয়োজনই ধর্ম ও পুরোহিত, তারপরেই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আসিয়া পড়ে সামাজিক এবং সংস্কৃতির প্রভাব।[২৬]

মনসামঙ্গল কাব্যে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের পক্ষে চাঁদ সদাগর লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেছেন এটি সমাজে ব্রাহ্মণ-আধিপত্য ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণির স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে চাঁদ সদাগর ছিল আপসহীন, কোন অনুরোধ-উপরোধ তাকে টলাতে পারেনি।

মনসামঙ্গল কাব্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ চাঁদ সদাগরের ঘনিষ্ঠজন, পরামর্শদাতা। তার পক্ষে ছিল সোমাই পণ্ডিত, রোঙ্গাই পণ্ডিতদের মত ব্রাহ্মণ। এই কাব্যে উচ্চশ্রেণিটি মূলত ব্রাহ্মণ এবং তার পাশাপাশি যে পেশার মানুষ উচ্চশ্রেণিতে অবস্থান করতো তারা হল বিত্তবান সামন্ত, রাজার উপদেষ্টা, কুল-পুরোহিত ধর্মীয় আচার্য, অধ্যাপক, জ্যোতিষী, কুল-পণ্ডিত প্রমুখ।

মনসামঙ্গলে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বের চরম প্রকাশ দেখা যায় যখন চাঁদ সদাগর সোমাই ব্রাহ্মণকে চম্পক নগরের ভার অর্পণ করেন। ব্যাপদেশে থাকাকালে সোমাই পণ্ডিত নগরের ভালমন্দ দেখাশোনা করে। এ থেকে বোঝা যায় যে চাঁদ সদাগর অস্থায়ী শাসনকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন সোমাই ব্রাহ্মণকে। চাঁদের কাছে অন্য কেউ-ই এ স্থান পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের পক্ষে অসম্ভব পরাশক্তি হিসেবে দেখা যায় ধনন্তরী ওঝাকে। দেবী মনসা এই ওঝাকেই বিরাট বাধা মনে করেছেন। অন্যদিকে চাঁদ সদাগরও বিপদে-আপদে এই শক্তির সাহায্য চেয়েছেন। এবার প্রশ্ন হতে পারে কে এই পরাশক্তি, যার বিপুল ক্ষমতার কাছে লৌকিক দেবী মনসা ভীতা-সন্ত্রস্তা। ধনন্তরী ওঝা মূলত একজন শক্তিধর ব্রাহ্মণ, তার কার্যকলাপ দেখে মনে হয় সমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেণিটি ছিল সকল নিয়ামক ও শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। লৌকিক দেবী মনসা তাই এই শ্রেণির পূজা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

মনসামঙ্গলে বিভিন্ন জায়গায় আমরা কৃষক এবং কৃষিজীবী সামন্ত-মালিক ব্রাহ্মণদেরও সাক্ষাৎ পাই। এ সময় ব্রাহ্মণরা জমি-জমার মালিক ছিল এবং প্রত্যক্ষভাবে জমিচাষের সঙ্গে জড়িত ছিল। এই ব্রাহ্মণদের আচরণ ছিল সামন্ত-প্রভুদের মত। ব্রাহ্মণদের জমিচাষী-কৃষিজীবী হওয়ার প্রমাণ ইতিহাসে জানা যায়। ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ করে বাংলাদেশ ও পূর্ববঙ্গে তাদের কৃষিকাজের প্রচলন ছিল। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হত ; এছাড়া ব্রাহ্মণরাও সরাসরি ভূমি অনুদান হিসেবে গ্রহণ করতেন। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী রামশরণ শর্মার মতে :

> বাংলাদেশের সেন শাসকগণও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনুদানরূপে গ্রামদান করতেন। ...একটি অনুদানপত্রে লক্ষ্মণ সেন উত্তরবঙ্গে একটি গ্রামদান করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে চারটি বিভিন্ন গ্রামে ভূমিখণ্ডও দান করেছিলেন। বিশ্বরূপ সেনের শাসনকালে ৬টি গ্রামে বিক্ষিপ্ত ১১টি ভূখণ্ড যার মোট ক্ষেত্রফল ছিল ৩৩৬১ উন্মান এবং বার্ষিক আয় ছিল ৫০০ পুরাণ, ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন। একাদশ ও দ্বাদশ

Dhaka University Institutional Repository

> শতাব্দীর ভূমি অনুদানগুলি লক্ষ করলে মনে হয় যে বাংলাদেশে ভূমি অনুদান সেই সকল অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যাকে অধুনা পূর্ববঙ্গ বলা হয়।[২৭]

কৃষকগণ সম্পূর্ণভাবে দানগ্রহীতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করত। দানগ্রহীতা ধর্মনিরপেক্ষ অথবা ধর্মীয় যে অনুদানই গ্রহণ করুক না কেন, তাদের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানভোগীর অধীনে কৃষকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় ছিল, কারণ এইরূপ অনুদানভোগীদের রাজ্যকেও কিছু কর দিতে হত। কিন্তু সব মিলিয়ে কৃষকদের অবস্থা স্বাধীন, শক্তিমান, চাষী ভূ-স্বামীর মত ছিল না, বরং তারা দানগ্রহীতার অধীনস্থ কৃষিদাসে পরিণত হয়েছিল। চাষী সম্প্রদায়ের ওপর এসব ভূমি অনুদান ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। সমাজের সাধারণ গৃহস্থরাও নতুন নতুন ব্রাহ্মণ বসতি করবার জন্য ভূমি ক্রয় করেছেন এবং তা ব্রাহ্মণদের দান করেছেন। এভাবেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ চূড়া থেকে শুরু করে সমাজের সাধারণ স্তর পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পোষকতার ফলে সমাজে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ামক শক্তি হয়ে ওঠে। *মনসামঙ্গল* কাব্যে এই শক্তির প্রতাপ সুস্পষ্ট।

মুসলিম সমাজের কৌলিন্য চেতনা প্রকৃতপক্ষে দেশজ প্রভাবেরই ফল, যেহেতু অভিজাত মুসলিম সমাজে সকলেই যেমন বহিরাগত নয় সেহেতু সকলই মুঘল-পাঠানের বংশধর কিংবা আরবের সৈয়দদের অধস্তন পুরুষও নয়। বৈবাহিক সূত্রে এবং ধর্মান্তরের মাধ্যমে এদের অনেকেই দেশীয় হিন্দুর বংশধর কিংবা মাতৃসূত্রে বাঙালি হিন্দুর রক্তে পরিপুষ্ট। 'সৈয়দ' মুসলিম সমাজে কুল শ্রেষ্ঠ। তাঁরা হযরত আলীর পুত্র হাসান-হুসেনের অধস্তন বংশধর বলে স্বীকৃত। তবে বাঙলার সকল সৈয়দই হযরত আলী (রা:)-র বংশধর এ কথা আদৌ সত্য নয়। কথিত আছে যে, সম্রাট আকবর এদেশের ধর্মান্তরিত কিছু ব্রাহ্মণকে সৈয়দ বলে পরিচয় দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।[২৮] 'আরব দেশের ধনিক ও বণিক শ্রেণিই শেখ নামে পরিচিত।'[২৯] অনেকের ধারণা এদেশের নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত মুসলমানেরাই শেখ উপাধি ব্যবহার করতেন।[৩০] তবে বহিরাগত সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠান এবং ধর্মপ্রচারক অভিজাত মুসলমানদের অনেকেই যে জ্ঞান-গরিমায়, শৌর্য-বীর্যে দেশজ মুসলমান অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার প্রমাণ মঙ্গলকাব্যগুলো।

এই অভিজাত মুসলমানদের অনেকেই রাজকর্ম ব্যতীত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেও জীবিকা নির্বাহ করতেন।[৩১] এরা ছিলেন ধর্মপ্রাণ, জীবন গেলেও ধর্ম ছাড়তেন না। যেহেতু মূর্তিপূজা ইসলাম ধর্মবিরোধী এবং এদেশীয় হিন্দুরা মূর্তিপূজক সেহেতু বহিরাগত ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা ছিলেন হিন্দু-বিদ্বেষপরায়ণ। এইসব ধর্ম-কর্মনিষ্ঠ বহিরাগত অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে কিছু ছিল ধর্ম ব্যবসায়ী যারা যজন-যাজনকারী ব্রাহ্মণদের মতোই ছিল লোভী, পরনির্ভরশীল ভিক্ষাজীবী।[৩২] দেশীয় মুসলমানেরা ধর্মান্তরিত হলেও পেশান্তরিত হতে পারেননি অনেকেই। যে কারণে তারা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সমাজে তাদের পরিচয় ছিল বৃত্তিজীবী হিসেবে। মধ্যযুগের সকল শ্রেণির বৃত্তিজীবীসমাজ সম্পর্কে সামলোচকের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় :

> পুরাকালে বাংলাদেশের মানুষ কোন ধর্ম পালন করতো তা আমাদের জানা নেই। আদিতে এখানে সামাজিক সংগঠন ও তার বিন্যাস ছিল কৌমভিত্তিক। কাজেই সকল মানুষ একটি মাত্র বিশেষ ধর্ম সংস্কারের অনুসারী ছিলো– তা বলা যায় না। সে সময়ের মানুষের ধর্মীয় চেতনার উৎস ছিলো জীবনের সপক্ষে প্রকৃতিকে বশে আনা। আর সে কারণেই ধর্মীয় সকল যাগযজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠান ছিলো জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

মনসামঙ্গল কাব্যের সমাজের মানুষ দুই প্রকার ধর্ম পালন করত। প্রথমটির নাম শৈবধর্ম, দ্বিতীয়টির নাম শাক্তধর্ম। সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল শৈব ধর্মাবলম্বী। চাঁদ সদাগর তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ, সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ, অন্ত্যজ শ্রেণির যারা, তাদের একমাত্র উপাস্য ছিল শক্তির সাধনা। দেবতা হিসেবে তাদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিলেন দেবী মনসা। বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা মনসার কৃপা চেয়েছে। ভারতবর্ষব্যাপী অন্ত্যজ শ্রেণির দেবতা হয়ে উঠেছেন দেবী মনসা। ভারতবর্ষে সর্পপূজার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন :

> সভ্যতার উন্মেষের বহু পূর্বেই মানব-হৃদয়ের ভয় ও বিস্ময় আদি জন্মলব্ধ প্রবৃত্তিগুলি হইতে সমাজের প্রাচীনতম দেবতাদিগের কল্পনা করা হইয়াছিল। সেইজন্য প্রত্যেক সমাজের প্রাচীনতম দেবতা প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভয় বা বিস্ময়ের বস্তু। প্রাচীন মানবজাতি সাধারণত অরণ্যে বা পর্বতগুহায় বাস করিত, সেইজন্য অরণ্যাচারী জীবজন্তুর সঙ্গে তাহাদিগকে সর্বদা সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইত। অরণ্যাচারী জীবজন্তুর মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা ভীষণ, ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহারা সংখ্যায়ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক। সম্মুখযুদ্ধে ইহাদিগকে পরাজিত করিবার উপায় নাই, ইহাদের সন্ধান অলক্ষ্যগোচর ; বিশেষত ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অন্যান্য জীবজন্তু হইতে স্বতন্ত্র– ইহারা পাদহীন অথচ দ্রুতগতি, জীর্ণ খোলস ত্যাগ করিয়া ইহারা বারবার নব জীবন লাভ করে; সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, ইহারা অমর– দীর্ঘকাল নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নিরাহারে কালযাপন করিতে পারে– এই সমস্ত কারণে এই বিশেষ জীবটি সম্বন্ধে প্রাক্-সভ্যতাযুগের সমাজভুক্ত মানব মাত্রেরই হৃদয়ে একটি কৌতূহল মিশ্রিত ভয়ের অস্তিত্ব ছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ভয়ই তথাকথিত ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।[৩৪]

যে-সময়ে *মনসামঙ্গল* কাব্য রচিত হয় সে-সময়ের মানুষের মধ্যে আদর্শবাদ, মতবাদ এমনকি রাজনীতিও নির্ভর করত ধর্মীয় আদর্শের উপর। সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> প্রাচীন ও মধ্যযুগের যে কোন সামাজিক দ্বন্দ্বই যে ধর্মের দ্বন্দ্ব বা দেবতার দ্বন্দ্বরূপে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয় তাহা তো জানা কথা।[৩৫]

সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় ধর্মীয় অনুশাসনের নামে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত আর এর মূলে ছিল মানুষের স্বভাবজাত শ্রেণিচেতনা। এ কারণেই *মনসামঙ্গল* কাব্যের সমাজে রাজা, সামন্ত, মন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, সৈন্য-সেনাপতি, রাজকর্মচারী, কৃষিজীবী ইত্যাদি বৃত্তি অবলম্বনকারী মানুষ দেখা যায়। স্মৃতিগ্রন্থসমূহে যে নির্দেশই থাকুক না কেন বাস্তবজীবনে দৃঢ়বদ্ধ নিয়মনীতি উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা মানতেন না। বরং তারা নিজেদের সুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে নানা নিয়মনীতি তৈরি করে নিয়েছিলেন এবং সেই সাথে সৃষ্টি করেছিলেন নানা বর্ণ ও শ্রেণির। বলা বাহুল্য যে, এইসব স্মৃতিশাস্ত্রের রচয়িতারা ছিলেন ব্রাহ্মণ । কাজেই এখানে তাদের নিজ শ্রেণিস্বার্থ ও সুবিধা যে সর্বাগ্রে গৃহীত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। উচ্চশ্রেণির সংস্পর্শে থেকে সাধারণ মানুষও বর্ণ-নির্ভর হয়ে পড়েছিল ; এই বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে জড়িত ছিল বৃত্তি অর্থাৎ বৃত্তি বা জীবিকা ছিল বর্ণ-নির্ভর আর বর্ণ ছিল জন্ম-নির্ভর। *মনসামঙ্গল* কাব্যে চাঁদ সদাগর-মনসার সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগের সামাজিক স্তরবিন্যাসের নানামাত্রিক ছবিই আমরা প্রত্যক্ষ করি।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনসামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ চারশত বছর ধরে সকল মঙ্গলকাব্যে যেসব দেব-দেবীর চরিত্র বর্ণিত হয়েছে তার সঙ্গে ধর্মীয় দার্শনিকতা কিংবা আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক যৎসামান্য। এরা অনার্যকুলজাত মনুষ্যলক্ষণে অঙ্কিত। এদের হিংসা, দ্বেষ, লোভ-লালসা, দুঃখ-দারিদ্র্যে দেবত্বের কোনো ছাপ নেই ; পূর্ণভাবে মানবজীবন রসে পুষ্ট। *মনসামঙ্গলের* কবি বিজয় গুপ্তের কাব্যে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে বর্ণিত হয়েছে বরিশাল অঞ্চলের লোকজ জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্র। যে শ্রেণির চারিত্র্যিক সমাবেশ ঘটানো হয়েছে সে শ্রেণিটি সমাজের উচ্চশ্রেণি দ্বারা শোষিত, বঞ্চিত, অধিকারের প্রশ্নে সে অধিকারহীন। ধর্ম ও সমাজ তাকে নিম্নশ্রেণির মর্যাদা দিয়েছে। অর্থনীতির কঠিন, বলিষ্ঠ হাত তার অভাবের দরজায় তালা যেমন দিতে পারেনি তেমনি শ্রেণি-বৈষম্যের শিকার হয়ে এই শ্রেণিটি নিম্নবর্ণ, অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্যের খাতায় নাম লিখেছে। *মনসামঙ্গল* কাব্যে অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন রূপায়ণে *মনসামঙ্গল* কাব্যের সমাজ তথা সামাজিক বাস্তবতা বিশ্লেষণযোগ্য কেননা, 'বিজয় গুপ্তের দৃষ্টি ব্যষ্টি-চরিত্রের অন্তস্থল অপেক্ষা সমষ্টি-চরিত্রের বর্হিভাগের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট ছিল।[৩৬] ভাব-প্রবণতা অপেক্ষা তার মধ্যে বস্তু বিশ্লেষণ প্রবণতা অধিক ছিল। এটা সহজেই অনুমেয়। শুধু তাই নয় *মনসামঙ্গল* কাব্যে যে সকল সামাজিক উপাদান বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে সামাজিক ইতিহাসের সূত্র পাওয়া যায় বলে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রবাহই আজ ইতিহাসের উপাদান ও উপকরণ।[৩৭] আর ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যও যেহেতু প্রবর্ধমান পরিধির মধ্যে বিচরণশীল, তাই জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত সব ভাব-চিন্তাকর্ম ও বস্তুই আজ সাহিত্যের বিষয়বস্তু।[৩৮] মঙ্গলকাব্যগুলো শক্ত মতের পৃষ্ঠপোষক। এসব কাব্যে অসহায় এবং দুর্বল সমাজ নিজের পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য অদৃশ্য দেবতার কল্পিত শক্তির আবাহন করে জীবনে সান্ত্বনা সন্ধান প্রত্যাশী। এজন্য মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় স্বর্গীয় দেবতাগণ মর্ত্যবাসীর পর্ণকুটীরে জন্ম নিয়ে ছলে বলে নিজের শক্তি ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করে আবার স্বর্গেই ফিরে যাচ্ছেন। *মনসামঙ্গল* কাব্যে দৈব-মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে বটে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবিক সত্তা। বিজয় গুপ্ত কর্তৃক মনসার অপমানকে সব সময়ে তিনি এত বড় করে দেখেছেন যে, তার ফলে তাঁর কাব্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। মানুষের বিজয় ঘোষিত হয়েছে।[৩৯] কবির সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই শ্রেণিভেদে তাদের অবস্থানে সক্রিয়, সজীব নর-নারী। স্বর্গের দেব চরিত্রেও তিনি মানবিক মহিমা আরোপ করেন। স্বর্গভ্রষ্ট দেবদেবী মর্ত্যের শিশু হয়ে ধরার ধুলায় খেলা সাঙ্গ করে আবার তাদের পূর্বস্থানে ফিরে যায়। যতদিন তারা মর্ত্যে কাল অতিবাহিত করেন, ততদিন তারা মর্ত্যেরই জীবন্ত মানব-মানবী। এ কারণে এ কাব্যের শিব, পার্বতী, মনসা, অনিরুদ্ধ, ঊষা বাঙালির ঘরে সাধারণ নর-নারী রূপে প্রতিভাত হন। প্রকৃতপক্ষে কবি বিজয় গুপ্ত মধ্যযুগে আবির্ভূত হয়ে মানুষের জয়গান করতে চেয়েছেন, উঁচু-নিচু শ্রেণির মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন সেতুবন্ধ কিন্তু 'কবি দেবদেবীর সর্বাত্মক প্রভাব-প্রতিপত্তির কবল থেকে বেরিয়ে মধ্যযুগকে ছেড়ে আসতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি মধ্যযুগকে ছাড়তে চাইলেও মধ্যযুগ তাঁকে ছাড়েনি।[৪০] সে কারণেই মানবাত্মার প্রতীক, দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শক্তি চাঁদ সদাগর অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'বাম হস্তে' দেবীকে পূজা দিতে বাধ্য হন। বিজয় গুপ্তের প্রক্ষিপ্ত রচনা বলে ধরে নেওয়া 'মানবাত্মার পরাজয়' অংশটুকু বাদ দিলে এ কাব্যে মানুষের জয়গান সর্বত্র। কবির সৃষ্ট 'অন্ত্যজ বলে এই কাব্যে যাদের জীবনের চালচিত্র ব্যাখ্যা প্রয়োজন তারা সামাজিকভাবে যেমন নিম্নশ্রেণির, অর্থনৈতিকভাবে তারা নিম্ন আয়ের। এই তথ্যটুকু সামনে রেখে আলোচনার পরিধি নির্মাণ করেছি। *মনসামঙ্গল* কাব্যে

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চশ্রেণির মানুষের পাশাপাশি সহাবস্থান করছে নিম্নশ্রেণির এবং পেশাজীবী শ্রেণির মানুষ। লখিন্দরের বিবাহযাত্রায় দেখা যায় উচ্চ-নীচ শ্রেণির মিলন মেলা।

দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

তিনশত গর্দভ চলে লেজের আগে থোপ।
ধানকিয়া পাইক চলে বড় বড় গোপ ॥
সফরিয়া বলদ চলে বড় বড় পেট।
সাত হাজার কৃষ্ণসার নয় হাজার উট ॥
নও শত উট চলে গোটা কত বিক।
তিন হাজার চলিয়াছে গন্ধবণিক।
গন্ধবণিক সব রাজভোগে ভোলা।
কেহ হস্তীর পৃষ্ঠে চড়ে কেহ চড়ে দোলা ॥
চৌদ্দশত চলিয়াছে কুলীন সজ্জন।
তিনশত ভাট চলে নয় শত ব্রাহ্মণ ॥
সুন্দর পরিধান মাথে পুষ্পের ডালি।
একে চাপে চলিয়াছে নও শত মালি।
তের শত ময়ূর চলে মাথে তার বোঝা।
দুই শত চলিয়াছে গারড়িয়া ওঝা ॥
উচ্চস্বরে কাগজ পড়ে সভার মাঝার।
সেনিয়া চারি চলিয়াছে সাতাইশ হাজার ॥
চৌদ্দশত কামার চলে তের হাজার কুরি।
দুইশত কটড়া চলে নয় শত তেলি ॥
খণ্ড বসু পরিধান মাথায়ে তাহার শোভা।
একে চাপে চলিয়াছে দুই শত ধোপা ॥
এগার শত গোয়াল চলে তের শত হালই।
নয় শত সুবর্ণবণিক তের শত বারই ॥
কালা কালা শরীর সব নাকের আগে রোম
চারিশত জালুয়া চলে তের শত ডোম ॥
চারিশত কুমার চলে হইয়া হরষিত।
সাধু সঙ্গে চলিয়াছে শতেক নাপিত ॥
সাত হাজার নটী চলে করিয়া নানা বেশ।
এগার হাজার যোগীচলে কহিতে বিশেষ ॥
সন্ন্যাসী বৈষ্ণব চলে নর্ত্তকী সূচক।
কান্ধে ঝুলি চলিয়াছে রাজার গণক ॥

Dhaka University Institutional Repository

দুইশত ছুতার চলে তিন শত করাতি।
তিনশত কারিকর চলে এগার শত তাঁতি ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৬৮-৬৯)

মনসামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনের সঙ্গে যে সকল বিষয়-উপকরণ এই আলোচ্য বিষয়কে গতিদান করেছে সেগুলো হল :

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র দিকের মধ্যে একটি বিশেষ দিক হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস। ভাত, মাছ, দুধ, ফলমূল এবং বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন ছিল সাধারণ বাঙালির দৈনন্দিন খাবার। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের কবি ঘি-এর যত্রতত্র ব্যবহার করেছেন এমন কথাও শোনা যায়। নদ-নদী, খাল-বিল-হাওড়ের দেশ বাংলাদেশ। 'মাছে ভাতে বাঙালি' এটি যেন অমর বাণী। বাংলার অসংখ্য মাছের ভেতর রুই, কই, কাতল, চিতল, মাগুর, ইলিশ, শোল, বোয়াল, রিঠা, পুটি, পাবদা, পোনা, ইচা, ভেকুট, ফলই, মায়া, সোনাখড়কী, আড়ি, বাচা, চেলা, কালবসু, বাঁশপাতা, টেঙরা, ভেদা, কুড়িশা, খলিশা, খড়স্বলা প্রভৃতি ছিল বাঙালির নিত্যদিনের প্রিয় খাবার মাছ। এই সমস্ত মাছ বিভিন্ন প্রকার তরকারীযোগে কীভাবে উত্তম ব্যঞ্জনে পরিণত হত সেরূপ একটি রান্নার নাতিদীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায় *মনসামঙ্গলে*। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কবিরা দেব-মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্যেও মানুষের মর্মকথাকে উপেক্ষা করতে পারেনিন। ফুল্লশ্রী গ্রামের কবি বিজয় গুপ্তের বর্ণনায় যে রন্ধন সামগ্রীর উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে দেবী মনসার কোন সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক রয়েছে বাঙালি জীবনের। বিশেষত ভোজনবিলাসী বরিশালবাসীর শাক-সবজি নিরামিষ থেকে বিভিন্ন মাছ-মাংস, পোলাও-পিঠা কোনো কিছুর অভাব ঘটেনি কবির আয়োজনে–বিচিত্র তার মসলা, বৈচিত্র্যময় তার রন্ধন-প্রণালী। এতে কেবল সোনকার সাধ ভক্ষণ হয়নি। উচ্চশ্রেণি থেকে নিম্নশ্রেণি পর্যন্ত সকল স্তরের মানুষের খাদ্য তালিকায় এসব খাদ্য বিদ্যমান ছিল। অর্থের অভাবে কেউ খেতে পারত কেউ পারত না। শুধু যে উঁচু ঘরের খাদ্য তালিকা দিয়েছেন কবি বিজয় গুপ্ত এমন নয়, মনসার কোপানলে দুর্দশাগ্রস্থ চাঁদ সদাগর কেবল প্রাণে বেঁচে 'উপুড় হইয়া চান্দো খালের পানি খায়', সে নিদারুণ দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে। কুমার বৌয়ের কাছে চার পোনে কাঠ বিক্রি করে ক্ষুধার্ত বণিক স্বপ্ন দেখে :

এক পোন দিয়া আমি ক্রিয়া শুদ্ধি করিমু।
এক পোন দিয়া আম চিড়া কেলা খামু ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৯২)

মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায় অন্ত্যজ শ্রেণির সন্তান শিক্ষা অর্জন করছে। উচ্চবিত্তের সন্তানদের সঙ্গে ভিক্ষাজীবী দরিদ্র ঘরের সন্তানও যে একই পাঠশালায় বিদ্যাভাস করত তার চিত্র দেখে সকলকেই অবাক হতে হয়। সোমাই পণ্ডিতের পাঠশালায় এমন একটি চিত্র পাওয়া যায়। দরিদ্র পরিবারে পান্তাভাত খাওয়ার অভ্যাস ছিল নিত্য দিনের। বাঙালি সমাজের নিত্য ঘটে যাওয়া ঘটনা একান্তভাবে ফুটে উঠেছে এই কাব্যে। সোনাকার ছয় পুত্রের মৃত্যু হয়েছে তার জন্য কে দায়ী ? বেহুলা শাশুড়ীকে তাই প্রশ্ন করে, 'তোমার ছয় পুত্র মৈল সেও কি আমার দোষ।' শাশুড়ী কর্তৃক পুত্রবধূকে অকারণে উঠতে-বসতে দায়ী করে খোটা দেওয়া বাঙালি সমাজ-জীবনের চিরন্তন ঘটনা। পণ প্রথা, দাস প্রথার মতো সতীদাহ প্রথাও *মনসামঙ্গল* কাব্যের উপকরণ হয়েছে। দেবতা মর্ত্যে নেমে মানুষের তৈরি কর্ম-সম্পাদন করছে। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

শিব সঙ্গে যাও মাতা না কর অন্যথা।
তবে বশ হইয়া চলিল জগতের মাতা ॥

Dhaka University Institutional Repository

শিব সঙ্গে শ্মশানে শুইয়া ভগবতী।
তাহা দেখি আনন্দিত দেবী পদ্মাবতী ॥
অগ্নি হাতে লইয়া পদ্মা আসিলা কৌতুকে।
শিবের মুখ এড়িয়া অগ্নি দিল দুর্গার মুখে ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১০৯)

মনসামঙ্গল কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক চিহ্নিত একটি পালা আছে। পালাটির নাম 'কাজির সহিত যুদ্ধ'। এ পালায় হিন্দুর উপর মুসলমান কাজির দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারের বর্ণনা আছে। তাছাড়াও হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের চিত্রও আছে। এটি তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী ঘটনা। বিজয় গুপ্তের *মনসামঙ্গলে* এবং মৃগবতীর শ্লোকে (দ্বিতীয় সংস্করণ : পৃ. ৩৯৬) যে হোসেন শাহের উল্লেখ আছে, 'তিনি বাঙলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এ কথা সকলেই বিনা বিচারে স্বীকার করে নিয়েছেন।[৪১] কিন্তু শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় যুক্তি প্রমাণযোগে দেখিয়েছেন যে, বিজয় গুপ্ত বর্ণিত হোসেন শাহ আসলে জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এ মত সমর্থন করেছেন।[৪২]

ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র ধরে, যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাতে প্রতীয়মান হয়, উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির মানুষ ভিন্ন ভিন্ন মতকে সমর্থন করেছে। উচ্চশ্রেণির মানুষ তাদের শাসন ও শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্য কোনো এক ধর্মীয় মতাদর্শকে যেমন ব্যবহার করেছে, নিম্নশ্রেণির মানুষও মুক্তির অন্বেষায় পাল্টা অন্য আরেকটি মাতাদর্শকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। *মনসামঙ্গল* কাব্যের শ্রেণিবিভক্ত সমাজের উচ্চবিত্ত ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের মধ্যে এই যে সংগ্রাম চলছিল অব্যাহত গতিতে, কেউ ইচ্ছা করে তার বাইরে থাকতে পারেনি, বিশেষ করে কবি-সাহিত্যিকরা তো নয়ই। কারণ সমাজজীবন থেকেই তাঁরা উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন। আর শ্রেণিদ্বন্দ্বে আকীর্ণ সমাজজীবন থেকে তারা যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন তাও শ্রেণিসংগ্রাম আশ্রিত হবে তাই তো স্বাভাবিক। তবে সাহিত্যে আশ্রিত শ্রেণিসংগ্রাম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য সংগ্রামের থেকে আরো ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ হবে। *মনসামঙ্গল* কাব্যের শ্রেণি সংগ্রাম অন্ত্যজ শ্রেণির প্রবৃত্তির সংগ্রাম, প্রভুত্ব ও দাসত্বের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে, ধর্মগত বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ।

মনসামঙ্গলের বিস্তৃত পটভূমিতে আছে সরাসরি পরস্পর বিরোধী দু'টি শ্রেণি, একটি উচ্চবিত্ত ও ক্ষমতাসীন সম্প্রদায় অন্যটি বিত্তহীন ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়। 'অন্ত্যজ'র ব্যাখ্যায় পূর্বেই বলা হয়েছে সমাজের অন্তে যাদের বসবাস 'সামাজিকভাবে যারা অগুরুত্বপূর্ণ, অর্থনৈতিকভাবে যারা পঙ্গু এবং উচ্চবিত্ত বা শ্রেণি কর্তৃক যারা অধীনস্ত, অধিকারের প্রশ্নে যারা অধিকারহীন তারাই 'অন্ত্যজ' শ্রেণি বলে এই গবেষণাকর্মে স্থান পেয়েছে।

মনসা : অধিকারহীনা তাই অন্ত্যজ

মনসার জন্ম থেকে যৌবন–আজন্ম মাতৃহীনতা, পিতৃস্নেহের অভাব, বিমাতার বিরূপ আচরণ, বিবাহিত জীবনে স্বামীর অস্বাভাবিক ব্যবহার সঙ্গত কারণেই পাঠক মনে সহানুভূতির জন্ম দেয়। কেননা দেবী মনসার জন্ম থেকে কৈশোর-কৈশোর থেকে যৌবন-বিবাহোত্তর জীবন সবকিছুই নিদারুণ বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার জন্য জীবনে একটি মাত্র ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা আদায় করতে গিয়ে দেবী একটু বেশি নিষ্ঠুর,স্বার্থান্ধ, ছলনাময়ী, সর্বোপরি ভীষণ ভয়ঙ্করী। যদিও কবি বার বার বলেছেন, পূজা প্রচার তথা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই তার এমন ব্যবহার, অন্যথায় তিনি সর্বকল্যাণ দাত্রী। তবে শাসক শক্তির চরিত্রে যেটুকু উদারতা

Dhaka University Institutional Repository

যেটুকু গরিমা থাকে, ক্ষমতা বৃদ্ধির অতিরিক্ত লোভে মনসা চরিত্রে তা লুপ্ত হয়েছে। মনসার ব্যক্তিগত দুঃখ-কাহিনি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে :

পুষ্পবনে আমার জন্ম পৃথিবীর অধ।
রাগের সঙ্গে পরিচয় চণ্ডিকার বধ ॥
চণ্ডীর চেতন গীত রচিয়া সম্ভেদ।
আমার বিবাহের পরে স্বামীর বিচ্ছেদ ॥
আমার দুঃখের কথা শুনি না ভাবিয় ত্রাস।
সত মায়ের বাক্যে বাপে দিল বনবাস ॥
বাপের বিচ্ছেদে মোর প্রাণ পোড়ে শোকে।
জেন মতে পৃথিবীতে পোজে নরলোকে ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৬)

দেবী চণ্ডীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে দেবী মনসা। মনসা তার নিষ্ঠুর আচরণের পটভূমি বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছে :

তোমরা সবে জান আমার নাহি অপরাধ।
মিছা মিছা কার্য্যে দেবী ঠেকায়ে প্রমাদ ॥
আপোনার প্রাণ যাইবে নানা বুদ্ধি রাখি।
আপোন দোষে মরে চণ্ডী মোর দোষ কি।
বলিতে বলিতে পদ্মার ঘুচিল সম্ভ্রম
অখনে প্রকাশ করি আপোনা বিক্রম ॥
শিবের কুমারী পদ্মা দেবের প্রধান।
বল বুদ্ধি বিক্রমে বাপের সমান ॥
চণ্ডীর প্রহার শরীরে সহিতে না পারি।
দেবরূপ এড়িয়া নাগিনী বেশ ধরি ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫৪)

নাগিনী রূপ ধরে মনসা দেবী চণ্ডীকে দংশন করেছিল বা দংশন করতে বাধ্য হয়েছিল কবিতাংশটুকু একথা প্রমাণ করে। প্রকৃতপক্ষে দেবী চণ্ডী যখন মিথ্যা অভিযোগ ও সন্দেহপ্রবণ হয়ে মনসার-উপর একের পর এক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল তার পরিত্রাণের কোন পথ খোলা ছিল না তখনই সে ছোবল মেরেছে সমাজে এধরনের অধিকারহীনা, অন্ত্যজ মানুষদের দেয়ালে যখন পিঠ ঠেকে যায় তখন তারা নিরূপায় হয়ে ছোবল মারে তথাকথিত উচ্চবিত্ত বা উচ্চশ্রেণির মানুষকে। শুধুমাত্র দেবী চণ্ডীর জেদের কারণে মনসার পিতা ঘরে থেকেও মনসাকে আলাদা খেতে হয়েছে। মনসা এবার সুখী হল কারণ সে স্বামীর ঘরে যাবে কিন্তু বিয়ের রাতেই গভীর অন্ধকারে জরৎকারু মুনি হুকুম করে বসলেন, বন থেকে ফুল তুলে আনতে

Dhaka University Institutional Repository

বললেন। গভীর অন্ধকারে বাসর রাতে আনন্দঘন মুহূর্তে স্বামীর অযৌক্তিক আদেশ মানতে বাধ্য নয় মনসা একারণেই সে প্রতিবাদ করেছে। অনাকাঙ্ক্ষিত আদেশ সে স্ত্রী বলেই পালন করবে? মনসা বলেছে :

আজিমাত্র হইছে বিহা নহে পশায় রাতি।
পুষ্প তুলিতে বনে জাব বড়ই ক্ষেয়াতি ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৮৩)

মধ্যযুগের নারী সমাজ ছিল অধীনস্থ। স্বামীর আজ্ঞা পালন না করা অমর্যাদার সমান। সুতরাং মনসার জবাব মুনির আত্মসম্মানে লাগে কিন্তু নারী-নির্যাতনে পারদর্শী পুরুষ ততধিক অসংযত উত্তর দেয় মনসাকে উদ্দেশ্য করে :

পদ্মার বচনে মুনি কোপে কম্পিত।
আর আঁখি করি চাহে মনসার ভিত ॥
হাতে হাতে কচালে দন্তের কটমটী।
কোপে বোলে কি বলিলি ভাঙ্গারার বেটী ॥
মুই জরতকারু মুনি নানা তপে সলি।
মোর আগে দেখাও তোর বাপের ঠাকুরালি ॥
বাপের অহঙ্কারে বড় বাসতো আপনা।
তোর বাপে জানে মুই হই কোন জনা ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৮৩-৮৪)

উচ্চশ্রেণিই হোক আর নিম্নশ্রেণির মানুষই হোক পিতা-মাতার প্রশ্ন তুলে গালি দেওয়ার অপমান কেউ সহ্য করবে না। মনসা অধিকারহীন দেবী চণ্ডীর কাছে বিমাতা বলে দেবী চণ্ডী তাকে ভর্ৎসনা করেছে কিন্তু মুনী জরৎকারুর কাছে তার অধিকার আছে, সে তার স্ত্রী। অথচ মুনির অবজ্ঞা এবং পিতা সম্পর্কে এমন উক্তিতে মনসা জোরালো প্রতিবাদ করেছে। অন্ত্যজ শ্রেণির দেবীর মুখে এই প্রতিবাদ সেই শ্রেণির সচেতনতা বৃদ্ধি করে। মনসার উক্তিতে তার প্রতিচ্ছবি :

মুনির বাক্য শুনিয়া পদ্মার কোপ বাড়ে।
মনে মনে চিন্তে পদ্মা কার্য্যের বিপাক ॥
কুশ কাটা বামনা কিসের পাড়ে ডাক।
তাপর প্রভাবে অহঙ্কারে পথ বহে।
বাপ তুলিয়া গালি পাড়ে প্রাণে কত সহে ॥
অহঙ্কারে নহে বুঝে কেবা কত দূর।
ক্ষেনেকে করিতে পারি অহঙ্কার চূর ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৮৪)

পিতার অপমান সহ্য করতে পারেনি মনসা। স্বামী কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের সে শিকার হয়েছে বলেই জরৎকারু মুনির তপস্যার অহঙ্কারকে সে পদাঘাত করেছে কারণ যে স্বামী স্ত্রীকে মর্যাদা দিতে শেখেনি

Dhaka University Institutional Repository

তার আবার তপস্যা কী, ধর্মই বা কী? তথাকথিত দম্ভোক্তির প্রতি মনসার ঘৃণা প্রকাশ কারণ এই উক্তি নব পরিণীতা স্ত্রীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

মুনির দম্ভোক্তি :

কুশ ফুল তুলিয়া থাকিবি আমার সঙ্গে।
তোর বাক্য থাকুক, মোর বাক্য ব্রহ্মায় না লঙ্ঘে ॥
আর দেবের কন্যা হইলে কহিতে থুইতুম কথা।
দণ্ডের বাড়ী দিয়া ভাঙ্গিমু তোর মাথা ॥

(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৮৪)

মনসা যেহেতু আঘাত পেয়েছে সেহেতু সে আঘাত করেছে নিজেই কারণ সে জানে, সে যে আঘাত পেয়েছে এর বিচার-বিশ্লেষণ কেউ করবে না। আঘাতে আঘাতে একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে তার জীবন প্রদীপ। যেহেতু তাকে রক্ষা করার মতো নিজ ব্যতীত কেউ নেই সেহেতু সে নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে মুনিকে আঘাত করেছে, দেবী চণ্ডীকেও আঘাত করেছে। এটাই কথিত নিষ্ঠুর আচরণ হয়ে দাঁড়ায়, মনসা হয়ে ওঠে ক্রুর, নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন। অন্ত্যজ শ্রেণির দেবতারূপে এভাবেই তার প্রতিষ্ঠা। তাকে উস্কানি দেওয়ার পেছনে সেই সমাজই দায়ী যারা উচ্চশ্রেণির-উচ্চবিত্তের।

শুধু দেব-দেবীর কর্মকাণ্ডে নয় মনসার অবস্থান গ্রামীণ সমাজে আরো অনেক বেশি। যে ঘরে সৎ মা থাকে সেই ঘরের মেয়েরা বঞ্চিত হয় দুই দিক থেকে। মনসা সেই আবহমান বাংলার দুঃখী, বঞ্চিত নারী সমাজের একজন, যে শৈশব থেকেই নির্যাতনের শিকার। প্রশ্ন হতে পারে কী অপরাধে সে বনবাসে যাবে? উত্তরটি মনসার নিজের :

কান্দিয়া বলিল পদ্মা শিবের চরণে।
সৎ মায়ের বাক্যে বাপু মোরে থুইলা বনে ॥

(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১১১)

মনসার আবেদন সামান্য কিন্তু এর আকুতি সীমাহীন কেননা ঘরে আশ্রয় যখন হল না তখন কী গ্রামে আশ্রয় হবে? না গ্রামেও আশ্রয় হয় না। এবার মনসা অনাথ, এতিম, নিরাশ্রয় হয়ে, জনমদুঃখী মানুষের প্রতিচ্ছবি হয়ে আমাদের সামনে আসে। ভিটে মাটি ছেড়ে তাকে চিরদিনের মতো নিরাশ্রয় হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হয়।

তথাকথিত স্বামী, কুলীন ব্রাহ্মণ তাদের যেমন স্ত্রীদের সংখ্যা জানা নেই, কার গর্ভে কে জন্মালো তার কোনো পরিচয় জানে না, সেই ব্রাহ্মণ, কুল রক্ষাই যার কাজ সেই ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি জরৎকারু মুনি। বলা বাহুল্য স্ত্রীকে (মনসা) ভাল না লাগায়, স্ত্রী অধীনস্থ না হওয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন :

পদ্মা হেন স্ত্রীতে আমার নাহি কিছু কাম ॥

(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম নিল 'আস্তিক', সমাজের বিষাক্ত কোপানলে পড়ে সর্বস্ব-হারা মাতা এবার মায়াবলে তার সন্তানের জন্য রাখা দুধটুকুও হারালেন। এভাবেই অন্ত্যজ শ্রেণিকে আরোও বেশি অন্ত্যজ করে শোষণ করেছিল উচ্চশ্রেণির মানুষ। দেবী চণ্ডীর উক্তি :

চণ্ডী বলে ডাকিনীগণ আকাশে কর লুকি।
কামরূপী হইয়া পদ্মার ঘর ঢুকি ॥
নির্ব্বল করিয়া দেবীর বলক টুট।
শুখাও পদ্মার দুগ্ধ না থাকে এক ফুট ॥
বিষম ডাকিনী একে দেবীর আজ্ঞা পাইল।
পদ্মার বুকের দুগ্ধ সকল হরিল ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৯৬)

সন্তানের চিৎকারে মায়ের বুক ফেটে চিরচির হয়। গ্রামের দুঃস্থ, নিরন্ন, অসহায় মাতৃহৃদয় ডুকরে ডুকরে কেঁদে ফেরে। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

দুগ্ধ বিনে ছাইলা কান্দে মায়ের বড় দুঃখ।
দেখিয়া বিকল পদ্মা ছাত্তালের মুখ ॥
ভাবিতে চিন্তিতে পদ্মার মনে লাগে দুখ।
নয়নের জলে পদ্মার ভাসি গেল বুক ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৯৭)

আবহমান বাংলার নিপীড়িত, নির্যাতিত জননীর প্রতীক 'মনসা' চরিত্রের মধ্য দিয়ে যে ছায়াচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তা মূলত নিরন্ন, নিস্পৃহ, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিম্নশ্রেণির জীবনগাথা।

মনসামঙ্গল কাব্যের এই অংশটুকু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমাজের শ্রেণিবৈষম্যের স্বচ্ছ একটি চিত্র, যেখানে সহায়-সম্বলহীন, আত্ম-পরিচয়হীন মানুষ অসহায়ের মতো শুধু ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, হাহাকার করছে, প্রতিকার খুঁজে ফিরছে দুয়ারে দুয়ারে কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ তাদেরকে আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সেদিনঃ

সতাই সঙ্গে বাদ হইল বাম চক্ষু কানা কৈল
সেই কথা ঘোষে সর্ব্বলোকে।
মোর সম দুঃখী জন আর নাহি ত্রিভুবন
প্রাণ মোর যায়ে তোমার শোকে ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১০৮-১০৯)

বস্তুত *মনসামঙ্গল* কাব্যের মনসার দুঃখ-কথা হাজার বছরের আবহমান বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার চিত্র যা কাব্যকথায় চিত্রিত হয়েছে।

চাঁদ সদাগর : উচ্চশ্রেণির তাই অহঙ্কারী

বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় বণিক সমাজ উচ্চশ্রেণির মর্যাদা পেয়েছিল। ঐতিহাসিক বিচারে এই শ্রেণির উত্থান-পতন হয়তো ঘটেছিল কিন্তু সমাজের সকল নিয়ম-কানুন ও গঠনকাঠামো নির্মাণে তাদের উপস্থিতি ছিল সর্বাগ্রে। এভাবেই তারা সমাজে উচ্চকোটিতে

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছে যায় অন্যদিকে ইতিহাস ও ঘটনার পারস্পরিক পরিবেশগত ভারসাম্যে যে শ্রেণিটি টিকে থাকার সংগ্রামে অনবরত সংগ্রাম করছে সেই শ্রেণিটির স্থান নিম্নকোটিতে পৌঁছে। স্বাভাবিকভাবে আর্য আদর্শরূপী ব্রাহ্মণ্য লোকাচার ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা উচ্চস্তরে এবং অনার্য, লোকায়ত আদর্শরূপী বঞ্চিত, সর্বহারা, অবহেলিত মানুষের দল অবস্থান করে নিম্নস্তরে। তারা অস্পৃশ্য, তারা অন্ত্যজ। *মনসামঙ্গল* কাব্যের দ্বন্দ্ব তাই শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব। সমাজের উচ্চশ্রেণির প্রতিনিধি চাঁদ সদাগর। নিম্নশ্রেণির, অনার্য-অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি দেবী মনসা। কাব্যের বিষয়টা হল এই চাঁদ সদাগর পূজা দিলেই মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচারিত হবে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের মতো শিবের উক্তি :

শিব বলেন শুন পদ্মা অপূর্ব্ব কাহিনী।
চান্দরে মারিতে না বল হেন বাণী ॥
চান্দ যদি তোমা পূজা করে একচিত।
তবে সে তোমার পূজা হবে পৃথিবীত ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৫১)

সুতরাং মর্ত্যে চাঁদ সদাগরের পূজা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল মনসা। ঘটনার শুরু চাঁদ সদাগরের নিজের ঘর থেকেই। সোনকা পার্শ্ববর্তী অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের গৃহ হতে মনসার ঘট নিজগৃহে নিয়ে এসেছিলেন। সোনকার নিজের উক্তিতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সোনকা মনসাভক্ত ছিল :

চান্দের ঘরণী সোনাই কিসেরে আসিছে।
এতেক শুনিয়া সোনাই বলিলেক বাণী।
ছয় পুত্র মোর মারিচ আপনি ॥
শিশু হতে ভাবি তুমি পরে কেহ নাই।
তার ফল দিলা মোরে বিষহরি আই ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৯১)

সোনকা স্বেচ্ছায় মনসার ঘট নিজগৃহে নিয়ে এসেছিল কিন্তু চাঁদ সদাগর তা লাথি মেরে, হাতের লাঠি দিয়ে টুকরো টুকরো করে :

চম্পক নগরে ঘর চান্দ অধিপতি।
তাহার ঘরণী সোনকা রূপবতী ॥
শিশু হইতে পোজে সে পদ্মার চরণ।
পদ্মার চরণ বিনে অন্য নাহি মন ॥
মনসার ঘট করিল স্থাপন।
বিবিধ প্রকারে পূজে পদ্মার চরণ ॥
... ...
সোনাই বোলে ধনা রহোত ক্ষেনেকে।
মনসার পূজা আমি করিব পর[ম] সুখে ॥
তাহা শুনিয়া ধনা বড় ক্রুদ্ধ হইল।

Dhaka University Institutional Repository

ত্বরিত গমনে গিয়া সাধুরে জানাইল ॥
বার্তা পাইয়া চান্দ হেতাল লইয়া হাতে।
লড় দিয়া পুরীর মধ্যে চলিল ত্বরিতে ॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে ঘটের উপরে।
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে ঘরের ভিতরে ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৪৫-১৪৮)

চাঁদ সদাগর পূজারত স্ত্রীকে আঘাত করে ক্ষান্ত হননি, সমগ্র সমাজেই মনসার পূজা নিষিদ্ধ করে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, নিজেও মনসার পূজা করবেন না, কাউকে করতেও দেবেন না। এরপর চাঁদ সদাগর যেখানেই মনসাভক্ত দেখেছেন সেখানেই নির্যাতন চালিয়েছেন, ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। মনসার মন্দির পর্যন্ত লুট করেছেন, শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছেন মনসা সমর্থকদের উপর।

অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের উপর নির্যাতন, নিপীড়ণের চিত্র দেখা যায় চাঁদ সদাগর যখন বাণিজ্যযাত্রায় বের হন, নদীর কূলে দেখা হয়েছিল এক কৈবর্তের সঙ্গে, সে স্বীকার করেছিল যে সে মনসাভক্ত। আর তাই :

মনসার পুরী এহি শোন মহাশয়।
ধূপ দীপ দিয়া পূজি মনসার পায় ॥
কৈবর্তের মুখে বার্ত্তা পাইয়া সদাগর।
কোপে রাঙ্গা দুই আঁখি কাঁপে থর থর ॥
ধর ধর বলিয়া চান্দো তখনে রুষিল।
চোপারে চাপরে তার গাল ফুলাইল ॥
... ...
জর্জ্জের হইল কৈবর্ত্ত প্রহারের ঘায়।
লাজ পাইয়া ভয়ে ক্র[ে]ম ধরে ধনার পায়ে ॥
ক্রুদ্ধ হইয়া চান্দো ডাকে উচ্চরায়ে।
হাতে গলে কৈবর্ত্ত বান্দিয়া তুলে নায়ে ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৪৯-২৫০)

মনসামঙ্গল কাব্যের দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দুটি পক্ষ। একপক্ষ আধিপত্য কায়েম করতে চায় অন্যপক্ষ চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা। প্রথম পক্ষ চাঁদ সদাগর স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা সর্বত্র প্রয়োগ করে অন্যদিকে দ্বিতীয় পক্ষ মনসা সেই আক্রমণকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর অনুভূত হয়। এখানে একটি বিষয় না বললেই নয় সেটা হচ্ছে, যেহেতু চাঁদ সদাগর নিজে পূজা করবেন না আবার অন্যকেও করতে দেবেন না। তাহলে বোঝা যায় তিনি অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে এই উক্তি করেছেন। নিজ স্থানে তিনি কঠোর এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সুতরাং মনসাও এখানে অস্তিত্বের মুখোমুখি। উচ্চশ্রেণির বিরুদ্ধে অস্তিত্বের লড়াইয়ে নিম্নশ্রেণি কতটা সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে তার প্রমাণ মনসা চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

নাগদের মাতা মনসা একত্রীভূত হয় অনার্য-কৈবর্তদের সঙ্গে এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয় চাঁদ সদাগরের বিরুদ্ধে এই বিষয়টি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাসের মতই *মনসামঙ্গলের* এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জয়লাভ করেছিল নিম্নশ্রেণির মানুষের দল–মনসা ও কৈবর্তরা। নিম্নবর্ণ হলেও তারা একত্রীভূত ফলে কৈবর্ত-

Dhaka University Institutional Repository

ধীবরদের সঙ্গে যোগ দেয় কৃষকরাও। উচ্চশ্রেণির বিরুদ্ধে অন্ত্যজ শ্রেণির মিছিলে সেদিন পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কৃষক-জেলে-রাখাল ও বঞ্চিত, অসহায় মানুষের দল। দল বেঁধে তারা নেমেছিল সংগ্রামে, এটাই ছিল অস্তিত্বের লড়াই যা বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় ঘটনা। চাঁদ সদাগরের এই নিজেকে দেব-সমতুল্য করে ভাবনার পেছনে ছিল উচ্চশ্রেণির জাতিগর্ব। জাতিগত কৌলিন্যের ও বিত্তের অহঙ্কারে চাঁদ সদাগর মনসা নাম্নী লৌকিক সংস্কৃতিকে মেনে নিতে পারেননি। চাঁদ সদাগরের পরিচয় সূত্রে বলা হয়েছে :

সবে শুনিছ রাজ্যে চম্পক নগর।
তথাতে বসতি করে চান্দো সদাগর ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২৫২)

অথবা,

আমি সাধু চন্দ্রধর রাজ্যের অধিকারী।
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩১৪)

মনসামঙ্গল কাব্যধারায় ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতীক চাঁদ সদাগর সমাজের উচ্চশ্রণির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিম্নশ্রেণির উপর অত্যাচার করেছে। আপাতদৃষ্টিতে এটাই সত্য যে, চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার বিরোধের কারণ মনসার ত্রাস সৃষ্টি কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এটা প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ সদাগর প্রবল প্রভাবশালী এক ব্যক্তিত্ব, যার ভয়ে ও সন্ত্রাসে সমাজ-মানুষ ঘরে-বাইরে সর্বদাই ভীত-সন্ত্রস্ত। চাঁদ সদাগর নিজে এবং তার পোষ্যবাহিনী অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের কাছে ত্রাস সৃষ্টির প্রতীক হিসেবে সর্বত্র বিরাজমান।

সমাজে বিরাজমান পরিস্থিতি যখন অসংযত ; তখন সাধারণ নিম্নশ্রেণির অন্ত্যজ মানুষের কিছুই করার থাকে না। আবার যখন সমাজ নিজেই প্রজা নির্যাতনের হুকুম দেন তখন অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি কৈবর্ত শ্রেণির কিছুই করার থাকে না। স্ত্রী সোনকার কাছে চাঁদ সদাগর সন্ত্রাসের প্রতীক। বাইরের মতো ঘরেও চাঁদের নির্যাতনের শিকার হন স্ত্রী সোনকা। চাঁদ সদাগর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে লখিন্দরকে যখন দেখলেন তখন স্ত্রী সোনকাকে সন্দেহ করে বলেন :

মিছাসে দোষিলাম আমি লঘু জাতি কানি। 466240
তোর পাপে 'বোড়ে আমার নৌকা' চৌদ্দখানি ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩১৭)

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, কোনো কিছু নষ্ট হলে বা ধ্বংস হলে শুধু স্ত্রী-জাতকেই লাঞ্ছিত করা হয়, ভর্ৎসনা করা হয় কিন্তু কেন? সমাজের পুরুষরা কী কোন অপরাধ করে না? শুধু কটুবাক্য বলে ক্ষান্ত হননি চাঁদ সদাগর এবার তিনি স্ত্রীকে প্রহার করলেন :

যত মন্দ বাণী সাধু সোনকারে বলে।
লাফ দিয়া ধরিলেক সোনকার চুলে ॥
সোনাই বলে প্রাণনাথ কর অবধান।
তোমার ঔরসে জন্ম তনয় তোমার ॥
যখনে গেছিলা তুমি দক্ষিণ সফর।
পঞ্চ মাসের গর্ভ তখন আমার উদর ॥
গর্ভ নিদর্শন পত্র দিছিলা লিখিয়া।
পুত্র দেখিয়া প্রভু বিকল কর হিয়া ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সুস্থির হইয়া প্রভু খাও বাটার পান।
পুত্রের মুখ চাও করিয়া শুভক্ষণ ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩১৭)

যে সন্তানের জন্য চাঁদ সদাগরের আনন্দের সীমা নেই, মনমতো পাত্রীর সঙ্গে তার প্রিয় পুত্রের বিবাহ দিতে চান, সেই পুত্রকে চাঁদ সদাগর পেয়েছেন দেবী মনসার ইচ্ছায়। যাদের তিনি নির্যাতন করেছেন, শোষণ করেছেন, সেই অন্ত্যজ শ্রেণির মণ্ডবে সোনকা বর পেয়েছিল :

জালুর মন্তবে মোরে দিয়াছিল বর।
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৩৪৭)

গ্রামীণ মানুষের মনে চাঁদ সদাগর সম্পর্কিত ভীতি সব সময়ই কাজ করত। পুত্র লখিন্দর বিয়ের রাতে মারা যাবে এমন আশঙ্কা থেকে গ্রামের কোন পরিবারই রাজী ছিল না চাঁদ সদাগরের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে। তবে চাঁদ সদাগর যেমন মানুষ তাতে জোর করে কন্যার পিতাদের বাধ্য করতে পারে এমন আশঙ্কায় সাধারণ মানুষেরা দেশান্তরী হয়েছে। শুধু চাঁদ সদাগর নয়, তার সমর্থক বিভিন্ন গোষ্ঠীও এসব জুলুম ও নির্যাতনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে বণিক গোষ্ঠীর সমর্থক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর ধনন্তরী ওঝা ও তার শিষ্যরাও ছিল। একজন সাধারণ গোয়ালিনী ও মালিনীর পসারের নিরাপত্তা ছিল না এদের হাতে। সমাজে নিরূপায়, নিঃসহায় মানুষ এতো বেশী পরিমাণ অসহায় হয়ে পড়েছিল সেদিন, *মনসামঙ্গল* যেন তারই সাক্ষ্য বহন করে। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

দাঁড়াইয়া ওঝার পাশে আড় নয়ানে হাসে
দধি লবা ঘনঘন ডাকে।
শতেক শিষ্য লইয়া মেলা ধনন্তরি করে খেলা
গোওালিনী বলে লবা দই।
ওঝার বিক্রম বুদ্ধি কাড়িয়া খাইল দধি
আজি গোওালিনী জাবা কই।
গোওালিনী ঠাট দেখি হাসে ওঝা আর আঁখি
শতেক শিষ্য করে হুড়হুড়ী।
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ১৭০-১৭১)

চাঁদ সদাগর শুধু মন্দিরের ধন লুট করে সংঘর্ষের সৃষ্টি করলেন না রীতিমত আধিপত্য বিস্তারে নিজেই নেতৃত্ব দিলেন অথচ উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতিভূ চাঁদ সদাগর যিনি কখনো কখনো নিজেকে দেবতুল্য ভাবতেন তিনিই অন্যের সংস্কৃতির উপর আঘাত হানেন এভাবে। দেবতা ও ধর্মের নামে শাসন ও শোষণ ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের অতি সাধারণ কৌশল উচ্চবিত্তের কাছে। এ কারণেই মনসাকে একবার চাঁদ সদাগর তাকেই (চাঁদ সদাগরকে) উল্টো পূজা দিতে বলেছিলেন। কিন্তু উচ্চশ্রেণির এ কৌশল যেদিন ভেঙ্গে যায় সেদিন তা ছিল অকাট্য নির্মম চাঁদ সদাগরের পরাজয়ের গ্লানি তাই এতো বেশি চরম আকার ধারণ করেছিল। নিম্নশ্রেণির মনসা ও তার সমর্থকদের বিজয়ের দিনে চাঁদ সদাগর স্বীকৃতিতে রাজী হয়ে সুবর্ণের ঘট আনার প্রস্তুতি নিলে মনসা বলে 'সুবর্ণের ঘট নয়, ঐ জালু-মালুদের বাড়ী থেকেই ঘট এনে পূজো করতে হবে।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

যে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের হাতে পানি খেলে জাত যায়, যাদের ছোঁয়াতে জাত নষ্ট হয় বলে চাঁদ সদাগর এতোকাল যাদের ঘৃণা করেছেন, নির্যাতন চালিয়েছেন, সেই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের গৃহ হতে তাদের ব্যবহার করা পাত্র এনে অবশেষে চাঁদ সদাগরকে মনসার পূজা করতে হল। চাঁদ সদাগরের মতো ব্রাহ্মণ্য-আশ্রিত উচ্চশ্রেণির মানুষের পরাজয় এখানেই। শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাসে এ ঘটনা অত্যন্ত নির্মম, চরম প্রতিশোধাত্মক। বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণির সংস্কৃতির বিজয় সেদিন এভাবেই প্রথম সংঘটিত হয়েছিল সুতরাং *মনসামঙ্গল* কাব্য এই বিচারে সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন দিক উন্মোচন করল।

মনসা লৌকিক দেবতা এবং নিম্নশ্রেণির মানুষের কাছেই দেবী হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।[৪৪] প্রকৃতপক্ষে নানা পরিবর্তন ও মিশ্রণে সৃষ্ট লৌকিক দেবতা মনসা, তাই অভিজাত শ্রেণি কর্তৃক সহজেই দেবী হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। প্রশ্ন হল, শিব ও চণ্ডী লৌকিক দেবতা হওয়া সত্ত্বেও তারা চাঁদ সদাগরের আরাধ্য দেবতা অথচ মনসার প্রতি চাঁদ এতটা নির্লিপ্ত কেন? এ প্রসঙ্গে বলা সমীচীন যে, শিব ও চণ্ডী বৈদিক দেবসত্তার পৌরাণিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নানা পরিবর্তনে ও মিশ্রণে লৌকিক দেবতা হিসেবে পূজিত হয়েছিলেন। সুতরাং বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা হিসেবে পূর্ব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিব ও চণ্ডী অভিজাত বর্ণের প্রতিনিধি চাঁদ সদাগরের আরাধ্য দেবতায় পরিণত হয়। তাছাড়া, লৌকিক দেবতা হলেও চাঁদ সদাগরের সমাজে অর্থাৎ *মনসামঙ্গলেও* উভয় দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন এক লৌকিক দেবতা, সর্বোপরি নারী দেবতা-মনসা ; তাই তাঁকে দেবী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে চাঁদ সদাগর সম্মত হননি। অন্ত্যজ শ্রেণি বলে এবং অন্ত্যজ নারী দেবতা বলেই মনসার পূজা ,সংগ্রাম করেই পেতে হয়েছে। এখানেই অন্ত্যজ শ্রেণির শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব নিহিত রয়েছে।

সমালোচকের মন্তব্য :

> মনসামঙ্গল কাব্যে চান্দো সওদাগর শুধু বণিক শ্রেণির প্রতিনিধি নন, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক ইতিহাসে অর্থনৈতিক অবস্থান বিচারে প্রধান পুরুষ এবং ওই সমাজের নিয়ন্তা শক্তিও বটে। তাই চান্দোর স্বীকৃতির মাধ্যমেই যে নিজের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং সে স্বীকৃতি দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করবে, এ কথা মনসা জানতেন। এজন্যই তিনি তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শুধু চান্দোর স্বীকৃতি লাভ করতেই সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তবে নারী বলেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে তাঁকে বার বার ব্যর্থ হতে হয়েছে। আসলে মনসা তৎকালীন অবরুদ্ধ, অবমূল্যায়িত ও অধিকারবঞ্চিত নারীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীকী চরিত্র।[৪৫]

বেহুলার স্বর্গযাত্রা : অন্ত্যজ নারীর উত্থান

সমাজে যারা অন্ত্যজ নামে পরিচিত, তারা সমাজের যাবতীয় অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। *মনসামঙ্গল* কাব্যের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলো ঠিক অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নয়, তাদের জন্মই হয়েছিল উচ্চবর্ণের দ্বারা শোষিত হবার জন্য। মনসামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ শ্রেণির দেবী, সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার প্রতিপত্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। লৌকিক ভয়ভীতি থেকেই তার আবির্ভাব এবং সর্পসঙ্কুল পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) দেবীর প্রধান পীঠস্থান সারা বাংলাদেশ জুড়ে, এমনকি বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলেও মনসার প্রভাব ও *মনসামঙ্গলের* আখ্যান প্রচলিত আছে। 'রামায়ণ' কাহিনির মতো এ কাহিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্য *মনসামঙ্গলকে* বাংলাদেশের 'রামায়ণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বেহুলাকে সতী-সাধ্বী দেবী সীতার সঙ্গে তুলনা করে বলেন :

> মনসামঙ্গলের মত কোন মঙ্গলগানই সারা বাংলা এবং আসাম প্রদেশ ব্যাপিয়া এত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। মনসামঙ্গলকে বাংলাদেশের 'রামায়ণ' বলা হইয়া থাকে; কারণ রামায়ণের সীতা চরিত্রের মতই বেহুলার চরিত্র পতিব্রত্য এবং সহিষ্ণুতার গুণে সমুজ্জল।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

মনসামঙ্গল কাব্যে উপজীব্য একদিকে চাঁদের বিদ্রোহ অন্যদিকে বেহুলার পতিব্রত্য। বেহুলা পতিব্রত্যের অগ্নি-পরীক্ষায় বিজয়িনী নায়িকার মূর্তিরূপে দেদীপ্যমান। অর্ধ-সহস্রাধিক বছর ধরে *মনসামঙ্গলের* এই উপাখ্যানটি পূর্ববাংলার ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত ও পঠিত হয়ে সতী বেহুলা বাঙালির মানসপটে আসন করে নিয়েছে। দীনেশ চন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন :

> বেহুলার অমানুষী কষ্ট-সহিষ্ণুতার মর্ম্মভেদী কাহিনীতে পল্লীবাসিনীগণের প্রাণ নিরবধি কাঁদিয়া উঠে এবং তাহাদের হৃদয়ে বেহুলা-সতীর মূর্ত্তি উজ্জ্বল মহিমায় চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায়।[৪৭]

চরিত্রের কোমলতা ও মানসিক শক্তি এই দুটি গুণের একত্র অধিষ্ঠান বেহুলা চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়েছে। বেহুলাকে তৈরি করেছে বাঙালি ঘরের সতীলক্ষ্মী নারীতে। বেহুলাকে 'পতিব্রতার পতাকা' আখ্যায়িত করে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন :

> স্ফীত গলিত কীটাকুলিত পূতিগন্ধি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ও নির্ভয় মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই ক্লেশ ভোগও সামান্য বলিয়া বোধ হয় এবং বেহুলাকে 'পতিব্রতার পতাকা' বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।[৪৮]

বেহুলা রূপে-গুণে অতুলনীয়া। নিষ্ঠুর নিয়তির অমোঘ বিধানে বিবাহের রাতেই সে স্বামীহারা হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত বাসর রাতে লখিন্দর বেহুলার কাছে 'আলিঙ্গন দেও মোরে বানিয়া সুন্দরী' বলে রতি প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু বেহুলা 'বিয়ার রাত্রিতে নাহি এমত ব্যবহার' বলে স্বামীকে নিরস্ত করেছিল। নিদ্রিত লখিন্দরকে দেবী মনসার আদেশে অষ্টনাগ দংশন করতে এলে বেহুলা কৌশলে সিন্দুকের মধ্যে তাদের বন্দী করে রাখে। রাত গভীর হয়ে আসে তখন 'ধোপানীর মন্ত্রে বেহুলা নিদ্রা যায়'। মনসার আদেশে এবার কালীনাগ 'সূতার সমান হইয়া বাসরে প্রবেশে।' আর নিদ্রিত লখাইর 'কেনুয়া আঙ্গুলে মারে বজ্রকামড়।' তাতেই লখাইর মৃত্যু হয়। পুত্র শোকাতুরা লখিন্দরের মাতা সোনকা বিবাহের রাত্রে পুত্রের মৃত্যুর জন্য পুত্রবধূ বেহুলাকেই দায়ী করল। সোনকার উক্তি :

সোনকা এ বলে বধূ তুই বড় রূপসী।
মোর পুত্র খাইলি বড়ই রাক্ষসী ॥
বড় রূপসী তুই গুণের সীমা নাই।
চান্দের বংশ নাশ করিতে ছিল কোন ঠাই ॥
নিশ্চ এ জানিলাম তুমি নিশাচর জাতি।
বিহার রাত্রি স্বামী খালি এ বড় অখ্যাতি ॥
দূরে জাও রাক্ষসী এথা কি কারণ।
খাইয়াছ মোর বাছা সুন্দর লক্ষণ ॥
দূরে যাও বধূ তুই এথা হৈতে চল।
লোকের সঙ্গে ফন্দি তোর কিছু নাহি ফল ।
সোনকার কথা শুনি বেউলার প্রাণ উড়ে।
বৃথা কেন দোষ তুমি দেওত আমারে ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

শাশুড়ির এ ভর্ৎসনা বেহুলা মুখ বুজে সহ্য করেছে, কোনো প্রতিবাদ করেনি তবে সচেতন করে দিয়েছিল যে, এ দৈব বিধানে তার কোনো হাত ছিল না :

বেউলা বলে শাশুড়ি তুমি পরম দেবতা।
আমারে বলহ কেন হেন ছার কথা ॥
নাগিনী দংশিল লখাই মোরে কর রোষ।
আর ছ এ পুত্র মরে সেবা কার দোষ ॥
পাটনেতে চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিল ধন কড়ি।
সেই কালে মাতা আমি ছিলাম কার বাড়ি ॥
ধন গেল কড়ি গেল ডিঙ্গা মুধকর।
সপ্ত দিবা ভাসে শ্বশুর জলের ভিতর ॥
জল পোকে বাসা কৈলা দাড়ির ভিতরে।
কাঁঠাল খাইতে ভিঙ্গুলি কামড়াইল তারে ॥
কাষ্ঠ বেচিতে গেলেন নগরী নগরী।
কুলবধূ ধরি তারে কিলাএ চৌদ্দ বুড়ি ॥
ভাত খাইতে গেলেন চণ্ডালের পাড়া।
সাত শত গাবরে মারি অস্থি কৈল্য গুড়া ॥
বটী দিতে গিয়াছিলেন গৃহস্থের খেতে।
ধান্য কাটিয়া সাজা পাইল ভাল মতে ॥
শ্বশুরের এত দঃখ দিলেন বিধাতা।
সে কালেতে কার দোষ দিলা অগ মাতা ॥

(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৩৪)

বেহুলার এই উক্তিগুলোর মাধ্যমে তার যুক্তিপ্রবণ মন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খুব বেশি কিছু না বলে অল্প বাক্যে সে বুঝিয়ে দিয়েছে দৈব ঘটনায় তার কোনো হাত ছিল না যেমনটি থাকেনা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের। শাশুড়ির জানা ছিল পুত্র লখিন্দর 'বিয়ার রাত্রে তাকে দংশিবে নাগিনী।' কিন্তু লোহার বাসর নির্মাণ করেও তা প্রতিরোধ করা গেল না। কারণ 'বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।'

চিরাচরিত প্রথানুযায়ী গাঙ্গুরীর তীরে লখিন্দরের চিতায় বেহুলাকে সতী হবার নির্দেশ ছিল শ্বশুর চাঁদ সদাগরের। কিন্তু এর প্রতিবাদ করে সবিনয়ে বেহুলা শ্বশুরের নিকট অনুরোধ করে :

বেউলা বলে শ্বশুর তুমি ধর্ম্মের বাপ।
বিহার রাত্রে স্বামী মরে এ বড় সন্তাপ ॥
এই খণ্ড ব্রত হইলে গেলাম ছারেখারে।
না জাতি বিধাতা মোর কি লিখিল কপালে।
পুরাণ কালের কথা কহিছে বুড়াবুড়ি।
সর্পাঘাত হইলে অগ্নিতে না পুড়ি ॥

Dhaka University Institutional Repository

নদীতে ভাসাইয়া দেও লয়ে মোর মতি।
পাছে পাছে যাব আমি প্রভুর সংহতি ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৩৬-৪৩৭)

'সতীদাহ' পালন না করে স্বামীর সঙ্গে ভেলায় ভাসতে চায় বেহুলা। চাঁদ সদাগর এমন প্রস্তাবে প্রথমে সম্মতি দেয় না যেহেতু সমাজের উচ্চশ্রেণি কর্তৃক তৈরিকৃত প্রথা সতীদাহ'র বিপরীত অবস্থান সম্ভব নয় চাঁদ সদাগরের পক্ষে, ফলে চাঁদের উক্তি :

চান্দে বলে দুষ্ট বধূ না বলিয় আর।
অগ্নিতে পুড়িয়া লখাই করি ছারখার ॥
ভাসাইলে হবে যাহা তাহা বোলম ঘুই।
অবশ্য লখাইর সঙ্গে যাবা বাঁ্যাক ঘুই ॥
কূলে কূলে যাবা তুমি লাগ পাইয়া ঘাটে।
লখিন্দর জলে ফেলি তোমা নিব ঠেটে ॥
যার ঘরে যাবা তুমি তার প্রাণেশ্বর।
শিয়াল শকুনে খাবে মোর লখিন্দর ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৩৭-৪৩৮)

অবশেষে সোমাই পণ্ডিত চাঁদ সদাগরকে সম্মতি দানে রাজী করায়। বেহুলার অনুরোধ মঞ্জুর হয়। অশ্রু নয়নে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মৃত স্বামীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বেহুলা কলার ভেলায় সমুদ্রে ভেসে চলল, নিজের বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেহুলা স্বর্গযাত্রা করল, অন্ত্যজ নারীর উত্থান এখানেই।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষ আধিপত্য আর নারীর অবমূল্যায়নের বিষয়টি *মনসামঙ্গল* কাব্যের এই অংশে অর্থাৎ বেহুলার স্বর্গযাত্রা'য় আরও বেশি স্পষ্ট হয় আর এ কারণেই বেহুলা চরিত্রটি সকল চরিত্রকে উপেক্ষা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> এ কাহিনীতে মনসার বিজয়ও ততটা বলা যায় না, এখানে আসলে বিজয় বেহুলারই। কারণ ক্রুর আক্রোশময়ী মনসাদেবী সেদিনের অত্যাচারী, স্বৈরতন্ত্রী রাজশক্তির মতো শেষ পর্যন্ত যথেচ্ছ শক্তির দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেন ; ভক্তি বা শ্রদ্ধা মিশ্রিত বিস্ময় তিনি উদ্রেক করতে পারেন না।[৪৯]

চিরন্তন দেয়া-নেয়ার সংসার বেহুলার জন্য উন্মুক্ত ছিল না। প্রিয়জনের ভালোবাসায় একান্ত আপনজন হয়ে উঠতে পারেনি বেহুলা। শুধুমাত্র সামগ্রিক বিধি-নিষেধ বা দৈব বিধানের শিকার হওয়াতেই নয় বরং সামাজিক তথা দৈব বিধানের প্রতি ; তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা ও কঠিন-কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে জয়ী হওয়ার মধ্যেই বেহুলা চরিত্র বিকশিত। লখিন্দরের অকালমৃত্যুতে বেহুলার কোন হাত ছিল না। মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের বিবাদই এই মৃত্যুর কারণ।

সামন্তবাদী সমাজের সামাজিক বিধান, শ্বশুরগৃহে তথা স্বামীর কোন অকল্যাণ ঘটলেই বধূকেই এর জন্য দায়ী করার রীতি ; সে মানতে রাজী হয়নি, প্রতিবাদ করেছে কিন্তু সমাজ তা মানতে রাজী নয়। উদ্বিগ্ন শ্বশুর চাঁদ সদাগরের মনে শঙ্কা জেগেছে বেহুলার মতো রূপ যৌবনবতী নারীর পক্ষে দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের লোলুপদৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা কোন রকমেই সম্ভবপর হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

তাই রোষে, ক্ষোভে চাঁদ সদাগর বধূকে গৃহে থেকেই দ্বিচারিণীর জীবন যাপন করতে বলেছেন। নিজ জীবনে কোন সুখ সম্ভোগ না ঘটুক, শাশুড়ীর সেবা না করতে পারার দুঃখে দুঃখিতা বেহুলা তার চরণে এই দুঃসাধ্য সাধনায় কৃতকার্য হবার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছে। যে ছয় জা তারই মতো অকালে স্বামী হারাবার বেদনায় মূহ্যমানা তাদের কথাও সে বিস্মৃত হয়নি ; আপন বাহুডোরে তাদের আলিঙ্গন করে স্বামী ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। শুধু তাই নয়, গুঞ্জরীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে যে অগণিত শুভার্থী-সমব্যথী, বিনয়াবনত চিত্তে বেহুলা তাদের আশীর্বাদ চেয়েছে। বেহুলা নারী কিন্তু অন্ত্যজ কিনা এটি প্রমাণ সাপেক্ষ। বেহুলা সতী-সাধ্বী অথচ শ্বশুর তাকে দ্বিচারিণী বলতে দ্বিধা করেনি কারণ সে একাকী মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে স্বর্গযাত্রার মতো কঠিন একটি পরীক্ষা দেয়ার সংকল্প করেছে। সেই সমাজ তাকে দ্বিচারিণী ছাড়া আর কিবা বলতে পারে? বেহুলার সচেতনতা ছিল অসাধারণ নারীর। সামন্তবাদী সমাজে নারী সমাজ যেভাবে অবহেলিত, অবমূল্যায়িত ছিল, বেহুলা যেন তার ওপর করাঘাত করল। পূর্বেই বলা হয়েছে বর্তমান গবেষণায় অন্ত্যজ বলে যাদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তারা ধর্মীয় ও জাতের দিক থেকে নিম্নশ্রেণির এবং অর্থনৈতিকভাবে নিম্ন আয়ের, অধিকারের প্রশ্নে তারা অধিকারহীন। সেক্ষেত্রে পতিব্রতা স্ত্রী–স্বামী নেই, সমাজ তাকে বঞ্চিত করেছে, সে পরিবারচ্যুত, ধর্ম-সংস্কার না মানা এক বিদ্রোহী শক্তি, নারী হিসেবে সে বিধবা আবার সমাজচ্যুত। অধিকারের দিক থেকে সে নগণ্য সে অন্ত্যজ হবেই না কেন? এক্ষেত্রে বলা সমীচীন হবে যে, বেহুলার স্বর্গযাত্রার মধ্য দিয়েই *মনসামঙ্গল* কাব্যে অন্ত্যজ নারীর উত্থান ঘটেছে। বেহুলার সংগ্রাম ও সচেতনতাই অন্ত্যজ নারীর জীবন-রূপকে গতিদান করেছে।

দৈব নির্ভর সমাজের কবি বেহুলাকে আদর্শ নারী চরিত্র হিসেবে কল্পনা করতে গিয়ে তাকে একান্তভাবে দৈব-অনুগৃহীত করেই এঁকেছেন এবং এই দৈব-অনুগ্রহ সে লাভ করেছে চরম ত্যাগ ও পরম কৃচ্ছ-সাধনের মাধ্যমে। এ কারণেই বেহুলার স্বর্গযাত্রার রাস্তাটি ছিল কন্টকাকীর্ণ। বেহুলা তার স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায় এবং এটাই তার দৃঢ় সংকল্প। বলাই বাহুল্য এখানে দেবী মনসা সহজেই বেহুলাকে কৃপা প্রদর্শন করেননি বরং অনেক ছলনার পর বেহুলার চরম আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে, জীবনাবসানের সংকল্পের পরই দেবী কৃপা করেছেন। বেহুলার স্বর্গযাত্রার পথে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তা দেখে মনে হয় বেহুলা অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি বলেই তাকে পুরুষশ্রেণি ও উচ্চশ্রেণি দ্বারা বারবার লাঞ্ছিত হতে হয়। এক্ষেত্রে বেহুলা শ্রেণিবৈষম্যের শিকার হয়েছে। সমুদ্রপথে বেহুলাকে পাড়ি দিতে হল কত ঘাট, কত প্রান্তর, কত জঙ্গল। কত মানুষরূপী পশু কত হিংস্র জন্তু-জানোয়ার একবার বেহুলার দিকে, একবার শবের দিকে হাত বাড়িয়েছে, তখনই দেবী তাকে কৃপা করেছেন । যেমন :

ভোলে পড়িলা গোদা সুন্দরী দেখি জলে।
মদনে উনমত্ত গোদা নাচে কুতূহলে ॥
গোদা বলে সুন্দরী মাজুষ চাপাও ঘাটে।
তোমার পুণ্যের ফলে আইলা গোদার ঘাটে ॥
গোদার ঘরে আসিতে তোমার মনে থাকে আশ।
বড়শি বাহিয়া দিব বড় পাঙ্গাস ॥

(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৫৫)

গোদা চরিত্রটি হীন বর্ণান্তভুক্ত এবং দারিদ্রের কাষাঘাতে পিষ্ট। জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের সামর্থ্য থেকেও সে বঞ্চিত। জীবন সম্ভোগের আদর্শ উপকরণ সমূহের ব্যবস্থা তার নেই। ঘরে তার স্ত্রী বর্তমান এমন পুরুষ হয়েও সে বেহুলার সতীত্ব নাশ করতে জলে ঝাপ দেয় এটা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষ যে বর্ণের বা যে শ্রেণির হোক না কেন *মনসামঙ্গল* কাব্যের সমাজে নারী অসহায় বলে তাকে শিকার করা সহজ বলেই তারা বিশ্বাস করে কিন্তু বেহুলার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি।

একটি বাঁক ছেড়ে অন্য বাঁকে যেতেই বেহুলা সম্মুখীন হয় আরও এক শক্তির যা তার জন্য ওৎ পেতে ছিল বলে মনে হয়। অসংখ্য ভোগ্যপণ্য ভোগের ন্যায় পুরুষ নারীকে ভোগ করত ঠিকই, কিন্তু এ সম্পর্কে সমাজে সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথাগুলো পালনে বিশেষ আচরণমালা নির্দিষ্ট ছিল। এই বিধি-নিষেধ উচ্চশ্রেণির লোকেরা মেনে চলত বলে ধারণা করা যায়। 'কিন্তু তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়, জীবন ধারায় উপ-ধারার স্রোতটি যেখানে প্রবহমান, সেখানে যৌন সংসর্গ সম্পর্কে আদৌ কোনো সামাজিক রীতির নির্দিষ্টতার অস্তিত্বের পরিচয় মেলে না।[৫০] ধনা-মনার ঘাট প্রসঙ্গে সে দেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে সে দেশের যৌন সংসর্গের অনির্দিষ্টতার পরিচয় কবি তুলে ধরেছেন। এই পরিবেশে সতী বেহুলা তার সতীত্ব রক্ষা করবে কীভাবে তার কৌশল তার জানা নেই কিন্তু চেষ্টা প্রাণপণ। বেহুলাকে দেখে ধনা মনা দুই ভাইয়ের ভাগাভাগির চিত্র দেখে মনে হয় সে যুগে নারী এতোটাই সস্তা যে দ্রব্যের মতো ভাগাভাগি করা যায়। যেমন :

পরম সুন্দরী কন্যা জলে ভাসি যায়ে।
এক রাজার ধন আছে সেই কন্যার গায়ে ॥
ঝাটে ধাইয়া চল ভাই স্থির কর হিয়া।
নায়ে চড়ি দুই ভাই কন্যা আনি গিয়া ॥
যত আভরণ আছে সেই কন্যার গায়ে।
শতেক বৎসর খাইলে তাহা না ফুরায়ে ॥
তোমার চরণে ভাই করি নিবেদন।
সেই কন্যা মোরে দিবা তুমি নিবা ধন ॥
মনার কথা শুনিয়া ধনার লয়ে চিত্তে।
নৌকা ঘাটে দুই ভাই চলিলা ত্বরিতে ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৫৯)

নারী সমাজের চরমতম অবমাননার ছাপটি অঙ্কিত হয়েছে *মনসামঙ্গল* কাব্যে বর্ণিত সমাজ-ব্যবস্থায়, বেহুলার মাজুস যখন টেটনের ঘাটে এসে পৌঁছায় তখন তার পরিচয় থেকে বোঝা যায় :

জাতি মালাকার আমি সাধুর নন্দন।
শিশুকালে মৈল বাপ থুইয়া বহু ধন ॥
বাপের ধন হারাইলাম করি অবহেলা।
সকল ধন হারাইলাম খেলাইয়া খেলা ॥
কাইল খেলায়ে হারিয়াছি ঘরের নারী।
সেই খেলা অভাগিয়া পাসরিতে নারি ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৬২-৪৬৩)

মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় নারীরা অবমূল্যায়িত, ভোগ্যপণ্য বিবেচিত, শুধু তাই নয় গৃহের একাধিক পণ্যের ন্যায় জুয়াড়ী স্বামীর জুয়া খেলার সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত। স্ত্রীহারা হয়ে জুয়াড়ী টেটন গলায় কলস বেঁধে জলে ডুবে মরতে চায়। বেহুলা তাকে মাণিক্য দোহারি দিয়ে প্রতিশ্রুতি

Dhaka University Institutional Repository

দেয় লখিন্দরকে বাঁচিয়ে ফেরার পথে তাকে পঞ্চ বিবাহ দেবে। সুতরাং এই কথার সূত্র ধরে বলতে হয় সেই সমাজে শুধু উচ্চশ্রেণির ঘরে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল তা নয়, নিম্নশ্রেণির ঘরেও একাধিক স্ত্রী ছিল। যেমন :

বেউলারে বলে বাপু তুমি এখন ঘরে যাও।
মাণিক্য দোহারি দিয়া কত কাল খাও ॥
আমি গিয়া আসি আগে প্রভুরে জিয়াইয়া।
আসিবার কালে তোমা করাব পঞ্চ বিয়া ॥
এতেক বলিয়া বেউলা ভাসাইলা মাজুষ।
প্রণাম করিয়া চলে টেটনা পুরুষ ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৬৩)

এভাবে সতী কন্যা বেহুলার আদেশে কলার মাজুষ নিজেই ছুটে চলেছে, চলার পথে মনসা বারবার ছলনা করে তার যাত্রাপথকে ব্যাহত করেছে, মনসা কাক শকুনের রূপ ধরে লখিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে যাবার ভয় দেখিয়েছে কিন্তু বেহুলার পণ– একটি হাড় অবশিষ্ট থাকলে সেই হাড়ে বেহুলা লখিন্দরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। নিরম্বু উপবাসে থেকে এক কঠোর ব্রত পালনের প্রতিজ্ঞা করেছে বেহুলা। তার এই ব্রত ভঙ্গ করে মনসা তাকে আদর্শচ্যুত করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু মনসাই পরাজিত হয়েছে।

তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজের মানসিক দৈন্যের পরিচায়ক বিকৃত চরিত্র পুরুষ সমাজ বারবার বেহুলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, হরণ করতে চেয়েছে তার সতীত্বকে। এই ঘোর বিপদে বেহুলা তার মনোবল দৃঢ় করেছে কিন্তু মনসার উপর থেকে আস্থা ও বিশ্বাস হারায়নি এতটুকুও। এমন বিপদের মুহূর্তে কঙ্কণ-আঙ্গুরীই ছিল বেহুলার সম্পদ ; আমরা দেখেছি পথিমধ্যে জুয়াড়ীর দুঃখে দুঃখ পেয়ে তাকে মাণিক্য-অঙ্গুরী দিয়ে সাহায্য করেছে বেহুলা। লখিন্দরের মৃতদেহ পচে গলে চারদিকে উৎকট গন্ধ ছড়িয়েছে. তারপরও বেহুলা সেই মাংসপিণ্ডের মাঝে আগলে রেখেছে লখিন্দরের বাঁচার আশাকে।

মনসার প্রতি অবিচল আস্থা বেহুলার অথচ এই মনসাই তাকে বারবার বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে, কঠিন পরীক্ষায় অংশ নিতে, কিন্তু আঘাত যতই তীব্র হয়েছে, বেহুলার ব্যক্তিত্বে বুদ্ধিদীপ্ততা আরো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। অবশেষে সুদীর্ঘ ছয় মাস পর বেহুলা এসে পৌঁছেছে নেতার ঘাটে। কাজে ব্যস্ত নেতা চঞ্চল শিশুটিকে মৃত করে রেখেছে নিজের কাজের সুবিধার জন্য। কাজ শেষে শিশু পুত্রকে পুনরায় জীবিত করে সঙ্গে নিয়ে গেছে। এসব দেখে বেহুলার মনে হয়েছে এটি কোন সাধারণ নারীর কাজ নয়, নিশ্চয়ই তিনি অসাধারণ। ঠিক তাই, নেতার সঙ্গে পরিচয় হল বেহুলার। দেবসভার রজকিনী নেতা, শিবের কন্যা, বুঝতে পারে বেহুলা, এজন্যই দেবতাদের কাপড় ধৌত করার অনুমতি চায় নেতার কাছে, অনুমতি পায়ও। এবার সে এই সুযোগে পদ্মার কাপড়ে নিজ দুঃখের কাহিনি লিপিবদ্ধ করে। বহু সঙ্কটের আবর্তে উত্তীর্ণ হয়ে দেবপুরীতে পৌঁছালে বেহুলা আবার নতুন সঙ্কটের মুখোমুখী হয়েছে। যে দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে সে স্বামীর পুনর্জীবনের বরপ্রার্থী ; সেই মহাদেবই তার রূপে-গুণে-নৃত্যে-গীতে উন্মত্ত হয়ে বেহুলার সতীত্ব নাশ করতে চেয়েছে। এখানে একটি বিষয় না বললেই নয় যে, দেবতারূপী পুরুষশ্রেণি– *মনসামঙ্গল* কাব্যে বর্ণিত সমাজ জীবনে বর্ণ-শ্রেণি ও যোগ্যতাজ্ঞান বিস্মৃত এবং পরনারী আসক্ত পুরুষশ্রেণির একজন। সামাজিক আনুকূল্যের কারণেই ওই সমাজের জৈবিক তাড়না-উন্মত্ত পুরুষ যে কোনো নারীকেই খেলনা ভেবে নেড়ে-চেড়ে দেখতে ও তাদের নিয়ে খেলতে আগ্রহী। যেকোনো মানুষের চারিত্রিক কলুষতা ও স্খলন তাকে মানসিকভাবে দুর্বল ও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত করে তোলে। তাই

Dhaka University Institutional Repository

মনসামঙ্গল কাব্যে বিধৃত সমাজের কলুষিত মানুষ ও যুবতী মনসার একত্রে পথচলাও সে সমাজের মানুষ স্বাভাবিক মনে করেনি।

সামাজিক অবস্থার কারণেই অবলা নারী পুরুষের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছিল। তাই প্রথম দেখায় কোনো অপরিচিতা নারী কোনো পুরুষের মনে ভোগ-বিলাসের বাসনা ছাড়া আর কোনো ভাবনার জন্ম দেয়নি। বয়স কম হলেও পুরুষ শ্রেণির মোহ ছিল নারী শ্রেণির প্রতি। বেহুলাকে প্রথমবার দেখে নেতার পুত্র ধনপতি বলে :

কন্যা দেখি ধনপতির কৌতুক বড় হিয়া।
জলে কন্যা পাইয়াছি মুই করিব বিয়া ॥
নেতা বলে ধনপতি তোর বুদ্ধি কি।
জলকন্যা নহে বাপু মোর বৈইন ঝি ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৭০)

ধনপতি বেহুলাকে জলকন্যা ভেবে বিবাহ করবে বলে মা নেতার কাছে বায়না ধরেছে। সে সমাজের একজন নারী হিসেবে নেতা জানতো, এ সিদ্ধান্ত থেকে তার পুত্রকে ফেরানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ ধনপতি তার শিশুপুত্র হলেও পুরুষ বটে। উল্লেখ্য, সমাজের সর্বক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃক নারীর অবমূল্যায়ন স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই এক নারীর প্রতি অন্য নারীর স্বাভাবিক মমত্ববোধ ও ভালোবাসার পরিচয় কবির কাব্যে উপস্থাপিত হয়েছে অনিবার্যরূপে। আর এ কারণেই অজ্ঞাত পরিচয় নারী বেহুলার জন্য নেতার মনে ভালোবাসা ও করুণা জাগ্রত হয়। *মনসামঙ্গল* কাব্যের দেবতা ও মানব-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র যথাক্রমে শিব ও চাঁদ সদাগর। এঁরা দু'জনেই মনসার সঙ্গসুখ কামনা করেছেন। এই কাব্যের পুরুষ চরিত্রগুলো প্রায়শই নিজেদের চেয়ে সৌন্দর্যে, বর্ণে বা শ্রেণিতে, সম্পদে সবদিক থেকেই তাদের চেয়ে উচ্চশ্রেণির হওয়া সত্ত্বেও তারা (পুরুষরা) সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে ওই সব নারীর সঙ্গসুখ কামনা করেছে। পদ্মার কাছে বেহুলার বিবরণ :

বেউলারে দেখিয়া শিব কামে অচেতন ॥
মহাদেবে বলে বেউলা আর গতি নাই।
যৌবন সফল কর ভজ মোর ঠাঁই ॥
বেউলা বলে অভাগিনীর কপালে কি আছে।
যেই দিগে ধাইয়া যাই দৈব লাগে পাছে ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৮৯)

দেবসভায় মনসা নৃত্য-গীত প্রদর্শন করে সবাইকে আনন্দ দান করে। মহাদেবের উক্তি :

মহাদেব বলে শোন নন্দী মহাকাল
দেবতা হতে গীত মনিষ্যে গাহে ভাল।
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৮১)

এখানে মানুষ দেবতা অপেক্ষা মহত্তর এটাই প্রমাণ করে, তবে পরক্ষণই আবার বলা হল :

শুভক্ষণে জন্মিয়াছে ধন্য ওহার বাপ।
এত দিনে খণ্ডিল আমার ঊষার সন্তাপ ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৪৮১)

Dhaka University Institutional Repository

ঊষা যে বেহুলা এবং বেহুলা ভাল নৃত্য-গীত করবে এটাই স্বাভাবিক তার পরও ঊষার দেবত্ব শক্তির চেয়ে বেহুলার মনুষ্যত্ববোধ অনেক বেশি প্রকটিত হয়েছে–'সমাজ' নামক অগ্নিকুণ্ডতে পুড়ে পুড়ে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বেহুলা দেবসভার সবাইকে তুষ্ট করে স্বামী লখিন্দরের জীবন ভিক্ষা চায়। মহাদেব বেহুলাকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং মনসাকে ডেকে আনতে বলে মনসা এসে লখিন্দরকে বাঁচালেন। একেএকে ছয় ভাসুরের জীবন, শ্বশুরের চৌদ্দ ডিঙ্গা, ধনন্তরী ওঝার জীবন সবই ফেরত পেল বেহুলা। এ সবের বিনিময়ে বেহুলা প্রতিশ্রুতি দিল :

বেউলা বলে পদ্মা মাগ স্থির কর হিয়া।
শ্বশুরে পূজিব তোমা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫১৭)

এবার চাঁদ সদাগরের পরিবারের নিত্য অকালমৃত্যুর গতিরোধ হল বেহুলার প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়েই।

এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য :

> ছয় অকাল বিধবা পুত্রবধূর গভীর মৌন বেদনা চাঁদ সদাগরের সংসারকে স্তব্ধ শ্মশানের মত নিত্য নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছিল। বেহুলা চাঁদ সদাগরের সংসারে যেন এই গতানুগতিক দুঃখ সহনশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আসিল।[৫১]

কিন্তু বেহুলা এবার 'অগ্নি-পরীক্ষার' সম্মুখীন হল। 'একেশ্বর হইয়া বেহুলা ভ্রমে ছয় মাস।' এ কারণে লখাইর মনে বেহুলার সতীত্ব বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিল। জীবিত ছয় ভাসুরও তা নিয়ে কানাকানি শুরু করে দিল। 'হেন নারী ঘরে নিলে লোক করিবে উপহাস।' ধনঞ্জয় নামের এক সাধু চাঁদ সদাগরের কাছে প্রস্তাব রাখে, দীর্ঘ ছয় মাস পুত্রবধূ সাগরের জলে ভেসে স্বর্গযাত্রা করেছে এমতাবস্থায় সে সতী আছে কিনা , না জানা পর্যন্ত ভোজন করা সমীচীন নয় সুতরাং পরীক্ষার প্রয়োজন সমাজের দাবী। সুতরাং–

প্রথমে পরীক্ষা দিব ঘৃত কাঞ্চন।
আর পরীক্ষা জৌত ঘর করিয়া নির্ম্মাণ ॥
আর পরীক্ষা রাম দিলেন সীতারে।
এই তিন পরীক্ষায়ে শুদ্ধ হইতে পারে ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫৪২)

সমাজ প্রদত্ত এইরূপ পরীক্ষা ছিল সতীত্ব প্রমাণের মাধ্যম , বেহুলা এই পরীক্ষায় জয়ী হল কারণ সমাজের হীন দৃষ্টির গ্রাস থেকে যখন নিজেকে রক্ষা করতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল, তার কাছে এই পরীক্ষা নিতান্তই তুচ্ছ মনে হয়েছে। ফলে বেহুলা তার পরিচয় আর লুকাতে পারেনি। অবশেষে :

এহা শুনি কহে তবে বেউলা সুন্দরী।
সকল জ্ঞাতির স্থানে হস্ত জোড় করি ॥
পদ্মার বাদ খণ্ডাইতে আসিলাম মর্ত্ত্য ভুবন।
বাদ খণ্ডিলে স্বর্গে করিব গমন ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫৪২)

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে সতীলক্ষ্মী পুত্রবধূর অনুরোধ অন্যদিকে দেবী চণ্ডীর আদেশ :

চান্দোরে ডাকিয়া চণ্ডী বলিলা বচন।
তোমার ঠাঁই কহি শুন চান্দ সদাগর ॥
এক মূর্ত্তি 'আমি সেই নাহি অন্য' পর।
যেই ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু সেই মহেশ্বর ॥
(পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৫৩৫)

উভয় কারণেই চাঁদ সদাগরের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হল তিনি বাম হস্তে মনসার উদ্দেশ্যে ফুল ছুঁড়ে দিলেন। এতেই মনসা খুশী হলেন। মর্ত্যে মনসা দেবীর পূজা প্রচার হল। দেবসভায় প্রদত্ত বেহুলার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা হল। আসলে দেবীই হোক কিংবা মানবীয় হোক, *মনসামঙ্গল* কাব্যের মূল বিচার্য বিষয় এটা নয়, বরং কাব্যে মূল বিচার্য বিষয় হল 'নারী'। দেবী হলেও মনসা নারী তাই অধিকারহীনা। এ কারণেই তাকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। আর তাই এই অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিবিধ প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সফলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনে তাকে অত্যাচারীও হতে হয়েছে।

সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্যের শৃঙ্খল ভেঙে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় মনসার শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কেননা নারী বলেই তাকে (মনসাকে) দেবী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পুরুষ চান্দোর ঘোর আপত্তি।[৫২]

শেষ পর্যন্ত মনসা তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সফলতা অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, মনসার এ সাফল্যের পথ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে অন্য এক নারী–বেহুলা। এক নারীর অসম্মানে, তার সম্মান বাঁচাতে কিংবা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে অন্য এক নারীর মনই বেদনার্ত হয়েছে। অবলা নারীকে উদ্ধার করতে সেদিন কোনো পুরুষ এগিয়ে আসেনি। তাই বেহুলার সম্মান বাঁচাতেও এগিয়ে এসেছে মনসা। অন্ত্যজ শ্রেণির দেবীর সেদিন পূজা পাওয়ার মধ্য দিয়েই নারী দেবতার স্বীকৃতি, এখানেই *মনসামঙ্গল* কাব্যের সমাপ্তি কিন্তু বেহুলার স্বর্গযাত্রা ছিল তথাকথিত শ্রেণিসমাজের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন। বেহুলা চরিত্র থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সমাজে নারী অবলা নয়, নারী ক্ষমতাহীন নয়, নারী শুধু নারীই নয়–কখনো কখনো সে পুরুষকে হার মানায়। সুতরাং :

> অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা আর নিরাশা ভরা দুস্তর পথে অগ্রসর হয়ে... লোভের ফাঁদ, বিপদের জাল, অতি ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সংকল্পের সঙ্গে অবিচল নিষ্ঠায় অতিক্রম করে সে জয়ী হল।[৫৩]

এই জয়-ই সম্ভব হয়েছে কঠোর সংকল্প হতে, তাই বলা সমীচীন 'বেহুলার স্বর্গযাত্রার মধ্য দিয়ে অন্ত্যজ নারীর উত্থান ঘটেছে। তবে একথাও সত্য যে, *মনসামঙ্গল* কাব্যে বিধৃত সমাজ-জীবনে নারী ও পুরুষের সামাজিক স্থান ও অবস্থান, চরিত্র ও চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য, মন ও মানস-প্রবণতা, দৃষ্টি ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে বিরাজিত ক্ষমতা ও শক্তির বিরাট ব্যবধান আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাও দূরীভূত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ :

১. যতীন সরকার, *বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭), পৃ. ১৭৩

২. কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোনগার্দ, লেভিন গ্রিগোরি, কতোভস্কি, *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮২) পৃ. ৫৪

৩. অতুল সুর, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস* (কলকাতা : ১৯৭৬), পৃ. ৮৮

৪. উমা সেন , *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ* (কলকাতা : ১৯৭১),পৃ. ৫৫

৫. অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ* (কলকাতা : ১৯৫২), পৃ. ৮৫

৬. নির্মলকুমার বসু, *হিন্দু সমাজের গড়ন* (কলকাতা : ১৯৪৯), পৃ. ১৫২

৭. ঐ, পৃ. ১৫৩

৮. রংগলাল সেন, পূর্বোক্ত, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর, ১৯৮১), পৃ. ১৪৭

৯. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলা সাহিত্যে মাতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব* (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ২০০১), পৃ. ২১০

১০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ, ২০০৬), পৃ. ২০৯

১১. '*হর্ষচরিত*', নির্ণয় সাগর প্রেস, (বোম্বাই, ৪র্থ সংস্করণ) পৃ. ৪২

১২. মুনি পুণ্যবিজয় সম্পাদিত, *জৈন আত্মনন্দ গ্রন্থমালা* (ভবনগর, ১৯১৭) মঙ্গলকাব্য-১৪

১৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১

১৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)* (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং সপ্তম সংস্করণ), পৃ. ৫৭৯

১৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

১৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১৭. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* (কলকাতা : প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪), পৃ. ৩৮

১৮. Romila Thapar, *A History of India* Voll-II (Middlesex : Penguin Books, 1966) P. 29-30

১৯."ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্য : কৃত : উরু তদস্য যদ্বৈশ্য : পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।" (ঋগ্বেদ ১০:৯০:১২) *ঋগ্বেদ- সংহিতা* রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, (কলকাতা : ঈশ্বরচন্দ্র বসু, ১৮৮৬)পৃ. ৭০৪

২০. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালি হিন্দুদের বর্ণভেদ* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৭) পৃ. ৭

২১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)* , (কলকাতা : ১৩৫৯), পৃ. ৭০৫-০৬

Dhaka University Institutional Repository

২২. *পাঠক সংহিতা* সম্পাদনা লিওপোল্ড, ফন শ্রোয়েডার, লাইপৎসিগ (১৯০০-১০)

২৩. প্রফুল্লকুমার সরকার, *ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু* (কলকাতা : ২য় সংস্করণ, ১৯৪১), পৃ. ৭

২৪. ঐ. পৃ. ৯-১০

২৫. জয়নাল আবেদীন , *বাংলা প্রহসনের আলোকে ঊনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সমাজ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ,১৯৮৪), পৃ. ৪১

২৬. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব), [জ্যোৎস্না সিংহ রায় কর্তৃক সংক্ষেপিত] ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় ও লেখক সমবায় সমিতি, কলকাতা ১৩৮২ (সং) পৃ. ৯২

২৭. রামশরণ শর্মা, *ভারতের সামন্ততন্ত্র* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৭), পৃ. ১৫৬

২৮. M. Th. Hautsma, and T.W. Arnold (Editor) *The Encyclopaedia of Islam* (London : Old Edition, 1911), P. 485

২৯. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুহম্মদ এনামুল হক , *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* (কলকাতা : ১৯৩৫), পৃ. ৯১

৩০. *The Encyclopaedia of Islam* P. 485

৩১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত *কবিকঙ্কণ চণ্ডী (প্রথম ভাগ)*, পৃ. ৩৪৫

৩২. নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত , *শরীয়তনামা* (ড. আবদুল করিম সম্পাদিত),(চট্টগ্রাম : বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫, পৃ. ১০৫

৩৩. মুস্তফা পান্না, *বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১৭

৩৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত,পৃ.১৯৭

৩৫. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর* বাংলাদেশে প্রথম সংস্করণ ,(ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৪) পৃ. ১৮৬

৩৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫

৩৭. আহমদ শরীফ, *কালিক ভাবনা*, পৃ. ২২

৩৮. ঐ ,পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

৩৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাইশ কবির মনসামঙ্গল* (কলকাতা : সুজাতা প্রকাশনী, ১৪০০ সাল), পৃ. ৩৪২

৪০. অমৃতলাল বালা, *বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ* (রাজশাহী : বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯), পৃ. ৩৭

৪১. খন্দকার মুজাম্মিল হক, "মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ঐতিহাসিক উপাদান", *ভাষা-সাহিত্যপত্র* (সম্পাদক আবুল খায়ের মোঃ আশরাফ উদ্দিন), (ঢাকা : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঊনত্রিংশ বার্ষিক সংখ্যা, ১৪১০), পৃ. ১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

৪২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর* (স্বাধীন সুলতানদের আমল), (কলকাতা : ১৯৮০), (ভূমিকা অংশ)

৪৩. তন্ত্রবিভূতি, *মনসাপুরাণ* (আশুতোষ দাস সম্পাদিত), (কলকাতা : বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০) পৃ. ৫৪৬

৪৪. হংস নারায়ণ ভট্টার্চায, *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (কলকাতা : ১৯৮০), পৃ. ১৫৯

৪৫. জামরুল হাসান বেগ, "*মনসামঙ্গলের পুরুষ চরিত্র : নারী আসক্তি প্রসঙ্গ*", *সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর* সম্পাদনা, সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ, মাসুদুজ্জামান, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯, বাংলাবাজার), পৃ. ১৩৩

৪৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাইশ কবির মনসামঙ্গল* (কলকাতা : সুজাতা প্রকাশনী, ১৪০০ সাল), পৃ. ৫ (ভূমিকা অংশ)

৪৭. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* প্রথম খণ্ড, (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, নবম সংস্করণ, ১৯৮৬), পৃ. ১৯৮

৪৮. রামগতি ন্যায়রত্ন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* (দীনেশ চন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২-এ উদ্ধৃত) প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১১৮

৪৯. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ. ৫৬

৫০. জয়া সেনগুপ্তা, *মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী* (ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, প্রথম প্রকাশ, ১৫ই এপ্রিল), পৃ. ১০০

৫১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (কলকাতা : পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ৪২৪

৫২. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

৫৩. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), (ঢাকা : বর্ণমিছিল, ১৯৭৮), পৃ. ৪০৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় :

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ

সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রকৃত অর্থেই মধ্যযুগ তথা ষোড়শ শতাব্দীর সমাজ বাস্তবতা উপলব্ধিতে পাঠকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। মধ্যযুগের সমাজ সংগঠন সম্পর্কে গবেষণার জন্য গ্রন্থটি যেমন সমাজবিজ্ঞানীর কাছে গবেষণার অন্যতম তথ্য-উপাত্ত যোগান দেয় তেমনি তৎকালীন সমাজের মানুষের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দরজাও খুলে দেয়। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। বিষয়গুলো হল, রাজনীতি ও অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে* মধ্যযুগের বাংলার ভূমিব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সামন্তবাদী শোষণের এক নির্ভরযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। মূলত ষোড়শ শতাব্দীর ভূমিব্যবস্থা ও সামন্ত শাসনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া, কৃষক সমাজের উপর অত্যাচারের যে চিত্র লেখক উপস্থাপন করেছেন তা থেকে এই ধারণা করা হচ্ছে। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" শীর্ষক অধ্যায়ে তৎকালীন ভূমিব্যবস্থা ও সামন্তবাদী শোষণের এক বাস্তবচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। রাজনৈতিক কারণেই কবি মুকুন্দরামকে এই কাব্য রচনা করতে হয়েছে। "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" অধ্যায়ের মূল অংশ নিম্নরূপ :

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হৈল যেন মতে।
উড়িয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র-দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে ॥
সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন-রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষচষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ ॥
উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হইলা কাল খিল ভূমি লেখে লাল

Dhaka University Institutional Repository

বিনা উপকারে খায় ধুতি।

পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম

পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥

ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ

ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।

প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী

হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥

পেয়াদা সবার কাছে প্রজারা পালায় পাছে

দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।

প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি

টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥

সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাটী যার গাঁ

যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে।

দামুন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রামানাথ ভাই

পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥

ভেঠনায় উপনীত রূপ রায় নিল বিত্ত

যদু কুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।

দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর

দিবস তিনের দিল ভিক্ষা ॥

বহিয়া গড়াই নদী সদাই স্মরিয়ে বিধি

তেউট্যায় হইলুঁ উপনীত।

দারুকেশ্বর তরি পাইল বাতন-গিরি

গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত ॥

নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর

উপনীত কুচট্যা নগরে।

তৈল বিনা কৈল স্নান করিলুঁ উদক পান

শিশু কাঁদে ওদনের তরে ॥

আশ্রম পুখরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া

পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুধা-ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
হাতে লইয়া পত্র মসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ-ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া যাই
আড়রায় হইলুঁ উপনীত ॥
আড়রা ব্রাহ্মণ-ভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিণু নৃপমণি
পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান ॥
সুধন্য বাঁকুড়া-রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু করি করিল পূজিত ॥
সঙ্গে দামোদর নন্দী যে জানে স্বরূপ সন্ধি
অনুদিন করিত যতন
নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়নেরে দিলেন ভূষণ ॥
বীর মাধবের সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রী কবিকঙ্কণে রস গান ॥[১]

আফগান শাসনের অবসান ও মুঘল আধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অরাজকতা বিরাজ করেছিল উপর্যুক্ত কবিতাংশ তারই

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় বহন করে। সামন্তপ্রভুদের রোষানলে কবি-সাহিত্যিকরাও ছিল অসহায়। এ প্রসঙ্গে সমাজ-ইতিহাসকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> There are also instance where the poets and writers are found criticising the administration in strong terms. This type of criticism is noticeable in the writings of Mukundaram, the well-known poet of the sixteenth century. The poet has given an account of the oppressive rule of local officers, the revenue agents and collectors in North Bengal during the subahdari of Raja Mansingh.[২]

তৎকালীন সমাজে সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। সময়টা পূর্বেই বলেছি, সম্রাট আকবরের সময়কাল অর্থাৎ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে* যে শাসন-ব্যবস্থা ও জমিদারী শোষণের চিত্র এঁকেছেন, সে হল সুলতানী তথা তুর্ক-আফগান রাজত্বের অবসান ও সম্রাট আকবরের অধিকার বিস্তারের প্রথমাবস্থার ছবি।[৩] কবি এ কাব্যে সুবেদার মানসিংহের নাম উল্লেখ করে কাব্যটির রাজনৈতিক অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন। জমিদার, ডিহিদার বা তালুকদার শ্রেণির উপর রাজস্ব প্রদানের বিধি থাকায় সময় মতো রাজস্ব পরিশোধ না করলে এই শ্রেণিটি মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের উপর অত্যাচার করত। একারণেই জমিদার, ডিহিদাররা প্রথম থেকেই অধিক রাজস্ব আদায়ের জন্য ভূমিজীবী প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাত। মুকুন্দরামের কবিতায় মধ্যযুগীয় বাংলার ভূমিব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকভাবে ফুটে উঠেছিল।[৪]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সমাজে ভূমিহীন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলোর একমাত্র ভাবনা ছিল কীভাবে রাজা জমিদারদের রাজস্ব মওকুফ করা যায়, যেহেতু প্রজাদের আবেদন-নিবেদনে রাজস্ব আদায়কারীদের নির্যাতন হ্রাস পাবার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেত। দেবী চণ্ডী কলিঙ্গ-রাজ্যে প্লাবনের সৃষ্টি করেন উদ্দেশ্য *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের* নায়ক কালকেতুকে সাহায্য করবেন। যখন দুর্যোগ নেমে এল সর্বত্র তখন দেখা গেল কৃষকদের যাবতীয় শস্য বিনষ্ট হয়েছে, ক্ষেতের ফসল বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু ফসল থাক বা না থাক রাজস্বের হিসাব তাদের দিতেই হবে। একেই তো অন্যের ভূমি তার ওপর রাজস্বের দায়ভার সবকিছু মিলে নিম্ন আয়ের এই মানুষগুলো ছিল অসহায়, দুর্বল। *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের* কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো রাজা-রাজরাদের অত্যাচারে কেমন ভীত, সন্ত্রস্ত এবং সর্বোপরি দুশ্চিন্তায় চলে তাদের জীবনপ্রবাহ–

(ক) বুলান মণ্ডল বলে শুন প্রজা ভাই।
হাজিল বিলের শস্য তাহে না ডরাই ॥
মসীল করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি।
প্রথম মাসেতে চাহি এক তেহাই কড়ি ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৩২)

(খ) হেনকালে তথায় বুলান উপস্থিত।
আইস আইস বলি রাজা করিল সম্বিত ॥
কহ কহ বুলান স্বদেশের বারতা।
কিসের কারণে আইলে কহ সত্য কথা ॥

Dhaka University Institutional Repository

বুলান বলেন রায় কর অবধান।
রহিতে নাহিক ঘর বসিবারে স্থান ॥
জলেতে ভাসিয়া গেল সকল আমার।
কি খাইব কিবা দিব খাজনা রাজার ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৩৪)

(গ) আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর
হাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর ॥
নাহিক বাউড়ি দেড়ি রয়্যা বস্যা দিবে কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৩৫)

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতাংশে রাজস্ব আদায়কারীদের নির্মম অত্যাচার এবং 'ডিহিদার' শব্দটি এখানে শোষণের প্রতীক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বস্তুত ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা এবং রাজস্ব আদায়-প্রক্রিয়ায় একটি বিশ্বস্ত সাহিত্যিক দলিল হিসেবে মুকুন্দরামের উপর্যুক্ত কবিতাংশসমূহকে সহজেই আখ্যায়িত করা যায়।[৫]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সামাজিক স্তরবিন্যাসে দেখা যায় ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে উচ্চে অবস্থান করছে তার কাছাকাছি রয়েছে বণিক ও পুরোহিত শ্রেণির মানুষ। বলা প্রয়োজন যে নিম্নস্তর তথা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের প্রতি তাদের ছিল তীব্র ঘৃণা।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল-বেরুণী ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> এদের কোন বিশেষ 'বর্ণ' বলে গণ্য করা হয় না ; পেশা বা জীবিকাই এদের বর্ণ। এদেরকে অন্ত্যজ বলা হয়। জীবিকা অনুযায়ী এদের আট শ্রেণী। পেশার সাদৃশ্য অনুযায়ী এরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ও বিবাহাদি করে থাকে। কেবল রজক, চর্মকার ও তন্তুবায়ের সাথে অন্য পেশার লোকেরা কোনো সম্পর্ক রাখে না। এই আট শ্রেণী হচ্ছে : রজক, চর্মকার, বাজীকর, ঝুড়ি ও ফাল নির্মাতা, নৌবাহক, মৎস্যজীবী, ব্যাধ ও তন্তুবায়। চতুর্বর্ণের লোকেরা এদের সঙ্গে এক স্থানে বাস করে না।[৬]

উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের বিবাহ ভারতীয় জাতি-বর্ণে ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ , এক্ষেত্রে উচ্চ-বর্ণের জাত চলে যেত, তারা নেমে যেত নিম্ন-বর্ণে। ফলে এ ধরনের আন্তঃবিবাহে কেউই উৎসাহিত হত না।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সমাজে ধনবান ব্যক্তিরা উচ্চ মর্যাদা পেতেন। বণিক মুরালি শীল, কিংবা ধনপতি সদাগর সমাজের উচ্চস্তরে আসীন ছিলেন। অর্থই যে ধনপতিকে উজানী নগরের সকলের কাছে বিখ্যাত করে তুলেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

Mukunda Ram's description gives only professional classes and throws light on the occupational groups of the Muslims.[৮]

আবদুল করিমের এই ব্যাখ্যা সর্বত্র সঠিক নয় কারণ মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলে* বর্ণিত আছে যে, 'গোলা' রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, আর সানাকার 'সানা' প্রস্তুত করে সুতরাং এই ব্যাখ্যায় কিছুটা বিভ্রান্তিকর তথ্য রয়েছে।*চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে* 'মুসলমানগণের আগমন' অংশে মুসলিম সমাজের দুই ভাগে বিভক্ত শ্রেণির পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে জন্মগতভাবে যারা উচ্চ-নিম্ন বংশের তাদের ওপর এবং পেশাগতভাবে যারা উচ্চ-নিম্ন পেশার তাদের বৃত্তি অনুযায়ী। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

ক. কলিঙ্গ-নগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘর বাড়ী
নানা জাতি বীরের নগরে।
পাইয়া বীরের পান বৈসে যত মুসলমান
দিলেন পশ্চিম দিক তারে ॥
আইল চড়িয়া তাজি সৈয়দ মৌলনা কাজি
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটি বোলয়ে হাসন হাটী
বৈসে কলিঙ্গ দেশ ছাড়ি ॥
ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ ॥
ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কেতাব কোরান।
কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শীরিনি বাঁটে
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান ॥
বড়ই দানিসবন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
যার দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা
সারিয়া চেলার মারে বাড়ি ॥
ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথাতে না রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে
ইজার পরয়ে দৃঢ় দড়ি ॥
আপন টোপর নিয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত।
শেরানি নোহালি পানি কুড়ানি বিটুনি হুনি
পাঠান বসিল নানা জাত ॥
বসিল অনেক মিঞা আপন তরফ নিঞা
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোলনা পড়ায়্যা নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া ॥
করে ধরি খর ছুরী কুকুড়া জবাই করি
দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেই মাথা
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪)

খ. রোজা নমাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা ॥
বলদে বাহিয়া নাম ধরাল্য মুকেরি।
পিঠা বেচি কেহ নাম ধরাল্য পিঠারি ॥
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবাড়ি।
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি ॥
হিন্দু হইয়া মুসলমান হৈল গরসাল।
কেহ রাত্রিকাণা হৈয়া মাগে নিশাকাল ॥
সানা বান্ধিয়া ধরে সানাকার নাম।
সুন্নৎ করিয়া নাম ধরয়ে হাজাম ॥
পট্টা পরিয়া কেহ ফিরয়ে নগর।
তীরকর হয়্যা কেহ নির্ম্মাণয়ে শর ॥
কাগজী ধরিলা নাম কাগজ করিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

গায়ে নানা তীর্থ-চিন ভিক্ষা মাগে অনুদিন
গুজরাট এক পাশে বৈসে ॥
সদা লয় হরিনাম বাস্তুভূমি পায় দান
বৈষ্ণব বসিলা গুজরাটে।
কাঁথা কমণ্ডলু লাঠি গলাতে তুলসী–কাঁঠি
সদাই গোঙয় গীত-নাটে ॥
কুশহস্তে বাক্য পড়ি বীর দেয় ভূমি বাড়ি
কুশ নীর তিল করি করে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
সুখে থাকি আড়রা নগরে ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৫০)

খ. ক্ষত্রিয়

সর্ব্বলোক–অবতংস ক্ষত্রি বৈসে ভানুবংশ
চন্দ্রবংশী বৈসে মহাজন।
পুরাণ-শ্রবণ-আশে আনি বিপ্র নিজ বাসে
অনুদিন দেয় নানা ধন ॥
দোসর যমের দূত বৈসে যত রাজপুত
মল্ল-বিদ্যা শেখে অবিরতি।
কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ দ্বিজে দেয় নানা ধন
দেশে দেশে যাহার খেয়াতি ॥
উলিয়া আখড়া-ঘরে মল্লযুদ্ধ কেহ করে
নানা বিদ্যা গুলী চাপগরি।
হাতে ধরি ঢাল খাঁড়া কেহ করে তোলাপড়া
প্রাণে মারে যদি পায় অরি।।
আসি পুর গুজরাট নিবাস করয়ে ভাট
অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল।
বীর দেয় খাসা জোড়া চড়িতে উত্তম ঘোড়া
নিত্য চিন্তে বীরের মঙ্গল ॥

Dhaka University Institutional Repository

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৫১)

গ. কায়স্থ

ঘৃত-কুম্ভে বান্ধি গাছ ভেট নিয়া দধি মাছ
কায়স্থ আইল মহাজন।
প্রণাম করিয়া বীরে নিজ নিবেদন করে
সুখী হইলা ব্যাধের নন্দন ॥

... ...

কুলে শীলে নাহি দোষ কেহ মাহেশের ঘোষ
বসু মিত্র কুলের প্রধান ॥
তব গুণে হইনু বন্দী পাল সে পালিত নন্দী
সিংহ সেন দেব দত্ত দাস।
কর নাগ সোম চন্দ ভঞ্জ বিষ্ণু রাহা বিন্দ
সবে হেথা করিব নিবাস ॥
করি বীর অবধান প্রজাগণে দেহ পান
ঘর-বাড়ী করিয়া চিহ্নিত।
কিছু দিবে ধান্য বাড়ি বলদ কিনিতে কড়ি
সাধন লইবা বিলম্বিত ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৫৩, ৩৫৪)

ঘ. বৈশ্য

বৈসে বৈশ্য মহাজন কৃষ্ণকথা অনুক্ষণ
কৃষিকর্ম্ম করে গো-রক্ষণ।
কেহ কলন্তর লয় কেহ বৃষে ধান্য বয়
কালে কিনে রাখে কোন জন ॥
কেহ দর করি তোলা হীরা নীলা মোতি পলা
কেহ মরকত মণি কেনে।
সাজন করিয়া নায় কেহ নানা দেশ যায়
শঙ্খ চন্দন কিনি আনে
চামরী চামর ভোট সাকলাৎ গজ ঘোট

Dhaka University Institutional Repository

খেটক পট্টিশ আঙ্গরাখি।
এক বেচে আর কেনে নিতি নিতি বাড়ে ধনে
গুজরাটে বৈশ্যজন সুখী ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৫২)

ঙ. বৈদ্য

বৈদ্যজনার তত্ত্ব সেন গুপ্ত দাশ দত্ত
কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ
নানা তন্ত্র করয়ে বাখান।।
উঠিয়া প্রভাতকালে ঊর্দ্ধ ফোঁটা করি ভালে
বসন-মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া লোহিত ধুতি কাঁখে করি খুঙ্গি পুথি
গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে ॥
দেখি জ্বর শিরোরোগ ঔষধ করয়ে যোগ
বুকে ঘাত করে প্রতিজ্ঞায়।
দেখিলে অসাধ্য রোগ পালাইতে করে যোগ
নানা ছলে মাগয়ে বিদায় ॥
কর্পূর পাচন করি তবে সে রাখিতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয় বলে কর্পূর আনিতে চলে
সেই পথে বৈদ্যের পয়ান।।
বৈদ্যজনার পাশে অগ্রদানী বিপ্র বৈসে
নিত্য করে রোগীর সন্ধান।
রাজ-কর নাহি দেই বৈতরণী-ধেনু লেই
হেমযুত তিল লয় দান ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৫২-৫৩)

চ. শূদ্র

(১) তেলি বৈসে শত জনা কেহ চাষী কেহ ঘনা

Dhaka University Institutional Repository

কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল।

কামার পাতিয়া শাল কোড়ালী কোদালী ফাল

গড়ে টাঙ্গী যমধার শেল ॥

লইয়া গুবাক পান বৈসে তাম্বুলী জন

মহাবীরে নিত্য দেই বীড়া।

কর্পূর সহিত পান বীড়া বান্ধে সাবধান

কভু নাহি পায় রাজপীড়া ॥

কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি-কুড়ি গড়ে-পেটে

মৃদঙ্গ দগড়ি গড়ে কড়া।

শত শত এক জায় বৈসে তথা তন্তুবায়

ভুনী খুনী ধুতি বুনে গড়া ॥

মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে

মালা মৌড় গড়ে ফুলঘর।

ফুলের পুটলি বান্ধে পুষ্পসাজি করি কান্ধে

দেই পুরে দেব-দেবী-ঘর ॥

বারুই বসিয়া পুরে বরজ নির্ম্মাণ করে

মহাবীরে নিত্য দেই পান।

বলে যদি কেহ লেই বীরের দোহাই দেই

অনুচিত না করে বিধান ॥

নাপিত নিবসে তথা কক্ষতলে করি কাতা

করে ধরে রসাল-দর্পণ।

বিশেষ বীরের পাশে বস্তু পায় মাসে মাসে

বীরে আসি করয়ে মর্দ্দন।।

আগুরি বসিয়া পুরে আপনার বৃত্তি করে

অনুক্ষণ চিন্তা করে রণ।

করি নানা অস্ত্র-শিক্ষা গুরু বিপ্র করে রক্ষা

অনুচিত করে না কখন।।

মোদক প্রধান জনা করে চিনি-কারখানা

খণ্ড লাড়ু করয়ে নির্ম্মাণ।

Dhaka University Institutional Repository

পসরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে
শিশুগণে করয়ে যোগান ॥
সরাক বৈসে গুজরাটে জীবজন্তু নাহি কাটে
সর্ব্বস্থানে তার নিরামিষ।
পাইয়া ইনাম বাড়ি নিত্য বুনে পাট-শাড়ী
দেখি বীর পরম হরিষ ॥
পুরে বৈসে গন্ধবেণ্যা গন্ধ বেচে ধূপধূনা
পসরা সাজায়্যা যায় হাটে।

শঙ্খবেণ্যা কাটে শঙ্খ কেহ তার নহে বঙ্ক
মণিবেণ্যা বৈসে গুজরাটে ॥
কাঁসারি পাতিয়া শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল
বাটী খোরা বড় হাণ্ডী সীপ।
সাপুড়া চূণা-বাটা নূপুর ঘাঘর ঘণ্টা
সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ ॥
সুবর্ণবণিক বৈসে রজত কাঞ্চন কষে
পোড়ে ফোড়ে দেখায়্যা সংশয়।
কিছু বেঁচে কিছু কেনে নিতি নিতি বাড়ে ধনে
পুর-মধ্যে তাহার নিলয় ॥
গুজরাটে করি ঘর নিবসে পশ্যতোহর
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন হরয়ে সবার ধন
হাত বদলিতে ভাল জানে ॥
পল্ল গোপ বৈসে পুরে কান্ধে ভার করি ফিরে
বৃষগণে রাখয়ে বাথানে।

(*কবিকঙ্কণচণ্ডী*, পৃ.৩৫৬-৩৫৮)

(২) মৎস্য বেচে করে চাষ দুই জাতি বৈসে দাস
কলুরা নগরে পাতে ঘানী।

Dhaka University Institutional Repository

বাইতি বসিয়া পুরে নানাবিধ বাদ্য করে
মাজুরি বেচয়ে ঘরে বুনি ॥
বাগদি বসিল পুরে নানাবিধ অস্ত্র ধরে
দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবসে পুরে জাল বুনি মাছ ধরে
কোচেরা খালই বোনে রঙ্গে ॥
নগর করিয়া শোভা বসিল অনেক ধোবা
দড়াতে শুকায় নানা বাসে।
দরজী কাপড় সীয়ে বেতন পাইয়া জীয়ে
গুজরাটে বৈসে এক পাশে ॥
সিউলী নগরে বৈসে খজ্জুর কাটিয়া রসে
গুড় করে বিবিধ বিধান।
ছুতার পুরের মাঝে চিড়া কুটে মুড়ি ভাজে
কেহ চিত্র করয়ে নির্ম্মাণ ॥
পাটনী নগরে বৈসে নিরন্তর জলে ভাসে
পার করি লয় রাজকর।
আসি তথা জগা ভাট বসি পুর গুজরাট
ভিক্ষা মাগি ফিরে ঘরে ঘর ॥
চৌদুলী কোরঙ্গা মাঝি চুনারী বাউরি বাজী
মাল বৈসে পুরের বাইরে।
চণ্ডাল বসিয়া পুরে লবণ বিক্রয় করে
পানীফল কেসুর পসারে ॥
গায়েন সে গায় গীত কয়ালি ফিরয়ে নিত
একদিকে বৈসে মারহাটা।
ফিরে তারা গুজরাটে শোলঙ্গে পিলুই কাটে
ছানি ফাঁড়ে চক্ষে দিয়া কাঁটা ॥
নিবসে কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল
জায়াজীব বসিল কামিলা।
বাহিরে বসিল হাড়ি ঘাস কাটি লয় কড়ি

Dhaka University Institutional Repository

শুঁণ্ডীর অঙ্গনে যার মেলা ॥

মোজা পানই জিন নিরমায়ে অনুদিন

চামার বসিয়া এক ভিতে।

বিয়নী চালুনী ঝাঁটা ডোম করে টোকা ছাতা

জীবিকার হেতু একচিতে ॥

লম্পট পুরুষ আশে বারবধূগণ বৈসে

একভিতে হইয়া অধিষ্ঠান।

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৫৯-৩৬১)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সমাজে বর্ণভেদ প্রথার নামে যে প্রথা বাঙলায় চালু হয়েছিল সেখানে শুধু চতুর্বর্ণ নয়, দেখা দিল নানা রকম জাত। আর বর্ণভেদ প্রথার নামে যে বিচিত্র জাতভেদ বা বর্ণভেদ প্রথা এদেশে ফুলে ফলে যেভাবে বিকশিত হল তা আজও প্রশ্নের জন্ম দেয়। এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা আজ পর্যন্ত হয়নি।[৯] বাঙলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন লিপি ও স্মৃতিগ্রন্থে ভিনদেশী কৌমের নামের তালিকা পাওয়া যায়। বিভিন্ন কৌমকে নিজের মাঝে স্থান দিয়ে বর্ণসমাজ ক্রমে প্রসার লাভ করেছিল। এ থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে, ব্যর্থ হড্ডি (হাঁড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদি), চণ্ডাল, মল্ল, ভোলাবাহী (দুলে), ট্রজীবী (পাটনী) প্রভৃতিরাও ছিল আদিবাসী কৌম। ক্রমে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এরা সমাজের নিম্নতম স্তরে স্থান করে নিয়েছিল। বাঙলার হিন্দ-সমাজের ছত্রিশ জাতের উৎস এখানেই।[১০] ব্রাহ্মণদের মাঝেও নানারূপ বিভাগ ছিল। তারা গাঞী ও ভৌগোলিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। এছাড়াও বিভিন্ন নামেও তারা বিভক্ত ছিল। মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে* ব্রাহ্মণ সমাজের স্তরবিভাজন কৃতিত্বের দাবীদার। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> The poet gives some more information of the Brahmins society. According to him, Rarh Brahmins and Varendra Brahmins were regarded as kulins in their society at that time. The Rarh Brahmins belonged to West Bengal proper which was knows as Rarh. The Varendra Brahmins had their home in North Bengal called Varendra in the Hindu time. Again among these kulins, Rarh Brahmins held a position of superiority.[১১]

পূর্বেই বলেছি বাঙালি হিন্দুদের জাতের সংখ্যা ছিল ছত্রিশ। বর্ণাশ্রম প্রথার চতুর্বর্ণ বাংলায় কোনদিনই প্রচলিত ছিল না। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবাই ছিল শূদ্র। শূদ্রের মাঝেও বিভাগ ছিল। তাছাড়া ছিল অন্ত্যজরা, যাদের অবস্থিতি ছিল শূদ্রের নিচে। পূর্বে উল্লেখ্য যে, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* শূদ্রকে দু'ভাগে বিভক্ত দেখানো হয়েছে, সৎ শূদ্র ও অসৎ সূদ্র। সৎ শূদ্রের তালিকায় করণ, অম্বষ্ঠ, বৈদ্য,গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কুবর, তাম্বুলী বা তামলী, স্বর্ণকার ও বণিকরা, মালাকার, কর্মকার, শংখকার, কুবিন্দক বা তন্তুবায়, কুম্ভকার, কংসকার, সূত্রধর, চিত্রকর বা পটুয়া। অসৎ শূদ্ররা ছিল সমাজে পতিত শ্রেণি। এদের ভিতর ছিল স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, সূত্রধার, চিত্রকার, অট্টালিকাকার, কোটক (ঘরবাড়ি তৈরী করা যাদের পেশা), তীবর, তৈলকার, লেট, মল্ল, চর্মকার, শুঁড়ি, পৌণ্ড্রক, মাংসচ্ছেদ, রাজপুত্র (বা পরবর্তীকালে রাউত), কৈবর্ত, রজক, কৌয়ালী, গঙ্গাপুত্র, যুঙ্গি, আণ্ডরী।

অসৎ শূদ্রের তালিকায় স্বর্ণকার ও চিত্রকারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কেন? প্রশ্ন হতে পারে। যেহেতু সৎ শূদ্রের তালিকায়ও তাদের নাম আছে, এক্ষেত্রে সমাধান এই যে, *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* অনুসারেই এরা ব্রাহ্মণদের

Dhaka University Institutional Repository

অভিশাপে পতিত হয়েছিল বলেই তাদের নাম অসৎ শূদ্রের তালিকায় স্থান পেয়েছে। বর্ণ বিভাগের সর্বনিম্ন স্তরে যে সমাজের অবস্থান, তারা অন্ত্যজ। এরা অস্পৃশ্য। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* অনুসারে এদের তালিকায় আছে, ব্যাধ, ভড়, কাপালী, কোল, কোঞ্চ, হড্ডি, ডোম, জোলা, বাগদী, শরাক, ব্যালগ্রাহী, চণ্ডাল (নলকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চর্মকার, নাপিত, বেন, নিষাদ, পুক্কস, রথকার একত্রে) ও ম্লেচ্ছ (পুলিন্দ, কক্কস, যবন, খস, কম্বোজ, শবর ও খর)। ব্রাহ্মণদের পরেই ছিল করণ-কায়স্থদের স্থান। ব্রাহ্মণদের মতো রাষ্ট্রের সাথে কায়স্থদের সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠ। অনেকেই উচ্চপদে নিযুক্ত হত আবার অনেকে কালক্রমে সামন্তপ্রভুও হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থে বর্ণ হিসেবে বৈদ্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না তবে অর্বাচীণ স্মৃতিগ্রন্থসমূহে যারা চিকিৎসা করতেন তাদের বৈদ্য বলা হয়। ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মতোই রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল অম্বষ্ঠ বৈদ্যরা। *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে সমার্থক বলা হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রধান চরিত্র কালকেতু, ফুল্লরার জীবিকা-নির্বাহ পেশা-বৃত্তির নাম ব্যাধ-বৃত্তি যা বর্ণ বিভাগের সর্বনিম্ন স্তর অন্ত্যজ পর্যায়ভুক্ত। বর্ণবিন্যাসে সর্বনিম্ন পর্যায়ে হলেও সৃষ্টির আদিতে যদি আমরা সেই সমাজের দিকে তাকাই তাহলে যে আদিমতা আমরা লক্ষ করব তা হচ্ছে শিকার পদ্ধতি যা ব্যাধ-বৃত্তিরই সমার্থক। সামাজিক স্তরবিন্যাসে আদিম সমাজ থেকে মানুষ ধীরে ধীরে সভ্য জগতে প্রবেশ করেছে সুতরাং তাদের প্রধান এবং একমাত্র পেশা ছিল শিকার তাহলে এই পেশাকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহকারী কালকেতু-ফুল্লরা যেমন অন্ত্যজ, তেমনি বর্গের দিক থেকে তারা মূলবর্গের বলা বাঞ্ছনীয়। নৃ-বিজ্ঞানী মিনু মাসানী শিকার যুগকে 'উপজাতি স্তর' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১২]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত পেশা ও বৃত্তি (ব্যাধ) ছাড়াও আরও যে-সব পেশা ও বৃত্তির উল্লেখ আছে তার তালিকা নিম্নরূপ; ডোম, হাড়ী, মালাকার, যাজক, জ্যোতিষী, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, ফকির, মহাজন, মালী, বারুই, বৈদ্য, নাপিত, গোপ, মোদক, তেলি, গন্ধবণিক, ঘটক, চাষী, কামার, তাম্বুলি, কুম্ভকার, তন্ত্রাবায় (তন্তুবায়) শঙ্খবণিক, মণিবণিক, দরজি, কাঁসারি, শিউলি, সুবর্ণবণিক, ছুতার, কলু, পাটনি, মাটিয়া (জাল প্রস্তুতকারী), জগাডাট, ধোপা, পসারী, জাতিজীবী (জায়াজীবী), দাস, চামার, বারবণিতা, কুমার, চালুয়াতি, ময়রা, নাবিক, মালাধর ইত্যাদি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডী অনার্য দেবী। আর্য সমাজের দেবতাদের দাপটে তার যথাযথ সম্মান স্বীকৃত হয়নি তাই তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল কালকেতুর গুজরাট বনে কিন্তু 'ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে' এসে দেবী চণ্ডী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেবী হিসেবে নয় এই আত্ম-প্রতিষ্ঠা মূলত আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের স্বাক্ষর। ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্কৃতির ধারক, বাহক বণিক সমাজে যখন অনার্য দেবী চণ্ডীর স্থান নেই, তিনি যখন এই সমাজের কাছে স্বীকৃতি চাইলেন তখন শ্রেণিদ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠল। দেবী চণ্ডীর আদর্শবাহী খুল্লনার প্রতি ধনপতি ক্রোধে ব্যক্ত করেন, স্ত্রী দেবতাকে তিনি পূজা করতে পারবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধনপতিকে দেবী চণ্ডীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। চণ্ডীর কাছে ধনপতির এই আত্মসমর্পণ মূলত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতীক শিবের আত্মসমর্পণ।[১৩]

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধের অন্তরালে লুকিয়ে আছে উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার বাসনা। এই যুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে টিকে থাকে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলো। তাদের প্রচেষ্টায় কবির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে, তৈরি হয়েছে আধুনিক কল্যাণময় রাষ্ট্র।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে সমগ্র মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতির সকল স্তরে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। নির্যাতিত-শোষিত মানুষ বৈরী পরিবেশ থেকে মুক্তির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রার্থনা করেছে সামন্তপ্রভুদের কাছে, সাহায্য সহযোগিতার জন্য কিন্তু রিক্ত হাতে ফিরতে হয়েছে এসব অধিকারহীন, বঞ্চিত মানুষদের। এ অবস্থায় সেই মানুষগুলো বিকল্প শক্তির সন্ধান করেছে, সেই শক্তি তাদের সত্যিকার অর্থে রক্ষা করতে পেরেছিল কিনা জানি না, তবে তাদের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলাতে তারাই যে-সাহিত্য সৃষ্টি করেছে তার নাম 'মঙ্গলকাব্য'। নাম শুনেই বলা যায় মঙ্গল কিছুর আশায় বুক বেঁধেছিল এসব নিঃসহায় নিরন্ন মানুষগুলো। সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> সমাজের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরালে নিঃশব্দে রূপান্তর সংসাধিত হয়ে চলেছিল। মুসলমান বিজয়ের পর বিশেষ করে বাংলাদেশ মুঘল শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে বাংলার অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বিনষ্ট হয়। বাংলা সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। আর এই অর্থনৈতিক রূপান্তর ধীরে ধীরে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের উপরও নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অবশ্য সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ভাঙার কাজ মুঘল বিজয়ের পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেব আরম্ভ করেছিলেন।[১৪]

মধ্যযুগের নির্যাতিত মানুষগুলো আপন স্বার্থচিন্তার বশবর্তী হয়ে তাদের কল্পিত দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়েছিল। স্বর্গের দেব-দেবীগণ মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হলেন, অধিকারহীনদের পাশে দাঁড়িয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করলেন। এভাবে বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহে আর্য-অনার্য, লৌকিক-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে দেব-দেবীদের নতুন পরিচয় সূচিত হল। সাহিত্য সমালোচক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও দেবতাদের নতুন পরিচয় প্রসঙ্গে তিনটি কারণকে[১৫] অনিবার্য মনে করেন। কারণগুলো হল :

১. আর্য-সংস্কৃতির প্রভাবাধীনে থাকিয়াও বাঙ্গলার কৃষিভিত্তিক লৌকিক ধর্ম-সংস্কার লৌকিক ধর্মমতের সৃষ্টি করিতেছিল।

২. অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ নিজেদের ধর্মমতের সঙ্গে এ সকল লৌকিক ধর্মমতকে মিশাইয়া নূতন নূতন দেব-দেবীর সৃষ্টি করিতেছিল।

৩. মুসলমান ধর্মমত ও অত্যাচারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অসহায় জনসাধারণ এক অলৌকিক দৈব শক্তির কল্পনা করিল এবং সেই শক্তিকে নানাভাবে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে ব্যস্ত হইল। এইভাবেই বাঙ্গলাদেশের লৌকিক দেবতারা ভয় ও সাংসারিক স্বার্থবুদ্ধি হইতে সৃষ্টি হইলেন।

মঙ্গলকাব্য রচনায় ধর্মীয়বিশ্বাস প্রধান প্রেরণা হলেও মঙ্গলকাব্যসমূহে পাওয়া যায় তৎকালীন সমাজজীবনের বহুমাত্রিক পরিচয়। যেহেতু মঙ্গলকাব্যের যুগে ধর্ম ও সমাজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যাত্রা শুরু করেছে একটি ছাড়া অন্যটি যেন কল্পনা করা যায় না, একটিকে অন্যটির পরিপূরক মনে হয়। একারণেই ধর্মীয় প্রভাবের ফলে সমাজে ঘটে যায় নানা পরিবর্তন।

তুর্কী আক্রমণের ফলে বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তন দেখা যায় চরমভাবে। সমাজ-কাঠামো ভেঙ্গে যায় যার কারণে গবেষকগণ তুর্কী আক্রমণকে রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম[১৬] বলে আখ্যায়িত করেছেন। তুর্কী আক্রমণের ফলে যে-সকল সামাজিক পরিবর্তন[১৭] অনিবার্য হয়ে দেখা দিল তা নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

১. পরাজিত হিন্দুসমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনার মাধ্যমে আত্মরক্ষায় যত্নবান হয়;

২. উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে পার্থক্য দূর হতে থাকে এবং

৩. প্রথমে হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ মানুষের ঐক্য এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দু-মুসলমান উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমান বিজয়ীরা বাঙালি হয়ে উঠায় তারা আর বিদেশীয় থাকেননি।

এই পরিবর্তনগুলো একদিনে সংঘটিত হয়নি; ক্রমপর্যায়ে বিবর্তনের ধারায় অগ্রসর হয়েছে। পূর্বে কিছুটা আলোচনা হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে। এক্ষেত্রে আরও কিছু কথা প্রসঙ্গে হিন্দুসমাজের কৌলিন্য প্রথার কথা উল্লেখ করতে চাই। বলা হয়ে থাকে, আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ থেকে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তাদের পাঁচজন কায়স্থ ভৃত্যের ক্রমবর্ধমান বংশধরেরা জটিলতা সৃষ্টি করলে বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন।[১৮] অন্যান্য ব্রাহ্মণদের থেকে কুলীনদের পৃথক করা হল ; আচার, বিদ্যা, বিনয়, দান, তীর্থদর্শন প্রভৃতি গুণের ওপর ভিত্তি করে। *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে* কবিকঙ্কণ যে সকল ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করেছেন তাদের তালিকা এ রকম ; চাটুতি, মুখতি, বন্দ্যো, গাঙ্গুলি, ঘোষাল, কাঞ্জিলাল, পলসাঁই, কুসুমগাঁই, পারিয়াল, পতিতুণ্ড, হড়রাই, গাঁই, মতিলাল, পীতমুণ্ডি, ঘুষুণ্ডী, বড়াল, কড়িয়াল, পিপলাই, বাপুলী, কর্মাই, হিজল গাঁই, মাসচটক, ভাট, নালসী প্রভৃতি। এর পরবর্তী স্তর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বর্ণনা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হিন্দুর পাশাপাশি মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়। তুর্কী আগমনের ফলে মুসলমান শাসন বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সমাজ দুটি বৃহৎ অংশে ভাগ হয়ে যায় সেই সময়েই। একদিকে থাকে বহিরাগত বিশুদ্ধ মুসলমান, অপরদিকে ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলমান যাদের পূর্বপুরুষ এককালে হিন্দু ছিল।

ইসলামের সাম্যবাদী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকে এর আশ্রয় নিলেও কার্যতঃ দেখা গেল মুসলমান জনগোষ্ঠীতে স্তরবিভাগ অনুযায়ী লোকের বৃত্তি ও সামাজিক সম্মান স্থিরীকৃত হয়েছে। আশরফ, আতরফ ও আরজল, এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল সেদিনের মুসলমান সমাজ। আশরফরা এসেছিল আরব, ইরান ও পারস্য থেকে, রক্তে ছিল বিশুদ্ধ সেমীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারা। সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান সম্প্রদায়ের মুসলমানরা গড়ে তুলেছিল আশরফ শ্রেণিটিকে। অপর যে সকল বহিরাগতরা এদেশে এসে বাঙালি নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছিল তারা পরিচিত হল আতরফ নামে। এ ছাড়া দেশীয় ধর্মান্তরিতরা গড়ে তোলে সমাজের নিচুস্তর, অন্ত্যজশ্রেণি, যারা 'আরজল' নামে পরিচিত। এই স্তরবিভাজন কোনো ধর্মগ্রন্থের বলিষ্ঠ সমর্থন পায়নি কিন্তু পরিকল্পিতভাবে প্রচলিত হয় হিন্দু সমাজের প্রভাবে এবং অনেকাংশে নির্ভর করত আর্থিক সচ্ছলতার ওপর। এ থেকে বোঝা যায় যে, সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণিটিও তৈরী হয়েছিল আর্থিক বিচারের মাপকাঠিতে। অনেক কুলীন হিন্দু ধর্মাবলম্বী যেমন বেঁচে থাকার তাগিদে, অধিকারের আশায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল ঠিক তেমনি অনেক মুসলমান রয়েছে যারা সমানাধিকারের আশায় মসজিদ প্রাঙ্গনে সমবেত হয়েছিল, তারা খুব তাড়াতাড়ি কৌশলী অভিজাত শ্রেণির জালে আটকা পড়েছিল। ফলে দেখা গেল অন্ত্যজ ও নিগৃহীত হিন্দুর ধর্মের বদল হয়ে গেল অর্থাৎ তারা অন্ত্যজই থাকল কিন্তু ধর্ম বদল হল, বৃত্তির রূপও পাল্টালো না। এরা তখন নতুন নামে শ্রমজীবী ও উৎপাদক শ্রেণি হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থান করল। এ প্রসঙ্গে গবেষক আহমদ শরীফের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

Dhaka University Institutional Repository

তাঁতী মুসলিম হয়ে হল জুলহা ; হাড়ি-ডোম-বাগদী-চাঁড়াল-ব্যাধ নামান্তরে, হল জেলে, নিকেরী, কাহার, কসাই, মুলুঙ্গী, রঙরেজ, মুজারী, কাগজী, মণ্ডল, বিশ্বাস, সর্দার প্রভৃতি। না ঘুচল তাদের অশিক্ষা, না ঘুচল তাদের দারিদ্র।[১৯]

মধ্যযুগের বাংলার সমাজে ধর্মীয় প্রভাব ছিল ব্যাপক। বস্তুত, ধর্মই ছিল মানুষের সকল চিন্তা-চেতনার নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। সুতরাং ধর্মীয় দিক থেকে যারা সমাজের নিয়ন্ত্রক তারা উচ্চশ্রেণির মর্যাদার অধিকারী ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

অন্ত্যজ শব্দটির ব্যাপকতা সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে ঐতিহাসিক সত্যের মতো। এ কারণেই ইতিহাসকে মানবিক চিন্তার একটা প্রধান কেন্দ্র বললে ভুল হবে না। এমনকি পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতেও ইতিহাসের সংকেত, আখ্যান ও সন্ত্রাস অনবরত ব্যবহৃত হয়েছে।[২০] ইতিহাসই সাক্ষী দেয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের নিম্ন আয়ের, অধস্তন, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন-প্রবাহ গতি পেয়েছিল নাকি স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। তবে একথা সত্য যে, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে যে শ্রেণিটির সংগ্রাম-ইতিহাস রচিত হতে উপাত্ত দিয়েছিল সে শ্রেণিটি হল শ্রমজীবী শ্রেণি। সমালোচক মন্তব্য করেন, 'আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের ছাড়া বাকি সবশ্রেণির লোকদেরকে শ্রমজীবী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।'[২১] অজয় রায় মন্তব্য করেছেন, 'বর্ণভেদ প্রথায় সমাজের চূড়োয় রইলেন ব্রাহ্মণেরা। তারপরই করণ-কায়স্থ ও অম্বষ্ঠ বৈদ্যেরা। বাদ বাকী খেটে খাওয়া দলের অবস্থান তারপর।'[২২]

ভারতীয় হিন্দু বর্ণধর্ম ব্যবস্থার অধীন মধ্যযুগের সামন্তবাদী সমাজে অন্ত্যজ'দের অবস্থান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পরিব্রাজক আল বেরুনী বলেছেন :

> এদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্য উচ্চ শ্রেণীভুক্ত এবং অধম যারা তারা হচ্ছে মেহনতী বা শ্রমজীবী মানুষ। এদের কোন বিশেষ বর্ণ বলে গণ্য করা হয় না, পেশা বা জীবিকাই এদের ধর্ম। এদের অন্ত্যজ বলা হয়। এদের কর্তব্য হচ্ছে সেবা, যাতে উচ্চবর্ণের প্রত্যেকেই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।[২৩]

সুতরাং উচ্চবর্ণের সেবা সামাজিকভাবেই তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এই দিক বিচার করলে তারা সকলেই উচ্চ শ্রেণিটির অধীনস্ত। মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে* অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন নানারূপে যেমন রূপায়িত হয়েছে তেমনি অনুকূল-প্রতিকূলতায় কখনও উচ্চবর্ণের দ্বারা অনুগ্রহ লাভ করেছে, কখনও কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। তৎকালীন সমাজ যেহেতু সামন্ত-অর্থনীতির সমাজ সেহেতু সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারে এসব মানুষ শোষিত হয়েছে বার বার। আর তখনই তারা আরাধ্য দেবতাকে কল্পনা করেছে বিপদ থেকে উদ্ধারের রাস্তা খুঁজেছে। আমরা সেই শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার রূপায়ণ আলোচনার প্রয়াস পাবো যারা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে* একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। যারা সমাজতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার উপাদান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবেত্তাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতু ব্যাধ-বৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। কালকেতুর এই ব্যাধ-বৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমে বোঝা যায় মধ্যযুগে বাংলাদেশের সমাজে আদিম শিকার–যুগের কতক উপাদান বিদ্যমান ছিল। যারা শিকার করে তাদের শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী হতে হয় যেমন :

ক. শিশুগণ সঙ্গে ফিরে শশারু তাড়ায়্যা ধরে
দূরে পশু পালাইতে নারে।
বিহঙ্গ বাট্যুলে বধে লতাতে জড়ায়ে বান্ধে
কান্ধে ভার বীর আস্যে ঘরে ॥
গণকে আনিয়া ঘরে শুভদিন শুভবারে

Dhaka University Institutional Repository

ধনু দিল ব্যাধসূত-করে।

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ১৭২)

খ. অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল।

কুরুরাজ-সেনা যেন বধে বৃহন্নল ॥

শুণ্ডে ধরি আছরিয়া মারে মাতঙ্গেরে ।

দন্ত উপারিয়া বীর আনে ভারে ভারে ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ১৮৩)

কালকেতু কর্তৃক বনের পশুদের হত্যাকে সামালোচকেরা উচ্চশ্রেণি কর্তৃক অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষকে শোষণের রূপকচিত্র হিসেবে কল্পনা করেছেন। পশুরা ক্রন্দন করতে করতে দেবী চণ্ডীর কাছে আসে :

ক. উই চারা খাই আমি নামেতে ভালুক।

নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক ॥

সাতপুত্র নিলা বীর বান্ধিয়া জাল-পাশে।

সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২০২)

খ. কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে।

হরিণ ভুবনে বৈরী আপনার মাংসে ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২০৪)

উল্লিখিত কবিতাংশে দু'টি বিষয়কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভাল্লুক নিতান্তই অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি এবং নেউগী, চৌধুরীরা সেই সমাজের শোষকশ্রেণি আবার অন্যদিকে হরিণ অদৃষ্টকে দোষারোপ করে বলছে এমন পাপবংশে তার জন্ম হল কেন ? জাতিতে ছোট বলেই তাকে শোষণ করা সহজ। সমালোচকদের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

ক. ক্ষেত্র গুপ্ত

কালকেতুর অত্যাচারে পশুদের ক্রন্দনের ভাষায়ও রাজকীয় অত্যাচারে পীড়িত ভূমিভিত্তিক মানুষের ক্রন্দন শ্রুত হয়েছে।[২৪]

খ. ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

দেবী চণ্ডীর নিকট পশুগণ কালকেতুর অত্যাচারের কথা করুণভাষায় নিবেদন করিতে লাগিল। পশুগণের এই ক্রন্দন ও বিলাপের মধ্যে একটু লক্ষ করিলেই তৎকালীন শোষিত ও উৎপীড়িত মানুষের করুণ ক্রন্দনের সুরটুকু শোনা যায়।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

কালকেতুর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বনের পশুরা সংঘবদ্ধভাবে দেবী চণ্ডীর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রকাশ করেছে তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা-নির্যাতনের কথা :

বাঘিনীর শুন কথা কালকেতু দিল ব্যথা
স্বামীরে বধিল একবাণে।
দুইটি আছিল পো তারে বড় মায়া মো
কালকেতু বধিল পরাণে ॥
কান্দিয়া মহিষ কয় নিবেদিতে করি ভয়
কালকেতু লাগিল বিবাদে।
হইগো তোমার দাস বনে খাই পানী-ঘাস
বধ করে বিনি অপরাধে ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২০৬)

পশুদের এই করুণ ক্রন্দনধ্বনি জায়গীরদার-ডিহিদার এবং সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলো এভাবেই প্রতিবাদ জানিয়েছিল কল্পিত দেবতার কাছে, রক্ত মাংসের কোন মানুষের কাছে নয় কেননা কোন মানুষই তাদের বিপদে এগিয়ে আসে নাই নিম্নশ্রেণি বলে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তৎকালীন সময়ের যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অস্ত্রগুলোর নাম, ধনুক, বর্ম্ম, ঢাল, ভিন্দিপাল, শেল, খরশাণ, শর, কামান, কৃপাণ, চক্রবাণ ইত্যাদি। *চণ্ডীমঙ্গলে* পাওয়া যায় :

যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম কিনিল অভেদ্য চর্ম্ম
নানা রত্ন বিচিত্র মুকুট।
কিনিল মহিষা ঢাল তাড়িপত্র করবাল
মুঠ যার রচিত পুরট ॥
তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল শেল সাঙ্গি
ভূষণ্ডী ডাবুশ খরশান।
হীরামুঠি যমধর পট্টিশ খেটক শর
কেনে বীর কামান কৃপাণ ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৯৮)

যে দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর আর কৃষির প্রধানতম উৎপাদন উপকরণ ধান, সেহেতু সকলশ্রেণির মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। ভাত প্রধানত খাওয়া হত শাক ও অন্যান্য ব্যঞ্জন দিয়ে। দরিদ্র এবং গ্রাম্য মানুষদের খাদ্য তালিকায় শাক আর ভাত স্থান পেয়েছে। মাংস জুটতো খুব কম। তবে মাংসের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

হরিণের মাংস খুব প্রিয় ছিল সবার কাছে, বিশেষ ভাবে শবর, পুলিন্দ, ব্যাধ প্রভৃতি শিকারজীবী মানুষদের কাছে এবং অভিজাত শ্রেণির হাট-বাজারেও চাল, ডাল, বড়ি ইত্যাদি দ্রব্য প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রন্ধনশৈলীর গুণকীর্তন বর্তমান সমাজেও দেখা যায়।

মৎস্য মাংস আদি করি পরশে ফুল্লরা নারী
সুখে ভুঞ্জে কিরাতনন্দন।
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ১৮২)

ফুল্লরার হাতের পরশে রন্ধন যেন আরও সুস্বাদু হয়েছে, ধর্মকেতু তৃপ্তিবোধ করে–

যোগান ফুল্লরা বধূ ক্ষীর খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ১৮২)

ভাত খাওয়ার পর দধি-মিষ্টান্ন খাওয়ার রীতি বর্তমান সমাজেও আছে। পুত্রবধূর এসব যোগান দেখে শাশুড়ী নিদয়া নিজেকে সফল মনে করছে। কালকেতুর শিকারে যে সব প্রাণীর বধ হত যে সকল প্রাণীই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের ভক্ষ্য ছিল। তবে সন্দেহ নেই 'নিম্নতর সমাজ-স্তরে এবং আদিবাসী কোমের লোকদের মধ্যে শামুক, কাঁকড়া, মোরগ প্রভৃতির মাংস, নানা প্রকারের আঁশ ছাড়া মাছ, সর্পাকৃতি বাণ মাছ, গর্তকাদাবাসী নানা প্রকারের অকুলীন মৎস্য, নানা প্রকারের পক্ষী মাংস সমস্তই ভক্ষ্য ছিল। পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে গোধা, শশক, সজারু এবং কচ্ছপ খাওয়ার খুব বাধা-নিষেধ 'কাহারো পক্ষে কিছু ছিল না'। এ কথা ভবদেব নিজেই বলিতেছেন তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ গ্রন্থে। ...শবর, পুলিন্দ, নিষাদ জাতীয় ব্যাধদের প্রধান বৃত্তিই তো ছিল হরিণ ও অন্যান্য পশুপক্ষী শিকার।[২৬]

কালকেতুর ভোজন অংশে আমরা যেসব খাদ্যের সঙ্গে পরিচিত হই তা *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের সমাজে বিদ্যমান অবশ্য নিম্নআয়ের মানুষের জন্য ছিল এসব খাদ্য। খুদজাউ, মুসুরী, লাউ, আলু, ওল, কচু, করঞ্জা, আমড়া, দধি, সরিষা, মাষ, গুড়, তিল, মুগ, বরবটি, তণ্ডুল, ছোলা, মুলা, চিনি ইত্যাদি।

আখেটিক বা ব্যাধ খণ্ডে কবি কালকেতু-ফুল্লরার জীবনকে চিত্রিত করেছেন গভীর মমত্ব দিয়ে কিন্তু প্রিয় খাদ্য কিংবা শয়ন-ভোজন প্রক্রিয়াকে প্রশংসা করতে পারেন নি কারণ অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের খাদ্য তালিকা কখনও আভিজাত্যে ভরপুর হতে পারে না। কবি কালকেতুর ভোজনের সময়কে বলেছেন 'কুচ্ছিত বিটকাল'। কবির বর্ণনা :

মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে ॥
চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ।
ছয় হাণ্ডি মুসুরী-সুপ মিশ্যা তথি লাউ ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া ॥

Dhaka University Institutional Repository

অম্বল খাইয়া বীর বনিতারে পুছে।

রন্ধন কর‍্যাছ ভাল আর কিছু আছে ॥

এন্যাছি হরিণী দিয়া দধি এক হাঁড়ি।

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল।

ছোট গ্রাস তোলে যেন তেয়াঁটিয়া তাল ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ১৮৮)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিকখণ্ডে কবি মুকুন্দরাম রাঢ় বাংলার মানুষের লোভনীয় খাদ্যদ্রব্যের যে তালিকা দিয়েছেন তা যেকোনো ভোজনরসিক ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিককে প্রলুব্ধ করার জন্য যথেষ্ট। আমরা বণিক খণ্ডে দুর্বলার খাদ্যদ্রব্য ক্রয় অংশে দ্রব্য ও তার দর-দাম জানতে পারি–

লাউ কিনে কচি কুমড়া বিশাদরে পলা কড়া

পাকা আম্র কিনে শয় মূলে।

কিনিঞ্চা নবাত ফেনি বিশা দরে কিনে চিনি

পান কিনে সহস্রের দরে।

মূল্য দিআ পণ দশ জিয়ন্ত কিনিল ঝষ

জরট কমট কিনে রুই।

খরুসালা কিনে কই কিনিল মহিষা দই

কামরঙ্গ কিনে পণ দুই।

কলা চাঁপা মর্তমান সরস গুয়া মিঠা পান

কর্পূর কিনিল শঙ্খ-চুন।

সাক বাগ্যন সারি কচু খাম-আলু কিনে কিছু

বিশা শত আট কিনে লোন।

নরম কিনে তালশাঁস হিঙ্গজিরা রসবাস

চঞ্চি মেথি জোহানি মহরি।

মুগ মাষ বরবটী কিনিল সরল পুঠি

সের জুখ্যা লয় ফুলবড়ি।

রন্ধন-সন্ধান জানে পঙ্কাল চিঙ্গড়া কিনে

সৌল পোনা কিনে দুয়া চেড়ি।

মান ওল কিনে সারি দুগ্ধ কিনে ভার চারি

পুঞ্জি দশ কিনিল কাঁকুড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর সাধুর দাসী আট কাহনে কিনে খাসী
তৈল সের দরে বুড়ি।
তোলা মুলে তেজপাত খির নিল বিশা সাত
আদা বিশা দরে দেড় বুড়ি।
জুড়ি দরে নারিকেল কুলি করঞ্জা পানিফল
কাঁঠাল কিনিল দুই কুড়ি।
কিছু কিনে ফুলগাভা করুনা কমলা টাবা
সের দরে ঘৃতে ঘড়া ভরি।
নির্মাণ করিত পিঠা বিশা দরে কিনে আটা
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট।
দুবলা বেসাত্যে জানে অবশেষে হাঁড়ি কিনে
মাগ্যা লয় তার কিছু ভাট।
কিনিঞা রন্ধন-সাজ কিছু কিছু নিল ব্যাজ
হরিদ্রা চুপড়ি ভরি কিনে
স্নান করি দুবলা খায় খণ্ড দধি কলা
চিড়া দধি দেয় ভারিগণে।

(চণ্ডীমঙ্গল : সুকুমার সেন : ২৭১ পৃ. ১৫৭-৫৮)

অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা যেসব খাদ্য ক্রয় করে বা গ্রহণ করে তা নিম্নশ্রেণির মানুষের জন্য ছিল সোনার হরিণ পাওয়ার মতো। সুক্তা, ঝোল, ঘন্ট, ঘিয়েভাজা জবজবে মাছ-মাংসের বড়া, ভাজা কইমাছ ইত্যাদি মধ্যযুগের অভিজাত সমাজ থেকে বর্তমানে উন্নত পরিবারের খাদ্য তালিকায় এসেছে। 'বণিক খণ্ডে' লহনার রান্না থেকে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় :

রন্ধন করিতে হইল লহনার ত্বরা
ঘৃত পুর‍্যা রাখে রামা কুড়িয়া পাথরা।
ঘৃতে জবজব রান্ধে নালিতার শাক
কটু তৈলে বাথুয়া করিল দৃঢ় পাক।
খণ্ড মুগের সুপ উভরে ডাবরে
আচ্ছাদন থালা খানি দিলেন উপরে।
কটু তৈলে রান্ধে রামা চিথলের কোল
রুহিতে কুমড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল।

Dhaka University Institutional Repository

রান্ধিল ছোলার সুপ দিআ তথি খণ্ড
অলস তেজিআ জাল দিল দুই দণ্ড।
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে গণ্ডা দশ
মুঠ্যে নিঙ্গড়িয়া তথি দিল আদারস।
বদরি শকুল মীন রসাল মুসরি
পণ চারি ভাজে রামা সরল-শফরী।
কতোগুলি তোলে রামা চিঙ্গড়ির বড়া
ছোট ছোট গোটা চারি ভাজিল কুমুড়া।
পঞ্চাশ বেঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন
থালায় ওদন বাটী ভরিআ বেঞ্জন।

(চণ্ডীমঙ্গল : সুকুমার সেন : ২৫৬ পৃ. ১৫০)

অন্যদিকে কালকেতুর মাতা নিদয়া অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি। পূর্বেই বলেছি ,এই শ্রেণিটি দু'টি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'নিদয়া' যেমন ব্যাধ শ্রেণির, সামাজিকভাবে অন্ত্যজ, অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবেও দুর্বল সে। সুতরাং তার খাদ্য তালিকা থেকে বোঝা যায়, সেই সমাজে নিম্নশ্রেণির জীবনযাত্রায় খাদ্যাভাস কীভাবে প্রভাব ফেলেছে। উল্লেখ্য যে 'নিদয়া' এখানে গর্ভাবস্থায় যা যা খেতে চেয়েছিল তার বর্ণনা থেকে অল্প আয়ের মানুষের খাদ্যাভাস সম্পর্কে জানা যায় :

আপনার মত পাই তবে গ্রাস কত খাই
পোড়া মাছে জামিরের রস ॥
নিধানী করিয়া খই তাহাতে মহিষা দই
কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।
যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আমসি ॥
আমার সাধের সীমা হেলঞ্চি কলমী গিমা
বোয়ালী কুটিয়া কর পাক।
ঘন কাটি খর জ্বালে সাতলিবে কটু তেলে
দিবে তাতে পলতার শাক ॥
পুঁই-ডগা-মুখী-কচু তাহে ফুলবড়ি কিছু
আর দিবে মরিচের ঝাল।
হরিদ্রা-রঞ্জিত কাঞ্জী উদর ভরিয়া ভুঞ্জি
প্রাণ পাই পাইলে পাকা তাল ॥

Dhaka University Institutional Repository

লবণ কিছু দিয় বাড়া নকুল গোধিকা পোড়া
হংস-ডিমে কিছু তোল বড়া।
কিছু ভাজ রাই-খড়া চিঙ্গড়ির তোল বড়া
সজারু করহ শিক-পোড়া।
সদাই নাকার উঠে দিনে দিনে বল টোটে
বদনে সদাই উঠে জল।
মুলাতে বেগুন সীম তাহে কিছু দিহ নিম
আর দেহ উড়ুম্বর ফল ॥
নিদয়ার সাধ হেতু ঘরে ঘরে ধর্ম্মকেতু
চাহিয়া আনিল আয়োজন।
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ১৬৫-১৬৬)

'নিদয়া' যা যা খেতে চেয়েছে তার সব খাবারই যে নিম্নশ্রেণির জন্য তা নয় তবে আভিজাত্যের ছোঁয়া আছে এমন খাবারেরও উল্লেখ নেই এখানে।

চীনা পর্যটক 'ফেই-শিনের 'শিং-ছা-শ্যং-লান' গ্রন্থ (১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত) এর বরাত দিয়ে ডক্টর সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন, সে যুগের বাংলাদেশের মেয়েদের রং ছিল 'সাধারণত ফরসা' এই জন্য তারা অঙ্গরাগ ব্যবহার করত না। তবে অন্ত্যজ মেয়েরা তখন মৃগ-ছাল পরিধান করত (ফুল্লরা পরিবে মৃগ–ছাল)। মুসলিম পুরুষেরা মাথায় টুপি পড়ত, আর মেয়েদের পরিধানে থাকত 'ইজার'। শাড়ির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল পাটশাড়ী এবং তসরের শাড়ি। যেসব অলংকারের নাম আছে *চণ্ডীমঙ্গলে* সেগুলো হল, স্বর্ণচুড়ি, কুণ্ডল, কণ্ঠমালা, হীরার পলা ইত্যাদি। মেয়েরা প্রসাধনের জন্য ব্যবহার করত মোহন কাজল, আলতা ইত্যাদি। চুলের জন্য ব্যবহার করত আমলকীর তেল।

'কালকেতু'র হাতে যখন অর্থ এল তখন কালকেতু যে দ্রব্যাদি ক্রয় করল তা মুলত উচ্চশ্রেণি বা উচ্চবিত্তের ব্যবহার্য। এসব ভূষণ অলঙ্কার তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান ছিল। যেমন :

চন্দন-কাঠের কুড়া লম্বিছে মুকুতা ছড়া
কিনে দোলা রতনে ভূষিত ॥
পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজি বাছিয়া কিনিল বাজী
গজ কেনে পর্ব্বতের চূড়া
লম্বমান মতিহার অঙ্গদ কঙ্কণ আর
কিনে বীর কনক-সাপুড়া ॥

ফুল্লরাকে খুশী করতে কালকেতু ক্রয় করে :

পুরিতে জায়ার সাধ কিনিল পাটের জাদ
মণিময় মুকুতার বেড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

হীরা নীলা মোতি পলা কলধৌত-কণ্ঠমালা

কঙ্কণকিনিল স্বর্ণচুড়ি ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৯৮)

বিবাহ-অনুষ্ঠানে কন্যার অঙ্গে বাটা-হলুদ লাগানো হত। হলুদের পরের অনুষ্ঠান ছিল ক্ষীরখণ্ড খাওয়া। অন্ত্যজ শ্রেণির বলে যে 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর হবে এমন নয় :

ফুল্লরার গন্ধ-অধিবাস।

ছায়া মণ্ডপের মাঝে ঢেমচা দগড় বাজে

হীরাবতী হৃদয়ে উল্লাস ॥

পরিয়া হরিদ্রা-বাসে ফুল্লরা বাহিরে আইসে

দেখি সুখী সব বন্ধুজনে।

সুবেশা ফুল্লরা নারী সঙ্গে সখী জনা চারি

বসিলা পিতার সন্নিধানে ॥

ব্রাহ্মণ বসিয়া পীঠে বেদমন্ত্র পড়ি ঘটে

গনেশেরে কৈল আবাহন।

দিয়া পঞ্চ উপচারে পূজা কৈলে দিবাকরে

শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন ॥

মহী আর গন্ধ শিলা দূর্ব্বা ধান্য পুষ্পমালা

দধি ঘৃত স্বস্তিক সিন্দুর

শঙ্খ কজ্জল সোনা তাম্র রৌপ্য গোরোচনা

চামর দর্পণ কর্ণপুর ॥

দ্বিজ সূত্র বান্ধে করে বান্ধিল মুড়লা শিরে

আয়্য দেয় চারিভিতে ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ১৭৬-৭৭)

কোনো দেশকালবদ্ধ নর-নারীর মনন-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা শুধু ধর্ম-কর্ম শিল্পকলা জ্ঞান-বিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয়, জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তা ব্যক্ত হয়। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের এই সব বিচিত্র দিকের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এসব থেকে তৎকালীন বাংলার বা বাঙালির সমাজ ও জীবনের একটা ধারণাও লাভ করা সহজ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির শিশুদের শিক্ষার অধিকার পেতে দেখেন নি। শ্রীমন্তকে পিতার অনুপস্থিতিতে মাতা খুল্লনা কর্তৃক কুলপুরোহিতের কাছে 'হাতেখড়ি' দিতে দেখা যায়। উল্লেখ্য 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের বা শ্রেণির সমাজে দৃষ্টিগোচর হয়। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

শুনি বাক্য খুল্লনার দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার

হাতেখড়ি দিল শুভক্ষণে।

মধ্যযুগের সেই সমাজে বিদ্যালয়কে পাঠশালা বলা হয়। নারী সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুরাণজ্ঞান ও পণ্ডিতের কাছে শিক্ষার অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে। ফুল্লরা যে পণ্ডিতের কাছে পুরাণ শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং হিসাব ভাল জানতো খুল্লনা, লীলাবতী ব্রাহ্মণী, দুর্বলা দাসী এসবের প্রমাণ পাওয়া যায় *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সকল শ্রেণির মধ্যেই বাল্যবিবাহের প্রচলন থাকলেও অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যে ব্যাপক প্রচলন ছিল। অল্প বয়সে বিয়ে দিতে না পারলে ছেলে বা মেয়ের পিতাকে গঞ্জনা দিত সমাজ। অর্থের বিনিময়ে ঘটকেরা বিয়েতে মধ্যস্থতা করত। বরকে সে সময়ে প্রচুর পণ বা যৌতুক দিতে হত। যৌতুক ছাড়া উচ্চবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত কারও বিয়ে সম্ভব হত না।

পণের নির্ণয় কৈল দ্বাদশ কাহন।

ঘটকালী পাবে ওঝা তুমি চারিপণ ॥

পাঁচগণ্ডা গুয়া দিব গুড় পাঁচসের।

ইহা দিলে আর কিছু না করিবে ফের ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ১৭৫)

বঙ্গদেশের ভূমিপ্রাণ সভ্যতার ঐ পর্বে পুরুষের বহুবিবাহের একটি বড় কারণ ছিল। পুরুষেরা গৃহের বাহিরের কাজে ব্যস্ত থাকত। অন্যদিকে কৃষিকাজ ও গৃহকর্মের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করত নারীরা। 'কায়িক পরিশ্রমের গুরুদায়িত্ব বহন করত পুরুষরা, কিন্তু কঠোর কাজ ব্যতীত, কৃষি-সংক্রান্ত সমস্ত গৃহাঙ্গনের কাজ একান্নভুক্ত পরিবারের মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে সম্পাদন করতেন।'[২৭] বিত্তশালী একটি কৃষকের কৃষিকর্মে সাহায্যের জন্য অধিক সন্তান এবং একাধিক স্ত্রী, দুই-ই পুরুষের কাম্য ছিল।[২৮] আবদুস্ শুকুর মহাম্মদ বিরচিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' (আ. ১১শ– ১২শ. শতাব্দী) গ্রন্থে লক্ষ করা যায়, 'অদুনাকে বিয়ে করলে পদুনা পায় দানে।' অর্থাৎ দুই বোনকে রাজা একসাথে বিবাহ করে সুখে ঘর করছে।[২৯] এক বোনকে বিয়ে করলে আর এক বোন যৌতুক হিসেবে প্রভাবশালী, উচ্চবিত্ত এবং উচ্চশ্রেণির পুরুষরা ভোগ করত। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যেও একই সামাজিক চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। ভাঁড়ু দত্তের বর্ণ উঁচু শ্রেণির বিধায় সে সমাজে বহুবিবাহ করার অধিকার রাখে। আর সেই সমাজই এই প্রথার জন্ম দিয়েছে। তাইতো ভাঁড়ু দত্তের মুখে শোনা যায় :

দুই নারী মোর ধন্যা ঘোষ বসুর কন্যা

মৈত্রে কৈল কন্যা সমর্পণ ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৩৯)

Dhaka University Institutional Repository

বহুবিবাহ প্রথা মধ্যযুগের সমাজে শুধু যে প্রচলিতই ছিল তা নয় এটি সামন্তপ্রভুদের মন, মর্জির ওপরও নির্ভর করত। অর্থ ও পদমর্যাদা উঁচু বলেই যখন যা খুশী তাই তারা করত। আমরা ধনপতি সদাগরকে দেখি স্ত্রী লহনার প্রতি গভীর প্রেম প্রকাশের উপায় হিসেবে উপঢৌকন দিতে :

পরিতোষে লহনারে দিল পাট সাড়ি
পাঁচ পল সোনা দিল পরিবারে চুড়ি।
সাধু বলে প্রিয় তুমি আছ মোর মনে
পুর্বে আছিলে জেন বিবাহের দিনে।
(চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ১২০)

অন্যদিকে খুল্লনাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার যে প্রস্তুতি চলছে তা দেখে মনে হয়, সেই সমাজে বহুবিবাহে পুরুষরা অত্যন্ত সুখী হওয়ার উৎসাহ পায় কিন্তু একই সুখ-শান্তি কী সেই নারীরা উপলব্ধি করতে পারে ?

রম্ভা সুতা দিআ জোঁখে বরের অধর
তেনমত জোঁখে পুন দুই খানি কর।
সেই সুতা বাঁধ্যা রাখে খুল্লনার বসনে
সাধু রহিব জেন নিগূঢ় বন্ধনে।
(চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ১২৪)

আবার–

মাজুরি পাতিআ দিল বসিতে কিঙ্করী
সাধুর বামেতে বৈসে খুল্লনা সুন্দরী।
মাথায় মুকুট দিআ বসিল দম্পতি
কৌতুকে জৌতুক দেয় জতেক জুবতি।
(চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ১২৫)

কবিতাংশগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বহুবিবাহে নারী পুরুষ কারও কোনো অনিচ্ছা বা অনীহা ছিল না বরং ধনবান কোনো পুরুষকে বিবাহ করাটা সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল সেই সময়ের মেয়েদের।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'খ্রিস্টীয় দ্বাদশ বা তাহার কিছু পরে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ জাতির মধ্যে কয়েকটি ব্যক্তিকে গুণানুসারে উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত করা হয়, ইহাদের সাধারণ নাম হয় কুলীন।'[৩০] অথচ এই কৌলিন্য প্রথা শাস্ত্রসিদ্ধ কোনো বিধি নয়। বাঙালি হিন্দু সমাজে কৌলীন্য প্রথা প্রচলনের ফলে বর্ণহিন্দু পরিবারের রমণীকুলের ভাগ্যে চরম বিড়ম্বনা শুরু হয় কারণ শ্রেণিবিভক্ত হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্রের পরস্পরের মধ্যে এমনি বিয়ে হত না। কৌলীন্য প্রথা প্রচলনের ফলে সমবর্ণের মধ্যেও কৌলীন্য ভেদে বিয়ে বন্ধ হয়ে যায়, কুলীন কন্যার বিবাহ সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর

Dhaka University Institutional Repository

> ১৭৪২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাশিম বাজারের ২৮ বছর বয়স্কা স্ত্রী একটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে রেখে আত্মীয়স্বজনদের অনুরোধ উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সহমৃতা হন।[৩৫]

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই চিত্র দেখা যায় না। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে টমাস বাউরী বাংলায় ভ্রমণকালে সতীদাহের যে মর্মান্তিক চিত্র দেখতে পান তার বর্ণনা শুনে যেকোনো মানুষের চিত্ত শিহরিত হয়। তিনি বিবরণ দিয়েছেন :

> এতে (চিতাগ্নিতে) অগ্নি সংযোগের পূর্বে, এই সমস্ত দুর্বৃত্ত দুরাত্মাগণ রমণীকে তার মৃত স্বামীর দেহের উপর জোরপূর্বক শুইয়ে দেয়। সে উঠে আসার কসরত করে এবং ভস্মীভূত হতে নিদারুণভাবে অস্বীকার করে ; কিন্তু তারা শুইয়ে রাখা রমণীকে কঠোর হস্তে দাবিয়ে রাখে, যতক্ষণ না তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আগুন ধরে যায়। সে উঠতে অসমর্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে পোড়াতে থাকে। অতঃপর বেচারার জীবন্ত প্রাণটি অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়।[৩৬]

যে স্থানে বা যে জায়গায় সতী দাহ করা হত সেই স্থানটিকে বিশেষ মূল্যায়ন করা হত। কোথাও কোথাও এরূপ স্থানের উপর ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ক্রিফার্ড এ ধরনের একটি স্থানের বর্ণনা দিয়ে বলেন :

> সেখানে যে স্থানটির উপর চিতাগ্নি সাজানো হয়েছিল, তা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। উক্ত স্থানটি এখন পুষ্পায়িত লতাপাতার সজ্জায় একটি নিকুঞ্জে পরিণত হয়েছে। অভ্যন্তরে চারদিকে পুষ্প আচ্ছাদিত এবং এক প্রান্তে একটি মূর্তি রয়েছে।[৩৭]

সাহিত্য ও ইতিহাসে যে শ্রেণির স্থান সমাজের নিম্নস্তরে, অন্ত্যজ যাদের বলা হচ্ছে তারাও সামাজিক যে বিধান, তার বাহিরে যেতে পারেনি। অনেক সময় সে সমাজচ্যুত, অধিকারের প্রশ্নে সে অধিকারহীনা কিন্তু সমাজের বিধি অনুযায়ী তাদেরকেও আত্মাহুতি দিতে হয়। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমাজ তার উপর আরোপিত শর্ত মানাতে বদ্ধ পরিকর সেক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণ বা নিম্ন আয় মুখ্য নয়। সমাজ দেবী চণ্ডীর মুখে সেই সত্য তথ্যটুকু দিয়ে দিয়েছে যে, সাত সতীনের ঘরেও তৎকালীন মেয়েরা সংসার করত। যেমন :

> বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল
>
> সাত সতা গৃহে মোর বিষম জঞ্জাল ॥
>
> *(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৪১)*

নারীদের জন্য পর্দা বা আবরু প্রথাকে সমাজে আভিজাত্য ও সমাজিক শালীনতা বলে গণ্য করা হত।[৩৮] ঐতিহাসিকদের মতে, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্ভ্রান্ত সমাজে অল্পবিস্তর পর্দা-প্রথা বর্তমান ছিল।[৩৯] শাহ-সামন্ত অভিজাত এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ঘরে নারী–পর্দা ছিল। তবে শাসন-প্রশাসনে জড়িত বা নিয়োজিত নারীর পর্দানীতি শিথিল ছিল। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের ঘরে পর্দা কখনো প্রথারূপে চালু ছিল না।[৪০]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত ব্যাধ নারীদের প্রধান কাজ ছিল স্বামীর শিকার করা পশুপাখির মাংস ঘরে ঘরে বিক্রি করা। 'ফুল্লরা' রূপ বা আভিজাত্যের গুণে কালকেতুর স্ত্রী হবার গৌরব লাভ করেনি, তার অন্যতম গুণ ছিল বুদ্ধিমতী পশারিণী হওয়ার গুণ :

> কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পসরা।
>
> *(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ১৭৪)*

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে দেখা যায়, গৃহ-পরিচারিকা বা দাসীরা দায়িত্বপূর্ণ হিসাব-নিকাশের কাজেও কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছে। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে দুর্বলা দাসী এমনি একটি চরিত্র। হাটে গিয়ে বড় বড় খাসী বা বড় বড় মাছ থেকে শুরু করে পুঁইডগা, ফুলবড়ি, সবই কিনেছে নিজে। এ থেকে বোঝা যায় অন্ত্যজ নারীদের বাড়ির বাহিরে যাওয়ার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। যে যুগের অবরোধ প্রথা বিষয়ে খুল্লনার 'অজা-চারণা'র প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা সমীচীন হবে। কারণ লহনা গৃহের অভ্যন্তরে খুল্লনাকে শাস্তি না দিয়ে গৃহের বাহিরে যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, তাতে মনে হয় এমন ঘটনা মধ্যযুগের সমাজে অহরহ ঘটে থাকে।

এ দেশের নারীর চরিত্রে পতিভক্তির যে অন্ধ-আবেগ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিরা দেখেছিলেন তা অনেকাংশে অলৌকিক ও কৌতুকপ্রদ। অধিকাংশ বাঙালি পরিবারে পতি-পত্নীর সম্পর্ক ছিল অনেকটা প্রভু-ভৃত্যের মতো। স্বামী স্ত্রীকে পারিবারিক জীবনে কি দৃষ্টিতে দেখত, সমাজ সচেতন কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ফুল্লরার মুখনিঃসৃত বাণীতে তা ব্যক্ত করেছেন। ফুল্লরার মুখে শোনা যায় :

সন্তোষে বসায় খাটে, দোষ দেখি নাক কাটে

দণ্ডে রাজা বনিতার পতি।

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৪৮)

আবার এই ফুল্লরাকেই বলতে শুনি :

স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি

স্বামী বনিতার সে বিধাতা।

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৪৮)

এ থেকে বোঝা যায় নারীদের কাছে তাদের স্বামী পরমধন, স্বামী ছাড়া মোক্ষদাতা আর কেউ নেই কিন্তু কি আশ্চর্য বিষয় সামান্য পান থেকে চুন খসলেই এই স্বামী নামের পরমবস্তু হয়ে দাঁড়ায় বিষের মতো তরল, যা খুব সহজেই গলার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। সামান্য দোষই যে এদেশের পুরুষেরা স্ত্রীর নাক কাটতো আষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাসের নানা তথ্য থেকেও তা অবগত হওয়া যায়। ঐতিহাসিক বলেছেন :

> Throughout the East, women are wholly subject to the will of their masters and every husband is the avenger of his own wrongs. The man therefore, satisfied of her guilt, proceed to punishment by cutting off her nose.[৪১]

স্ত্রীর ওপর যথেচ্ছাচার করা এমনকি তার অঙ্গবিশেষ কর্তন করা যে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ এই বোধও অনেক পুরুষের ছিল না।[৪২] মঙ্গলকাব্যের সময়টাতে যেহেতু এদেশ মুসলমানরা শাসন করছে সেহেতু তাদের ওপরও কর্তব্য বর্তায় যে, নারীর প্রতি কঠোর না হয়ে বরং সহনশীলতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তবে এ কথা সত্য যে ,শুধুমাত্র মুসলিম আইনে নারীকে সম্মান জানানো হয়েছে। সতীদাহ প্রথাকে নিরুৎসাহিত করে মুসলিম শাসকেরা এদেশের এই মর্মান্তিক প্রথাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এক আইন প্রচলন করেন। এর ফলে কোন বিধবা স্বেচ্ছায় সহমরণে যেতে চাইলে তাকেও স্থানীয় ফৌজদারের অনুমতি নিতে হত।[৪৩] মধ্যযুগে কন্যার পিতামাতা আশৈশব-স্নেহে লালন করে সর্বপ্রকার গার্হস্থ্য রীতি-নীতি ও ধর্ম-শিক্ষা দিয়ে যখন জামাতার হাতে তুলে দেন মেয়েকে তখন তাদের একমাত্র উপদেশ থাকে

Dhaka University Institutional Repository

পতিসেবা। বহুবিবাহ প্রচলিত থাকায় অধিকাংশ ঘরে একাধিক উপপত্নী থাকতো। সপত্নীর আকর্ষণ থেকে ফিরিয়ে, স্বামীকে আপনপ্রিয় করবার জন্য তারা কত সাধ্য-সাধনাই না করতেন। সমাজে তখন ঝাড়-ফুক-তাবিজের প্রচলন ছিল খুব বেশি। এই প্রবণতা মেয়েদের মধ্যেই ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। বাঙালি পরিবারে স্ত্রীর পরাধীনতা এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর সর্বময় কর্তৃত্বের পরিচয় প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন :

> এদেশে স্ত্রীর ওপর স্বামীর সর্বময় ক্ষমতা। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়ম আছে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকেও অনুমৃতা হতে হয়। এ কারণে স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে অগ্নিদগ্ধ অথবা জীবিতাবস্থায় সমাধিস্থ করা হয়ে থাকে। কোনো বিধবা নারী সমাজের এই পৈশাচিক বিধানের বলী হতে অস্বীকৃতি জানালে সমাজে তার ভীষণ অপযশ হয় এবং এজন্য সারাজীবন তাকে তার আত্মীয়-স্বজনের গঞ্জনা সহ্য করতে হয়।[৪৪]

*কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*তে আমরা দেখতে পাই ফুল্লরার সুখ-আনন্দ, দুঃখ-বেদনার একটি বৃহৎ পরিসর। মধ্য-যুগের সেই সমাজে পুত্রবধূদের জীবনযাপন প্রণালী অনেকাংশে কষ্টসাধ্য ছিল। বিশেষ করে হিন্দু পরিবারের বধূদের জীবন ছিল দুঃখ কারুণ্যে ভরা।[৪৫] তারা প্রায়শই শাশুড়ী ননদী কর্তৃক নিগৃহীতা হত। আমরা কালকেতুর মুখেই শুনতে পাই এর সত্যতা :

শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৬৩)

অর্থাৎ শাশুড়ী, ননদ ও সতা এই তিন শ্রেণির নারী দ্বারা পুত্রবধূরা লাঞ্ছিত হয়। যার কারণে বধূরা এদের যমের মতো ভয় পায়। তারা একান্ত মনে গুরুসেবা, পতিসেবা এবং পরিবারের অপরাপর সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হয়। শাশুড়ী ননদীর যন্ত্রণায় অনেক সময় কুলবধূরা পেটপুরে দুমুঠো অন্ন পর্যন্ত ভোজন করতে পারত না। সতীনের জ্বালা-যন্ত্রণায় ঘর ছাড়তে হয়েছে অনেক বধূকে। আমরা ফুল্লরার কণ্ঠে শুনি :

সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
কোপে কৈলে বিষপান আপনি তেজিবে প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি ॥
কৌশল্যা রামের মাতা কৈকয়ী তাহার সতা
দুহাঁর কোন্দলে সর্বনাশ।
না গণিয়া হিতাহিত কৈল সেই অনুচিত
রামচন্দ্র গেলা বনবাস ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৪৯)

Dhaka University Institutional Repository
বিবেকের মতো ফুল্লরার উপদেশ, সতীন ঝগড়া করলে তাকে দ্বিগুণ বলবে কিন্তু ঘর ছাড়বে কেন? যেহেতু সবার অধিকার সমান সেহেতু এমন কথা বলাই যায় তবে এ কথা সত্য যে, মধ্যযুগের সেই সমাজের নারীরা অধিকার প্রশ্নে নিরুত্তর ছিল। সমাজ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে নি। অন্ত্যজ শ্রেণির নারীর মুখে এই বাণী শুনে মনে হয় অন্ত্যজ নারীর উত্থান ঘটেছিল ফুল্লরা চরিত্রের মধ্য দিয়েই। ফুল্লরাদের মতো অন্ত্যজ নারী সেদিন অধিকার নিয়ে সচেতনতার পরিচয় দেয়। উদাহরণস্বরূপ ফুল্লরা 'রামায়ণের' দশরথের স্ত্রীদের কথাও বলেছেন। সামাজিক ভাবে নারীরা ছিল অন্ত্যজ শ্রেণির। শাশুড়ী, ননদী কিংবা সতীনের জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে কোনো কুলবধূ একদিন অথবা এক রাতের জন্যও যদি অন্য বাড়িতে অতিবাহিত করত তবে তার ভাগ্যে জুটতো নিদারুণ সামাজিক লাঞ্ছনা। ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডীকে উপদেশ দিতে গিয়ে সমাজ-মানসে ঐ দিকটিকেই ইঙ্গিত করেছেন :

অধম অবলা জাতি যদি থাকে এক রাতি

পরের ভবনে কদাচিত।

ছল ধরে বন্ধুজন লোকে করে গঞ্জন

অবিচারে কৈলে অনুচিত ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৫০)

এমনকি কোনো স্ত্রী পতির অত্যাচারে পিত্রালয়ে ফিরে গেলেও তার ভাগ্যে জুটতো সান্ত্বনা কিংবা সমবেদনার পরিবর্তে অশেষ গঞ্জনা আর বিরূপ উপেক্ষা। মুসলিম পরিবারে ঠিক তার উল্টো চিত্র দেখা যেত যার প্রমাণ আমরা সমসাময়িক গ্রন্থগুলোতে পাই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও ঘটত।

ফুল্লরা-কালকেতু : অন্ত্যজ জীবনের প্রতিচ্ছবি

সর্বপ্রকার আভিজাত্য থেকে দূরে রেখে অপূর্ব মানবিকতার স্পর্শে ফুল্লরা-কালকেতু চরিত্র সৃষ্টি করে কবিকঙ্কণ- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সমগ্র বাংলাসাহিত্যে উচ্চ আসন দখল করেছেন। অন্ত্যজ সাধারণ শ্রেণির জীবন হতে উপকরণ সংগ্রহ করে যে সাহিত্যিক চরিত্র সৃষ্টি করা যায় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে অন্ত্যজশ্রেণির প্রতিনিধি ফুল্লরা-কালকেতুর মাধ্যমে মধ্যযুগের সেই সব উপাদান উপকরণ পাওয়া যায় যা সমাজ-ইতিহাসকারদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি শুধুমাত্র সেই শ্রেণিটির কথা চিন্তা করে যারা অর্থনৈতিকভাবে নিম্ন আয়ের এবং সামাজিকভাবে অগুরুত্বপূর্ণ। কালকেতু-ফুল্লরা যেন এই আলোচনাটিকে গতি দান করল।

'পুরুষ-প্রধান সমাজে নারী ছিল পরান্নজীবী ও অসহায়। সারাজীবন তার কোনো স্বাধীন সত্তা ছিল না। কন্যা রূপে পিতার, জায়া রূপে স্বামীর এবং মাতা রূপে পুত্রের অভিভাবকতায় কাটত তার জীবন।'[৪৬] বাঙালি রমণীদের এরূপ পরনির্ভরশীল জীবনযাত্রার অন্যতম কারণ ছিল পিতা ও পতির সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার এ কারণে 'তার বাপের বাড়ি ছিল, শ্বশুর বাড়ি ছিল কিন্তু নিজের বাড়ি ছিল না কখনো।'[৪৭] হিন্দুসমাজ নারীকে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হওয়া যুক্তি-যুক্ত মনে করত। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের ফুল্লরার বক্তব্যে এই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে। সাত-সতীনের জ্বালায় অতিষ্ট স্বামীর ঘর ত্যাগিনী 'পার্বতী' নাম্নী ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডীকে পতিপরায়ণ হওয়ার জন্য ফুল্লরা নির্দেশ দিয়েছেন :

স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি

স্বামী বনিতার সে বিধাতা।

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৪৮)

Dhaka University Institutional Repository
পতি-সর্বস্ব জীবনব্যবস্থার প্রতি এরূপ বিশ্বাস শুধু ফুল্লরার একার নয়, সেকালের অধিকাংশ নারীই বিশ্বাস করত:

তোরে আমি বলি ভাল স্বামীর বসতি চল
পরিণামে পাবে বড় সুখ।
শুনলো বিমূঢ়মতি যদি ছাড় নিজ পতি
কেমনে চাহিবে লোকমুখ ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৪৮)

গার্হস্থ্যধর্ম এবং বর্ণাশ্রমের শাসনে মধ্যযুগীয় নারীরা নির্জীব হয়ে থাকলেও কখনও কখনও তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে নানা ধরনের সামাজিক কর্মে নিয়োজিত হত।[৪৮] ফুল্লরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সামাজিক, পারিবারিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা সমগ্র মধ্যযুগের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনযাপন প্রণালীকে নির্দেশ করে। কালকেতুর গুজরাট নগর নির্মাণ অংশটি ছাড়া সম্পূর্ণ কাব্যে এ জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

খুল্লনার চরিত্রেও পাওয়া যায় শ্রমজীবী নারীর সুখ-দুঃখের কিছু অস্পষ্ট আভাস। বস্তুত, 'সুখে-দুঃখে, শ্রমে-দারিদ্র্যে ফুল্লরা–খুল্লনার জীবনযাত্রা এবং স্বভাবের যে চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন, তার মধ্যে মধ্যযুগীয় শ্রমজীবী বাঙালি নারীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।[৪৯] ফুল্লরা প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল। বাজারে বাজারে মাংস বিক্রি করাই তার পেশা। শুধু ফুল্লরা নয়, তার মা এবং শাশুড়ীও বাজারে পণ্য কেনা-বেচা করত। তৎকালীন নারীরা বাজারে কীভাবে পণ্য কেনা-বেচা করতো, *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় :

ক. হীরা নিদয়ার কাছে মাংসের পশরা বেচে
ফুল্লরা তাহার সন্নিধানে ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ১৭২)

খ. এই কন্যা রূপে গুণে নামেতে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পসরা ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ১৭৪)

গ. নিদয়া বইসে ঘাটে মাংস নিয়া গিয়া হাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা।
শাশুড়ী যেমন ভণে তেমন বেচেন কেনে
শিরে কাঁখে মাংসের পসরা ॥
মাংস বেচি নিয়া কড়ি কিনে চালু ডালি বড়ি
তৈল লোণ কেনয়ে বেসাতি।
শাক বেগুন কচু মুলা এট্যা থোড় কাচকলা
নানা বস্তু পুরি লয়ে পাথি ॥

Dhaka University Institutional Repository

ফুল্লরা আইলে ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসা করে
কহে রামা হাট-বিবরণ।
আজ্ঞা নিদয়ার ধরে ফুল্লরা রন্ধন করে
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন ॥
মৎস্য মাংস আদি করি পরশে ফুল্লরা নারী
সুখে ভুঞ্জে কিরাত-নন্দন।
যোগান ফুল্লরা বধূ ক্ষীর খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ১৮২)

মধ্যযুগের সমাজে পুত্র-কন্যার রাশি-নক্ষত্র অপেক্ষা ব্যক্তিগত কার্য-দক্ষতা ও চারিত্রিক গুণাবলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত, বিশেষ করে বাঙালি নারীদের। তার দেহসৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সঙ্গে রন্ধননৈপুণ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা সে-যুগের কবিরা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন।

কবিকঙ্কণের ফুল্লরা, কালকেতুর অভিভাবকের হৃদয় জয় করেছিল দু'টি কারণে ; রন্ধন-নিপুণতা এবং কেনা-বেচায় কুশলতা[৫০] এই দিয়ে। সেকালের নারী শুধু গৃহবধূ আর গৃহিণীই ছিল না, তারা পারিবারিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রে ছিল স্বামীর সহকর্মী। ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অনভিজাত প্রায় সকল পরিবারের মেয়েরাই পুরুষের সঙ্গে সাংসারিক কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ করত। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ কন্যা এমনকি নিম্নশ্রেণির মেয়েরাও সুতো কেটে অর্থোপার্জন করত। ডোমনী মেয়েরা খেয়া দিত, গরীব ঘরের চাষী মেয়েরা অর্থের জন্য ধান ভানত, গোয়ালিনী মেয়েরা দুধের পসরা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত।

মধ্যযুগের নারীদের সতীত্ব ছিল অলঙ্কারস্বরূপ। এই সতীত্ববোধ নারীকে গরীয়ান করেছিল বলেই পুরুষ-শাসিত সমাজেও তাদের শ্রদ্ধার আসন ছিল। ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন :

> পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের দেহের স্পর্শে স্ত্রীলোক এতদূর অপবিত্র হয় যে তাহাকে ত্যাগ করা ভিন্ন অন্য ব্যবস্থা অসম্ভব। স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় অজ্ঞাতসারে বা বলপূর্বক যদি কোনো পুরুষ তাহাকে ধর্ষণ এমনকি স্পর্শ করিত তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক পতিতা বলিয়া গণ্য হইত, সমাজে বা গৃহে তার স্থান থাকিত না। ...এই সমস্ত রমণীরাই অনেক সময় জীবিকার জন্য দাসী বা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত। তাহার পিতা-মাতা-স্বামীর ইচ্ছা থাকিলেও তাহাকে পুনর্বার গ্রহণ করিতে পারিত না।[৫১]

ফুল্লরার ন্যায় খুল্লনাও *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র। একটি মাত্র দাসীর সহায়তায় খুল্লনা একাকী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করেছিলেন। কর্মকুশলতা তার একটি বিশেষ গুণ। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের খুল্লনাকে আমরা সতী-সাধ্বী হিসেবেই দেখেছি অথচ নারী-সমাজে সতীত্ব চেতনা এত প্রবল থাকা সত্ত্বেও এদেশের পুরুষেরা নারীর সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের অন্ধকারে পতিত হয় নারী। প্রকৃত অর্থে এখানে সে অধিকারহীনা, অন্ত্যজ শ্রেণি। এই অবস্থায় শিকার হতে হয়েছিল ধনপতি সদাগরের পত্নী খুল্লনাকে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে খুল্লনা সতীন লহনার চক্রান্তে বনে বনে ছাগল চরাতে বাধ্য হয়েছিল। এটাই তার অপরাধ সমাজের কাছে। ধনপতি সদাগর বাণিজ্য থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপণের জন্য তার জ্ঞাতি কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করলে তারা খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর খুল্লনাকে একে একে 'জল-পরীক্ষা', 'সর্প-ঘট', 'ঘৃত-কাঞ্চন', 'জতু-গৃহ', অগ্নি-দহন প্রভৃতি পরীক্ষা দিয়ে নিজেকে সতী প্রমাণিত করতে হয়। সতীত্ব পরীক্ষার যে মহোৎসব *চণ্ডীমঙ্গলে* বর্ণিত হয়েছে তার কিছু অংশ–

Dhaka University Institutional Repository

১. দুই জনে ক্রমে উঠে বিপক্ষের বল টুটে
পরীক্ষায় খুল্লনার জয়
ফিরাইয়া পুনুপাতে দিল পথিকের মাথে
পুনুর্বার করিআ নিশ্চয়।
অলঙ্কার দত্ত কয় জলের পরীক্ষা নয়
পথিক সহিত ছিল সান
তেজিআ কপট নিধি পরীক্ষা করিব জদি
পরীক্ষা করুক রামা আন।
সাধুর আদেশে মাল আনে সর্প জেন কাল
দুই আঁখি করঞ্জা সমান
রাখিল নূতন ঘটে গর্জনে কলস ফাটে
সর্প চালে চন্দ মতিমান।
কনক-অঙ্গুরি তথি পেলে বান্যা ধনপতি
ধীরসভা করে হাহাকার
ভূতলে পাতিআ জানু প্রণাম করিআ ভানু
অঙ্গুরি তুলিল সাত বার
মিলি নীলাম্বর দাসে রাম দাঁ নিষ্ঠুর ভাষে
খুল্লনা গঞ্জিআ কয় কথা
করিআ কপট ধন্দ সাপে দিলে মুখবন্ধ
সর্প জেন হয় মহীলতা।
আজ্ঞা দিল বুহিতাল দ্বিজে দিল ঘৃতে জ্বাল
ঘৃত হইল অনল সমান
ভয় নাহি করে সতি আরোপি কাঞ্চন তথি
তুলিল সভার বিদ্যমান
কহিছে মাধব চন্দ নাঞ্চি নেয়াই নাহি দ্বন্দ্ব
বারিলে অনল হয় জল
তঙ্কা দেকু এক লাক ঘুচাব সকল পাক
পরীক্ষায় নাহি ফলাফল
আজ্ঞা দিল বুহিতাল কামার পাতিল শাল
সাবল তাইল হুতাশনে

Dhaka University Institutional Repository

জেন প্রভাতের ভানু হইল সাবল তেনু
সাধুর সন্দেহ বড় মনে।
দ্বিজে মন্ত্র লিখি পাতে দিল খুল্লনার হাতে
করে দিল অশ্বত্থের দল
সাঁড়াসিত্র ধর‍্যা আনে খুল্লনার বিদ্যমানে
জবাপুষ্প সমান সাবল।
খুল্লনা অনলে কয় শুন বহ্নি মহাশয়
থাক সর্বজীবের অন্তরে
জদি বা দুষ্কৃত পাপ উচিত করিবে দাপ
নহে শান্ত হবে মোর করে।
পাতে রামা দুই পাণি কামার সাবল আনি
আরোপিল তার পাণি পুটে
করি রামা প্রণিপাত লম্বিআ মণ্ডলী সাত
পেলাইল লৈয়া তৃণকুটে।
পুড়্যা গেল তৃণচয় ধনপতি তেজে ভয়
শঙ্খ দত্ত বলে কটু বাণী
বলিবারে কীবা ভয় সাবল-পরীক্ষা নয়
ভারিলে সাবল হয় পানি।
রোষজুত ধনপতি পুন দিল অনুমতি
তুলা পরীক্ষার বিধানে
খুল্লনা করিল তুলা হারিল বণিকগুলা
শ্রী কবিকঙ্কণ রস ভনে।

(চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ১৮৫-৮৬)

২. ধুস দত্ত বলে ভাই তোর দা এ আমি দাই
কহি হিত উপদেশবাণী
এসব পরীক্ষা বাঁঝি এত কেহ নহে রাজি
ধরিল সভার পদপাণি।
আন পরীক্ষা নাঞি মানি সভে করে কানাকানি
না ঘুচিল কুলের গঞ্জন

Dhaka University Institutional Repository

জৌঘর করিল সীতা সভে কহে সেই কথা
তথি সভাকার লয় মন।
তুমি আমি দুই ভাই অবশ্য করনা চাহি
কহিতে করহ পাছে রোষ
জৌঘর করুক বধূ যশ অকলঙ্ক বিধু
তবে সভে করিব নির্দোষ।
বলে বনমালী চন্দ নাঞি নেয়াই নাঞি দ্বন্দ্ব
উচিত কহিতে চাহি কথা
সীতা উদ্ধারিআ রাম তবে সে আনিল ধাম
জৌঘর করিল জবে সীতা।
হয়্যা অবনির রাজা করিল লোকের পূজা
আপনি হইআ ভগবান
জেই পথ কৈল হরি তাহা দড়াইআ ধরি
সেই পথ কেবা করে আন
ধুসার শুনিঞা কথা মনে সাধুভাবে ব্যেথা
যুক্তি কৈল খুল্লনা সহিত
খুজ্যা সাধু কারিগরে জৌগৃহ সজ্জ করে
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ গীত ॥

(চণ্ডীমঙ্গল, পৃ. ১৮৬)

মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের চাপে নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রায়ই ভুলুণ্ঠিত হয়েছে, অস্বীকৃত হয়েছে তার ব্যক্তিসত্তা। খুল্লনাকে যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় তার সৃষ্টি হয়েছে সমাজের প্রভুদের হাতে। এ যেন প্রজা-সাধারণের চাপে রাম কর্তৃক সীতার সতীত্ব পরীক্ষা।[৫২] উল্লেখ্য যে, কাব্যে বর্ণিত সতী-পরীক্ষার এ ধরনের কঠোর ব্যবস্থা হয়তো অন্ত্যজ সমাজে প্রচলিত ছিল না তবে এ সব ঘটনার বর্ণনা থেকে সতীত্বের প্রতি তৎকালীন সমাজ মানসের কিছুটা পরিচয় মেলে। মধ্যযুগে বাংলার নারীদের পক্ষে সতীত্ব রক্ষা করে সমাজে টিকে থাকা দুঃসাধ্য ছিল। এজন্য সমাজে অসতী নারীরও অভাব ছিল না। পতিতা নারীর প্রসঙ্গ *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের একাধিক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অন্ত্যজশ্রেণির সমাজে পতিতাবৃত্তির প্রচলন ছিল। কালকেতুর নব-প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরের এক প্রান্তে পতিতাদের জন্য আবাস পর্যন্তও ছিল। কবির ভাষায় :

লম্পট পুরুষ আশে বারবধূগণ বৈসে
একভিতে হইয়া অধিষ্ঠান।

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৬১)

Dhaka University Institutional Repository

এসব পতিতালয়ে সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের লোকেরা যাতায়াত করত। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তেমন কোন মূল্য দেওয়া হত না। এমনকি জীবনের সংকটকালে বিবাহ মুহূর্তেও নারীর সম্মতি নেওয়া হত না। পিতামাতার ইচ্ছায় তাদের গ্রহণ করতে হত, যেমনটি হয়েছিল ফুল্লরার ক্ষেত্রে। দরিদ্র ব্যাধ কালকেতুকে বিবাহ করে মানসিকভাবে সুখী হতে চেয়েছে ফুল্লরা। কবির ভাষায় ফুল্লরার দরিদ্রের সংসার :

ভালে করাঘাত হানি কান্দে ব্যাধ-নিতম্বিনী
নিশ্বাসে মলিন মুখ চান্দে।
দারুণ দৈবের গতি কপালে দরিদ্র পতি
ঠেকিনু সম্বল-চিন্তা-ফান্দে ॥
অন্নবস্ত্র নাহি ঘরে বিভা দিলা হেন বরে
কর্ণবেধ জাতি-ব্যবহারে।
হরিদ্রা চন্দন চুয়া কুমকুম কস্তুরী গুয়া
পায়্যাছিলাম বিবাহ-বাসরে ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২২৯)

অন্যদিকে কবিকঙ্কণ নারীকে শুধু দরিদ্র, অসহায় অবস্থায় রেখেছেন তা নয় তাদের মুখে প্রতিবাদের ভাষাও তুলে দিয়েছেন। ধনপতি সদাগর যখন দ্বিতীয় বিবাহে ইচ্ছা পোষণ করে তখন লহনা জোর প্রতিবাদের মাধ্যমে ধনপতিকে ধিক্কার জানায়। *চণ্ডীমঙ্গলে* দেখা যায় স্বামীর সঙ্গে অপরিচিত যুবতী নারীকে দেখে ফুল্লরা প্রচণ্ড ভাষায় ভর্ৎসনা করে কালকেতুকে। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

সতা সতী নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
আজি হইতে ফুল্লরারে বিমুখ বিধাতা।
... ...
কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলে মন।
যেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ ॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী ॥
(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৬৩-৬৪)

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ ছিল কপটচারী, ভণ্ড-মানসিকতার সমাজ। এ সময়ের সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সামাজিক বৈষম্যের সংঘাতে জর্জরিত চরিত্রগুলো মানব মহিমায় উজ্জ্বল। কালকেতু-ফুল্লরা চরিত্রের মধ্যে আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই। 'বারমাসী' বলতে আমরা এক বিশেষ ধরনের পদ্য-বন্ধ, রচনা, গান, বুঝে থাকি যেখানে পাত্র-পাত্রী তাদের আত্মীয়-পরিজন, মাতা-পুত্র, ভাই-বোন বা প্রিয়জনের বিচ্ছেদের কথা বৎসরের বারটি মাস অথবা ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যের সঙ্গে একাত্মসুরে ব্যক্ত করে। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের অগণিত কবি ও গায়েন, কথক বা লোকগীতিকা-রচয়িতা বারমাস অথবা ষড়ঋতুর বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবর্তন, প্রকৃতির লীলা-খেলা, চরম দুঃখ-বেদনা, হতাশা-গ্লানিকে উপজীব্য করে এই বিশেষ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।

'সংসদ বাংলা অভিধানে'[৫৩] বিরহিণী নায়িকার এক বৎসরব্যাপী সুখ-দুঃখের কাহিনি সম্বলিত কবিতাকে বারমাসী বলা হয়েছে। এর কারণ, 'নারী জীবনের আনন্দ, বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাই এর মূল সুর আবার, কোনো কোনো বারমাসী হচ্ছে নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবনের নর্ম, কর্ম ও ধর্মগীতি।'[৫৪] প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রতা যে অন্ত্যজশ্রেণির মানুষের সঙ্গী ছিল তা ফুল্লরা এবং খুল্লনার 'বারমাসী' বর্ণনায় পাওয়া যায়।

ফুল্লরার বার মাসের দুঃখ

বৈশাখ

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি পত্রের ছাওনী ॥
ভেরাণ্ডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥
অনল সমান পোড়ে বৈশাখের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা ॥

জ্যৈষ্ঠ

পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
খরতর পোড়ে অঙ্গ রবির কিরণ ॥
পসরা এড়িয়া জল খাত্যে যাত্যে নারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় আধা সারি ॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বেঙচের ফল খায়্যা করি উপবাস ॥

আষাঢ়

আষাঢ়ে পূরিল মহী নবমেঘে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটয়ে সম্বল ॥
মাংসের পসরা লয়্যা বুলি ঘরে ঘরে।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু খুদ-কুড়া মিলে উদর না পূরে।

কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।

কাহারে বলিব কি দুষিব বাপ মায় ॥

শ্রাবণ

শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।

সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি ॥

আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে পড়ে মাংস-জল।

কত মাছি খায় অঙ্গে করমের ফল ॥

অভাগ্য মনে গুণি অভাগ্য মনে গুণি।

কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী ॥

ভাদ্র

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।

নদনদী একাকার আটদিকে জল ॥

কিরাত পাড়াতে বসি না মেলে উধার।

হেন বন্ধু জন নাহি যেবা সহে ভার ॥

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।

লঘুবৃষ্টি কুড়াতে সদাই বহে বান ॥

আশ্বিন

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জনে জনে।

ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে ॥

উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।

অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা ॥

কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।

দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে ॥

কার্তিক

কার্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম।

করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥

নিয়োজিত কৈল বিধি সবার কাপড়।

অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥

Dhaka University Institutional Repository

মাস মধ্যে মাইশর আপনি ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান ॥

অগ্রহায়ণ

উদর ভরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তথি নিরমিল বিধি ॥
বড় দুঃখ মনে গুণি বড় দুঃখ মনে গুণি।
পুরাণ খোসলা গায় দিতে করে পানি ॥
কত নিবেদিব দুঃখ কত নিবেদিব দুঃখ।
বিপাক পাইল স্বামী বিধাতা বৈমুখ ॥

পৌষ

পৌষে সকল ভোগ সুখী সর্ব্বজন।
তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ ॥
তৈল তুলা তনুনপাৎ তাম্বুল তপন।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥
হরিণী বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা ॥

মাঘ

মাঘ মাসে আনিবার সদাই কুজ্ঝটি।
আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আক্ষটী ॥
ফুল্লরার কত আছে কর্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক ॥
শুন মোর বাণী রামা শুন মোন বাণী।
কোন সুখে মোর সাথে হইবে ব্যাধিনী ॥

ফাল্গুন

সহজে শীতল ঋতু ফাগুন যে মাসে।
পোড়য়ে রমণীগণ বসন্ত-বাতাসে ॥
মধুমাসে মলয়-মারুত বহে মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥

Dhaka University Institutional Repository

বনিতা-পুরুষ যত পীড়য়ে মদনে।

ফুল্লরার অঙ্গ পুড়ে উদর-দহনে।

চৈত্র

অনল সমান পোড়ে চইতের খরা।

চালুসেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা ॥

ফুল্লরার কত আছে করমের ফল।

মাটিয়া পাথরা বিনে অন্য নাহি স্থল ॥

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।

আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ.২৫৭-২৬২)

একইভাবে খুল্লনারও বারমাসের দুঃখকথা *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে*[৫৫] পাওয়া যায়। বারমাসীর বর্ণনায় কবি ফুল্লরার চরিত্রে এক অপূর্ব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন। ফুল্লরা এ কাব্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল একটি চরিত্র। নারীত্বের অপমান যেন না হয় সেজন্য ফুল্লরার দুঃখ ছিল একান্ত আপনার। স্বামীপ্রেম যেখানে সত্য, সেখানে সাংসারিক দুঃখ-বেদনা ব্যাধ রমণীর কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। ফুল্লরার মুখে বর্ণিত পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় ঘটনাগুলোর সঙ্গে অন্ত্যজ সমাজের নারীদের একটা সম্পর্ক ছিল। সংসারে নিত্য অভাব, স্বামী যেদিন শূন্য হাতে বন হতে ফিরে আসে সেদিন উপবাস থাকতে হয়। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

অপরূপ মায়ামৃগ দেখি মহাবীর।

গুণহীন কৈল ধনু সম্বরিলা তীর ॥

কংসনদীর জলে বীর কৈল স্নান।

তৃষাতে আকুল বীর করে জল পান ॥

পথে যাত্যে মহাবীর খায় বনফল।

মলিন বদনে চিন্তে ঘরের সম্বল ॥

দুঃখিনী ফুল্লরা মোর আছে প্রতি-আশে

কি বলিয়া দাণ্ডাইব যেয়্যা তার পাশে ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২২৪)

ভাঙা কুড়েঘর, তালপাতার ছাউনি, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খরা মাথার উপর দিয়ে যায়, এক টুকরো খুঞ্চার বসন মাথা আঁটিয়ে পরার অনুপযুক্ত, বর্ষার পানি মাথায় ধরতে হয়, এভাবেই ফুল্লরাদের শীত ও বসন্ত কাটে। দিনের পর দিন সবকিছু সহ্য হয়ে যায় কিন্তু ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে গৃহ আঙ্গিনায় দেখে ফুল্লরার মনে হয়েছিল এই দিনটি বুঝি তার জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃখের দিন। স্বামীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকা সত্ত্বেও সেদিন চোখ রাঙা হয়ে উঠেছিল ফুল্লরার। কারণ বাঙলার নারীরা দুঃখ সইতে জানে কিন্তু পতির অংশ কাউকে দিতে সে একেবারেই অবাধ্য, উন্মাদ। এ যেন চিরায়ত নারী সমাজের ঐতিহ্য, গৌরবগাথা।

Dhaka University Institutional Repository

অন্ত্যজ ব্যাধ রমণীর শাশুড়ী, ননদী কেউ-ই নেই তাহলে কে তাকে দুঃখ দিয়েছে? ফুল্লরা, দেবতার প্রতি তার ভক্তি নেই, আছে অবিশ্বাস, এ কারণেই দেবী চণ্ডীর দেয়া আকস্মিক অনুগ্রহকে সে উপেক্ষা করেছে। ফুল্লরা চরিত্রের এ বিশেষত্ব কবি মুকুন্দরামকে অনেক বেশি সমাজ-সচেতন করে তুলেছে। কালকেতু ও ফুল্লরা অন্ত্যজ ব্যাধ শ্রেণির মানুষ। এই শ্রেণির নর-নারীর জীবন ও মনের বিশিষ্টতার পরিচয় মিলেছে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায়।[৫৬]

অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম নাহি কোনো প্রথা,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাহি ঘর-পর,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করে সহিয়া আঘাত
অকাতরে ; পরিতাপ জর্জর পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়
বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগেউল্লাসি।

(বসুন্ধরা; সোনারতরী)

সভ্যতার অগ্রগতিতে আমাদের মানসিক জটিলতার সমাধান খুঁজে পাওয়া গেছে চিন্তা, বিচার-বিশ্লেষণ, দক্ষতা, মননশীলতা প্রভৃতি দিয়ে। সুদূর অতীতকে কল্পনা করাই সভ্যতার লক্ষণ। কিন্তু অন্ত্যজ-অসভ্য সমাজের মানুষের মধ্যে চিন্তা বা মননের বিকাশ না ঘটিয়ে তৈরি হয়েছিল বর্বরতা, লোভ, হিংসা, বিরংসা, শঠতা, ভণ্ডামি'র মতো কতগুলো অপকর্মের।

মুকুন্দরাম ভাঁড়ু দত্তের মধ্যে দেখেছেন কাম্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা না পাওয়ার একটি বিপর্যস্ত চিত্ত-কে। এখানে তাকে অন্ত্যজ-ও বলা যায়। যেহেতু সে উচ্চবর্ণের স্থানে স্থান পায়নি বা উচ্চবিত্তের কাছেও নয়। ভাঁড়ু নিজের বংশ, কৌলীন্য ও বুদ্ধি, প্রতিভার কথা উচ্চস্বরে বললেও কবি তাকে এতোটাই ছোট করেছেন যে, বানের জলে সাঁতার কেটে বাঁচার শক্তিও তার নেই। আসলে তার সম্বল ছিল তার দাম্ভিকতা। শুধু কাপট্যের মূল্যে, শাঠ্যের কৌশলে সে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব পেতে চেয়েছে। কালকেতুর সভায় তার আগমনের ছবিটি ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্রকাশ করেছে :

ভেট লয়্যা কাঁচকলা পশ্চাতে ভাড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ু দত্তের পয়ান।
ভালে ফোঁটা মহাদম্ভ ছেড়া ধূতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ ॥
প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে

Dhaka University Institutional Repository

সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।

ছেঁড়া কম্বলেতে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি

ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৩৮)

ভাঁড়ু দত্ত যা চেয়েছে তা পায়নি, সমাজে অভিজাত শ্রেণির মতো সেও উচ্চবিত্তের হতে চেয়েছে। এজন্যই অভিজাত শ্রেণিটির প্রতি তার ক্ষোভ, ক্রোধ। বুলান মণ্ডলকে প্রজামুখ্যের সম্মান দিলে সে ক্ষোভ ঢেকে রাখতে পারে না :

যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব

দরিদ্রের ধান্যে দিব নাগা।

খাইয়া তোমার ধন না পালায় প্রজাজন

শেষে যেন নাহি পাহ দাগা ॥

দেওয়ান ভেটের বেটা বহিত আমার চিঠা

যারে বল বুলান মণ্ডল।

থাকিতে সকল প্রজা আগুয়ান মোর পূজা

কহিলাম প্রকার সকল ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৪২)

ভাঁড়ু দরিদ্র, ক্ষমতাহীন অথচ তার তুল্য যোগ্য ব্যক্তি দুর্লভ, সে ভাগ্যতাড়িত এই ভাবনা, মনকে সমাজের প্রতি বিষিয়ে তুলেছে। কালকেতুকে তাই অকারণেই প্রজাশোষণের উপদেশ দিতে দেখা যায় ভাঁড়ু দত্তকে।

ভাঁড়ু হাটে গিয়ে পণ্যদ্রব্য লুটে নিয়ে আসে। সে স্বভাবতই শাঠ্যে উৎসাহী হয়ে পড়েছিল। অপরের ক্ষতিসাধনে এক ধরনের বিকারগ্রস্ত সুখ সে অনুভব করে। সে নগরের মণ্ডল না হয়েও বহু আকাঙ্ক্ষিত মণ্ডলত্বের ভূমিকায় অভিনয়ের ক্ষণিক আত্মসুখ সে পেতে চায়। কালকেতুর কাছে অপমানিত হয়ে সে কলিঙ্গরাজের আশ্রয় নিয়েছে। কালকেতুর প্রতি তার ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ ছিল পূর্বপোষিত। দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু আজ নগরপতি, আর কায়স্থকুলতিলক, বুদ্ধিতে ভাস্কর ভাঁড়ু অর্থহীন, সহায়-সম্বলহীন ভিক্ষুক। এই জ্বালা সে হঠাৎ প্রকাশ না করে পারেনি। উত্তেজনার মুহূর্তে সে বলে উঠেছে :

তিন গোটা শর ছিল এক গোটা বাঁশ।

হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস ॥

দৈব যোগে আমি যদি ছিলাম কাঙ্গাল।

দেখিয়াছি খুড়া গো তোমার ঠাকুরাল।

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৩৬৬-৬৭)

এই চরিত্রটি সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে অপমানিত ভাঁড়ু দত্ত ভিলেনে পরিণত হল। নিঃসন্দেহে কালকেতু আখ্যানে ভাঁড়ু দত্তই মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এর মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববোধের পরিচয় আছে।[৫৭]

মুরারি শীল, কালকেতু-আখ্যানের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী উপস্থিতি থাকলেও চরিত্র সৃষ্টির কৌশলের কারণে পাঠকের কাছে তার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান তৈরি হয়েছে। মুরারি শীলের চরিত্রের কৌশলে আমরা অতি সাধারণ স্তরের একটি কপট বণিকবৃত্তি লক্ষ করি কিন্তু তাকে অসাধারণ করে তুলেছেন কবি তিনটি উপায়ে।[৫৮] স্ত্রী সাহচর্য, বাক-বিন্যাসের পটুত্ব, কৌতুকরসের সহযোগ। মুরারি শঠ ব্যবসায়ীর চরিত্র। তার উদ্দেশ্য কালকেতুকে প্রতারিত করা। প্রতারণার যে জাল মুরারি প্রস্তুত করেছে তাতে কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়েছে। তার শঠবুদ্ধি, আচরণ এবং বাকচাতুর্য সব মিলে আশ্চর্য সংহতি, অথচ সবকিছু জড়িয়ে একটা মৃদু হাস্যরসের আভাস পাওয়া যায়। পাওনাদারকে ফেরানোর কৌশল মুরারি-পত্নীর অজানা নয় এটি তার ভালোই রপ্ত করা ছিল। কবি মুরারি-পত্নীর যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তা আসলে মধ্যযুগের সমাজে প্রায়শ দেখা যায়। স্ত্রীদের এমন উৎসাহে শঠতা বাড়বে বৈ কমবে না এমনটাই স্বাভাবিক। উদাহরণ লক্ষণীয় :

বীরের শুনিয়া বাণী আসি বলে ব্যাণানী

ঘরেতে নাহিক পোত্দার।

প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক-পাড়া।

কালি দিব মাংসের উধার ॥

আজি কালকেতু যাহ ঘর।

কাষ্ঠ আন্য একভার একত্র শুধিব ধার

মিঠা কিছু আনিহ বদর ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৯২)

শত্রুর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করে তাকে আঘাতে বিপর্যস্ত করার এই রণকৌশল বড় বড় বাহিনিগুলোতে আছে। আবার প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণ করতেও সে পটু। কালকেতুর কাছে সোনার আংটি আছে শুনে বেনে গিন্নীর মুখের আকৃতি কেমন বদলে গিয়েছিল।

মধ্যযুগের অন্ত্যজ সমাজ এই শ্রেণিটিকে প্রতিপালন করেছে। কালকেতু আংটি বিক্রি করতে এসেছে দেখেও তারা কোন প্রকার ব্যাকুলতা দেখাল না। এমনকি পূর্বের ধারের কথাও তুলল না। বরং কালকেতুর কুশলসংবাদের জন্য আন্তরিক কাতরতা প্রকাশ করল। কালকেতুর মতো সহজবুদ্ধির মানুষ এই জালে অনায়াসেই ধরা পড়ল। বিক্রেতার মনটিকে প্রথমে তেলের মতো কিছু একটা মালিশ করে নরম তুলতুলে করে তৈরি করল এবার অপ্রত্যাশিত ভাবে আসল জায়গায় কঠিন আঘাত করে বসল :

সোণা-রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।

ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল।

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ২৯৪)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সকল চরিত্র বিকশিত হয়েছে কালকেতু-ফুল্লরা চরিত্রের চারপাশকে ঘিরেই। কালকেতুর প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে সবাই যখন সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে ঠিক তখনই ঘটল বিপত্তি। ভাঁড়ু দত্তের ছলচাতুরীর কারণে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে ভৎর্সনা করে :

Dhaka University Institutional Repository

ছুত্যে না যুয়ায় বেটা অতি নীচ জাতি।
সভামাঝে বসিয়া কথার দেখ ভাতি ॥
কোন সাধুজনে বধি নিলি বেটা ধন।
মোরে না কহিয়া বেটা কাটাইলি বন ॥
গুজরাটে রাজা হইতে কর অভিলাষ।
কত শত সেনাপতি করিলি বিনাশ ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৪১৩)

উত্তরে কালকেতু বলে :

কোন সাধুজনে রায় নাহি করি বধ।
ধন দিয়া চণ্ডী মোর বাড়াল্য সম্পদ ॥
নিজ ধন দিয়া চণ্ডী কাটাইল বন।
তাঁর ধন দিয়া তথি বসাইল জন।
মোর বোলে অবধান কর নৃপমণি।
দোষ-গুণের ভাগী হন নগেন্দ্রনন্দিনী ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৪১৩-১৪)

কলিঙ্গরাজ এ কথা বিশ্বাস করেন না কারণ, তিনি মনে করেন কী এমন কারণ আছে যার জন্য দেবীচণ্ডী 'অন্ত্যজ' শ্রেণির ব্যাধ কালকেতুকে ধন দেবেন? কলিঙ্গরাজের আদেশ :

নীচ জাতি ব্যাধেরে চণ্ডিকা দিলা ধন।
এমন কথাতে পাতিয়ায় কোন্ জন ॥
অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজতলে।
এমন বচন যেন কেহ নাহি বলে ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৪১৪)

নৃপতির আদেশ অনুসারে কালকেতুকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সামান্য দোষ-ত্রুটি অথবা কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও সেই সমাজে ছিল। কারাগারের বর্ণনা :

দিবসে দুপুরে তাহে ঘোর অন্ধকার
প্রবেশ করায় নিয়া আন্ধারিয়া কোণে।
শত শত বন্দী তথা আছে স্থানে স্থানে
কিচি কিচি করে ছুঁচা মূষিকী মৃত্তিকা।

Dhaka University Institutional Repository

বহু কীট পোকা আছে উড়ুষ মক্ষিকা ॥
বন্দী দেখি কালকেতু বলে ভাই ভাই।
উসারিয়া দেহ মোরে একটুকু ঠাঞি ॥
হাড়ি দিয়া মহাবীরে কৈল উভমুণ্ডা।
চারিদিকে পোতামাঝি দেয় তুষের ধুঁয়া ॥
জটে দড়ি দিয়া চালে টাঙ্গে মহাবীরে।
হাতে বাঘ-হাতা দিল গলায় জিঞ্জিরে ॥
বুকে তুলি দিল পাঁচ সাঙ্গের পাথর
পাথর চাপনে বীর করে থর থর ॥
মনে ভাবে মহাবীর বড় পরমাদ।
ফুল্লরা স্মরিয়া বীর জুড়িল বিষাদ ॥

(কবিকঙ্কণচণ্ডী, পৃ. ৪১৫-১৬)

স্বীকৃতি লাভের প্রত্যাশী দেবী চণ্ডীর লক্ষ্য ছিল বর্ণের প্রভাব খর্ব করা এবং অনার্যের ধর্ম ও প্রাণধর্মী জীবনাদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। দেবী কালকেতুর মাধ্যমে এক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছেন।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হঠাৎ তুর্কী আক্রমণে সমাজ ও ধর্মজীবনে একটা প্রভাব পড়ে। একে রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম[৫৯] বলে আখ্যায়িত করেছেন বিশিষ্টজনেরা। পরিণাম যাই হোক *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের* যে মানুষগুলোর জীবনযাপন প্রণালী বর্ণনা করা হয়েছে তারা রক্ত মাংসের সমন্বয়ে জীবন্ত মানুষ। অল্প কথায় বা কাজে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষরূপে তারা কাহিনির পশ্চাৎভূমি থেকে উঠে এসেছে সামনে। ডামুন্যার পলায়মান মানুষেরা, কালকেতুর প্রতিবেশী ব্যাধসমাজ, গুজরাটের নব-অধিবাসী নানা সম্প্রদায়ের ও জীবিকার মানুষ, বনমধ্যে সাধারণ পশুরা (যারা প্রকৃত অর্থে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরই প্রতিরূপ) সকলেই কোনো না কোনো ভাবে অন্ত্যজ। একদিকে সমাজে তারা নিম্নশ্রেণির, অধীনস্থ; অপরদিকে নিম্ন আয়ের, অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এই মানুষগুলোর মানব-মহিমাকে বড় করে দেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ঃ

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *কবিকঙ্কণচণ্ডী* (প্রথম ভাগ), (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন সংস্করণ ,পূর্ণমুদ্রিত, ১৯৯৭), পৃ. ২৯

২. Mohammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal* (Karachi : Pakistan Publishing House, Vol. II, 1967) P. 218

৩. গীতা মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা* (কলকাতা : কে. পি. বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮১) পৃ. ১

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৫. শিপ্রা সরকার, *সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য* (ঢাকা : আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, প্রথম আজকাল প্রকাশ ,২০০৭), পৃ. ৮৫

৬. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (অনুবাদক) কর্তৃক মূল আরবী থেকে অনূদিত, *আল-বেরুণীর ভারততত্ত্ব* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী পুনর্মুদ্রণ, জুন , ২০০৪) পৃ. ৫৪

৭. ভীষ্মদেব চৌধুরী , "কবির প্রত্যাশা ও কালকেতুর নগর নির্মাণ", *বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা ও অন্যান্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১) পৃ. ১৯০

৮. Abdul Karim "Research into the Social Heritage of the Muslims in Bengal", in Pierre Bessaignet (ed.), *Social Research in East Pakistan* (Dhaka : Asiatic Society of Pakistan ,1964), pp. 18-19

৯. অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮) পৃ. ১০৯

১০. অজয় রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

১১. Muhammad Abdur Rahim, op. cit., note 1, p. 359

১২. মিনু মাসানী, *বিবর্তনের পথে মানব-পরিবার* (অনুবাদক : নিযামউদ্দীন আহমদ), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ. ২০-২১

১৩. শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

১৪. অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, ৪র্থ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০০৫), পৃ. ৫১

১৫. ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য,*জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম*(কলকাতা : কলকাতা হাউস অব বুকস, ১৯৬৫), পৃ.৪

১৬. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)* (কলকাতা : লেখক সমবায় সমিতি), পৃ. ২৭৪

১৭. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* (প্রথম খণ্ড),(কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ৫ম

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রণ,১৪১৫), পৃ. ৩৯

১৮. সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদিত), *কবিকঙ্কণচণ্ডী* (কালকেতু পালা), (কলকাতা : রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯), পৃ. ৩৯

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

২০. Denys Hay, Annalists and Historians, Western Historiography from the Eight to the Eighteenth Centuries, London, 1977, p. 1

২১. গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী, *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০৫/ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯), পৃ. ২

২২. অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৫/ ডিসেম্বও ১৯৮৮), পৃ. ১১৮

২৩. আল-বেরুণী 'কিতাবুল হিন্দ', আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ অনূদিত, *আল বেরুণীর ভারততত্ত্ব* (ঢাকা : ১৯৮২) পৃ. ৬৭-৬৮

২৪. ক্ষেত্র গুপ্ত, *কবি মুকুন্দরাম* (কলকাতা : গ্রন্থনিলয়, ১৯৬৪) পৃ. ৭

২৫. ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, *জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম* পূর্বোক্ত, পাদটীকা ৮, পৃ. ৪

২৬. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)* (কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ,ফাল্গুন, ১৪১৬), পৃ. ৪৪৬

২৭. M. Winternity , *A History of Indian Literature* Vol. V-3. p. 30

২৮. রাজিয়া সুলতানা, *সাহিত্য বীক্ষণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫/জুন ১৯৯৮), পৃ. ১৯

২৯. আবদুস্ শুকুর মহামদ বিরচিত *গোপীচাঁদের সন্ন্যাস* নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত, (ঢাকা : ১৩৩২)পৃ. ৪

৩০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বিদ্যাসাগর, বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি* (কলকাতা : ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৭

৩১. দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল, *বাংলার সামাজিক ইতিহাস* (কলকাতা : ১৩১৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৫

৩২. বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* (কলকাতা : ১৯৫৭), পৃ. ৪৩৯

৩৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

৩৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

৩৫. J. Z. Holwell, *Interesting Historical events relative to the Province of Bengal and the Empire of Indostan* Part II. pp. 92-97

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫

৩৭. K. K. Datta : *Studies in the History of the Bengal Subah* (Calcutta : 1936) p. 250

৩৮. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* ২য় খণ্ড ,(করাচি : ১৯৬৭), পৃ. ২৫৮

৩৯. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬

৪০. আহমদ শরীফ , *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* (ঢাকা : ১৯৭৭), পৃ. ৪০

৪১. K. K. Datta : *Studies in the Hostory of Bengal* Ibid, p. 31

৪২. K. K. Datta, Ibid, p. 31

৪৩. J. Z. Holwell, Ibid, p. 99

৪৪. J. S. Stavorinus : *Voyages to the East Indies* (Tr. by Samuel Hull Wilcocke from Dutch), Vol. 1. 1. London, 1978, p. 441

৪৫. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ* (ঢাকা : বাংলা কাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ , মাঘ ১৪০২/জানুয়ারি ১৯৯৬), পৃ. ১১৭

৪৬. দোনাগাজী , *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল* আহমদ শরীফ সম্পাদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫), ভূমিকা, পৃ. ৬৫

৪৭. ঐ, ভূমিকা, পৃ. ৬৫

৪৮. মাহমুদা খাতুন, "*মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ*", *সুন্দরম* (সম্পাদক : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম) ষষ্ঠ বর্ষ , ৪র্থ সংখ্যা (ঢাকা : ১৯৯২), পৃ. ৩১

৪৯. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯১), পৃ. ২৯

৫০. রাজিয়া সুলতানা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৫১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

৫২. শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

৫৩. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সঙ্কলিত), *সংসদ বাংলা অভিধান* শশীভূষণ দাশগুপ্ত ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংশোধিত, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৪৯২

৫৪. রাজিয়া সুলতানা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৫৫. সুকুমার সেন (সম্পাদনা) কবিকঙ্কণ-বিরচিত *চণ্ডীমঙ্গল* (নতুন দিল্লি : সাহিত্য একাডেমি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০১), পৃ. ১৪২

৫৬. ক্ষেত্র গুপ্ত, *কবি মুকুন্দরাম* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯১), পৃ. ৮৭

৫৭. ক্ষেত্র গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. ক্ষেত্র গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৫৯. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় :

অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ

সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন

স্বপ্নের রঙে রাঙানো অপূর্ব সুন্দর বাংলার আকাশে যুগসন্ধ্যার অন্ধকার ঘনায়মান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও যে বাংলা কৃষি ও বাণিজ্যলব্ধ অর্থে ঐশ্বর্যময়ী ছিল, সে ঐশ্বর্য কোথায় যেন হারিয়ে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার অন্তর্জীবনে যেমন তার নিয়ত পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত, তেমনি বহির্জীবনেও সেই ভাঙাগড়ার খেলা চলছে অবিরত। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব রবি সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭ খ্রি.) সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সূর্য অস্তমিত হয়েছে। তার সাথে সুবা বাংলার ভাগ্যেও ঘটতে থাকে একের পর এক দুর্ঘটনা। অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা, বণিক সভ্যতার অভ্যুদয়, বর্হিশক্তির প্রাদুর্ভাব বাংলার শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দিল্লীর মুঘল শক্তির অস্তায়মান অবস্থায় বাংলার নবাবী শক্তির অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছে মুর্শিদকুলী খাঁর (১৭০০-১৭২৭ খ্রি.) সময় থেকে কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পরেই অপদার্থ নবাবদের অতিরিক্ত বিলাসিতায় ও শাসন-শৃঙ্খলা বিধানে নিদারুণ অবহেলার কারণে রাজ্যলিপ্সুদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্রে সাংঘাতিক বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল রাজ্যশাসন। সে সময়ে অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন আলীবর্দী খাঁ বিরোধীদের পরাস্ত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন এবং রাজ্যশাসনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আলীবর্দী খাঁর শাসনামলের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল বাংলায় বর্গী বা মারাঠা আক্রমণ (১৭৪২-১৭৫১ খ্রি.)। মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলায় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগ নেমে আসে তার কোনো সুরাহা করতে পারেনি নবাব আলীবর্দী খাঁ। বিশেষ করে বর্গীর আক্রমণ একদিকে যেমন, বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমিকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছিল ঠিক তেমনি ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হবার পথকেও প্রশস্ত করে দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ কলকাতা নগরীর কথা বলা যায়, ফোর্ট উইলিয়াম, ইংরেজ নৌবহর ও কামানশ্রেণি দ্বারা সুরক্ষিত কলকাতা শহরকে বর্গীরা কখনোই আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কলকাতাই তখন একমাত্র নিরাপদ এলাকা। এদেশের ধনী ব্যবসায়ীরা তখন দলে দলে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিতে থাকে। তাদের মনে ক্রমে এই বিশ্বাস জন্মলাভ করতে থাকে যে, অভ্যন্তরীণ অরাজকতার হাত থেকে ইংরেজরাই তাদের বাঁচাতে সক্ষম। এই সময়েই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং বাংলার ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আঁতাত গড়ে উঠতে শুরু করে। পরবর্তীকালে এই আঁতাতই ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।

বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০ খ্রি.)। বাংলার এমনি এক বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের উপাদান সংগ্রহ করে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম *অন্নদামঙ্গল* (রচনাকাল ১৭৫২-১৭৫৩ খ্রি.) রচনা করেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। কবি ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের 'গ্রন্থসূচনা' অংশে লিখেছেন, বর্গীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে যায় ফলে নবাব আলীবর্দী খাঁ বিভিন্ন জনের কাছ থেকে নজরানা আদায় করতে থাকেন। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে নবাব বারো লক্ষ টাকা নজরানা চান। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাতে স্বীকৃত হয়েও দিতে অপারগ হলে নবাব আলীবর্দী খাঁ (মহাবদজঙ্গ) তাঁকে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করে রাখলেন :

মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ॥

Dhaka University Institutional Repository

বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন ॥
বন্ধ করি রাখিলেক মুরশিদাবাদে।
(অন্নদামঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭-১৮)

বিপদাপন্ন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কারাগৃহেই দেবী অন্নদাকে চৌত্রিশ অক্ষরে বন্দনা করলে তিনি দেবী অন্নদা বা অন্নপূর্ণার কৃপায় মুক্ত হন। অতঃপর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেবীর স্বপ্নাদেশ অনুসারে আড়ম্বরের সঙ্গে অন্নপূর্ণা পূজা করেন, আর সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরকে দেবীর দেবী অন্নপূর্ণা বা অন্নদার মাহাত্ম্যমূলক কাব্য রচনা করতে আদেশ দেন। *অন্নদামঙ্গল* কাব্য রচনার কারণ এটাই–

সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায় ॥
সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর।
অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতর ॥
(অন্নদামঙ্গল, পৃ. ১৮)

কবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বাংলার সমাজ-জীবনের দুই বিপরীত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। একদিকে নীতিহীন বিলাসের স্রোতে ভাসমান অভিজাত বিত্তশালী সম্প্রদায়, অপরদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন শোষিত ও পর্যুদস্ত নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষ। সমাজের অন্তঃসারহীন বিলাসের উচ্ছলতা এবং বঞ্চিত জীবনের হাহাকার, এই দুইয়ের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত রয়েছে যে অসীম শূন্যতা কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যের উপাদান হয়েছে এসব কিছুই। এ সময়ের রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডল এবং আর্থিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মুর্শিদাবাদের শাসনযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচার অপেক্ষা ভূস্বামী, সামন্ত-প্রভুদের শোষণ ও অত্যাচার কোনো অংশে কম ছিল না। তাদের নিজেদের মধ্যেও বিবিধ স্বার্থের বিরোধ, বিভিন্ন ব্যক্তিগত আক্রোশ, ও শত্রুতা প্রভৃতির কারণে বিচিত্র চক্রান্ত লেগেই ছিল। আর প্রজার রক্ত শোষণ করে ; ছলে, বলে, কলে-কৌশলে, নিপীড়নে রাজস্ব ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের কর আদায় করে নিজেদের প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা-চারিত্র্য তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ ছিল। হিন্দু ভূস্বামী-সম্প্রদায়ের মধ্যে সে সময় 'নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং ঢাকার রাজা রাজবল্লভ নেতৃস্থানীয়, ইহারাই সমাজের প্রতিনিধি।[১] শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে উৎসাহ প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতা তারা দান করেছিলেন বটে কিন্তু সেই পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে নিম্নশ্রেণির মানুষের সাংসারিক বা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনের ; বৃহত্তর মানবতার বা উচ্চতর কোনো আদর্শের প্রেরণা ছিল না। এর মূলে ছিল, চিরাচরিত উপায়ে কীভাবে রাজসভা অলংকৃত করা যায় ; নিজেদের ঐশ্বর্যবিলাস ও রাজকীয় আভিজাত্যের দর্পিত ঘোষণা কীভাবে দেওয়া সম্ভব ইত্যাদি। তাছাড়া সমকালীন রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে এরা সকলেই এতো বেশি জড়িত ছিলেন, নিজেদের স্বার্থ-অন্বেষণে এতো নিয়োজিত ছিলেন যে, বাংলার এই চরম দুর্গতির দিনেও জনসাধারণের কথা চিন্তা করার অবসর বা ইচ্ছা তাদের ছিল না। যে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে তারা গর্ব অনুভব করতেন সে সকল সাহিত্য তাদেরই সৃষ্টি অর্থাৎ তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এসব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। তাদের রুচিবোধ, আদর্শ ও ধর্মকেন্দ্রিক ছিল এসব সাহিত্য। বলাই বাহুল্য, সেই আদর্শবোধ একান্তভাবে ক্ষীয়মান সামন্ততন্ত্রের বিলাসব্যসনে লিপ্ত।

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে অরাজকতার কারণে বিত্তশালী তথা উচ্চবিত্তের সমাজের লোকেরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে বসবাস করতেন। যেহেতু মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, কলিকাতা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নগরগুলো ছিল

Dhaka University Institutional Repository

নবাব ও সামন্ত-ভূস্বামীগণের শাসনকেন্দ্র সেহেতু রাজসরকারের চাকুরীর প্রয়োজনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনে ভদ্র, সমৃদ্ধ, উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের বসবাস ছিল এসব নগরে। রাজস্বের বেশির ভাগ অংশই ব্যয়িত হত এসব নগরে। প্রায় পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসনের ফলে এবং সমৃদ্ধ অভিজাত বণিক সম্প্রদায় নবাবী অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী থাকার কারণে, হিন্দু সামন্ত এবং সমৃদ্ধ ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সভা ও বৈঠকগুলোও মুসলমানী সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, এমন হওয়াটাও স্বাভাবিক। আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা নগরে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় শ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পীরাও নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে ধনী ও অভিজাত নাগরিকদের বিলাস-ব্যসনের উপাদান যোগাতেন।

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার সমাজকাঠামোকে এক শ্রেণির গবেষক চারস্তর বিশিষ্ট পিরামিডাকৃতি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[২]

এ রকম সামাজিক কাঠামোর একেবারে শীর্ষদেশে নবাব, একেবারে নিচুতলায় সাধারণ মানুষ– মাঝে বাংলার প্রভাবশালী অভিজাততন্ত্র। এরা হলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ, মন্ত্রী ও পরিষদবর্গ এবং বাংলার প্রভাবশালী জমিদার গোষ্ঠী। অভিজাত-তন্ত্রের নিচে গ্রামীণ সম্পন্ন-ভূস্বামী, বণিক, মহাজন, ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী, বেনিয়ান, সরকার, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি শ্রেণির কর্মচারী। সর্বশেষ স্তরে রয়েছে বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী যারা শুধুই সাধারণ মানুষ। এরা কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, কারিগর, হস্তশিল্পী, সাধারণ সৈনিক এবং অন্যান্য সকল শ্রেণির কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ। আবার কোনো কোনো গবেষক সমকালীন বাংলার সমাজকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, অভিজাতরা প্রথম, গ্রামীণ সম্পন্ন-ভূস্বামীরা দ্বিতীয় এবং আপামর জনসাধারণ তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।[৩]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিশেষকরে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে একটি প্রচলিত অভিযোগ যে, 'এখানে সাধারণ মানুষের স্থান নেই।'[৪] সমালোচক উমা সেন, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ* গ্রন্থে এই মত পুরোপুরি অস্বীকার করে মন্তব্য করেছেন :

> দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে পরিচয় পাই, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় সাধারণ মানুষের একটি বিশাল ধারা তার মধ্যে প্রবাহিত।[৫]

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলোকে তিনি 'জনসাহিত্য' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মঙ্গলকাব্য পাঠ, শ্রবণ ও বিশ্লেষণ করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দেবতার মাহাত্ম্য নিয়ে কবি মানুষের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন আর এই মানুষগুলো হল সমাজের নিচু তলায় যাদের বসবাস, রক্তে-মাংসে যাদের বলিষ্ঠ শরীর। তিনি আরও বলেন :

> এই সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবন অতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। মনে হয় এই কাব্য রচয়িতা, পাত্র-পাত্রী এবং পাঠক বা শ্রোতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরের অধিবাসী।[৬]

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান* সম্পাদনা করতে গিয়ে ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন :

> মধ্যযুগে চারশো বছরেরও অধিককালব্যাপী বহু কবি বিভিন্ন ধরনের মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলই প্রধান। এসব মঙ্গলকাব্য মূলত: দেবনির্ভর ও সগোত্রীয় দেবতাদের পূজার প্রচলনকল্পে লিখিত হলেও এ কাব্যগুলোর মধ্যে তদানীন্তন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রীয় জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় বৈষ্ণব চরিতশাখা বাদে অন্য কোনো কাব্য-সাহিত্য শাখায় তার কণামাত্রও পাওয়া যায় না।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা স্বীকৃত যে, মঙ্গলকাব্যের কবিরা যে সমাজ জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন সে সমাজে উচ্চশ্রেণি, মধ্যবিত্তশ্রেণি ছিল কিন্তু উচ্চ-মধ্য উভয়কে ছাপিয়ে যাদের জীবনগাথা রচিত হয়েছে কবির নিপুণ হাতে তারা সমাজের অন্ত্যজশ্রেণির মানুষ। সামাজিকভাবে অগুরুত্বপূর্ণ, অর্থনৈতিকভাবে নিম্নআয়ের এবং ধর্মীয় দিক থেকে নিচু জাতের বলেই এরা অন্ত্যজ কিন্তু রক্ত-মাংসের খেটে খাওয়া প্রকৃত মানুষ এরাই। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে পেশা বা বৃত্তি অনুযায়ী 'নিম্নশ্রেণির মানুষ' যাদের শ্রমজীবী বলা হচ্ছে তারা হল :

কাঁসারি, শাঁখারি, গোয়ালা, তামুলী, তেলি, তাঁতি, মালাকার, নাপিত, বারুই, কুরী, কামার, কুমার, আগরী, নাগরী, যুগী, চাষা-ধোবা, চাষা-কৈবর্ত, সেকরা, ছুতার, নুড়ী, জেলে, গুড়ী, চাঁড়াল, বাগদি, হাড়ী, ডোম, মুচী, শুড়ী, কূর্মী, কোরঙ্গা, পোদ, কাপালী, তিয়র, কোল, কলু, ব্যাধ, বেদে, মাল, বাজিকর, বাইতি, পটুয়া, কান, কসবি, ভাবক, ভক্তিয়া, ভাঁড়, নর্ত্তক প্রভৃতি। এদের সকলেই কোন না কোন শ্রমের সাথে যুক্ত। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকদের সামাজিকভাবে বিশেষ আসন নির্ধারিত থাকলেও তারাও শ্রমবিমুখ ছিলেন না। সুতরাং পার্থক্য শুধু উচ্চবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্তের এবং সেই অনুপাতে শ্রমের প্রকৃতি নির্ভর করত।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের দেবী অন্নদা ছিলেন তৎকালীন সমাজের নিরন্ন মানুষের জীবনদেবতা। মধ্যযুগের সমস্ত দেব-দেবীর সহানুভূতি ছিল নিম্নবর্ণের, নিম্নশ্রেণির ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য। এর ফলে মধ্যযুগে যে মঙ্গলকাব্যগুলো সৃষ্টি হয়েছিল তা একদিকে যেমন দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা, অন্যদিকে যে সমাজের মানুষের জীবন গাথা রচিত হয়েছে তারা সমাজের অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, সমাজে তাদের মর্যাদা নেই বললেই চলে। একথা সত্য যে, বাংলা মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা কোন বিলাসবহুল জীবনচিত্র নয়। দুঃখভরা সে জীবনে আছে কেবল দারিদ্র্য থেকে মুক্তির চিন্তা। আছে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ভাবনা।[৮] সে যুগের সমাজে ব্রাহ্মণগণ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা ছাড়া রাজকার্যের জন্য উচ্চপদে নিযুক্ত থাকতেন। কায়স্থদের কাজ ছিল সরকারি কাজে লেখাঝোকা করা।

গোপেরা ছিল স্বভাবে অকপট, তারা চাষ করত এবং মুগ, তিল, গম, সরিষা, কার্পাস প্রভৃতি ফসল উৎপাদন করে গৃহ পূর্ণ করে তুলতো। তেলীদের কেউ কেউ চাষাবাদ করত , কেউ কেউ আবার তিল, তিসি, সরিষা ভেঙ্গে তেল তৈরি করে বিক্রি করত ; ফাল, শেল, কোদাল, কুড়াল প্রভৃতি কৃষির উপকরণ প্রস্তুত করত কর্মকারেরা ; পান সুপারি বিক্রি করত তাম্বুলীরা ; হাঁড়িকুড়ি প্রস্তুত করত কুম্ভকারেরা ; তাঁতীরা ভুনী, খুনী, ধূতি প্রভৃতি মোটা সরু কাপড় বুনত ; মালীরা রাজবাটিতে পুষ্প সরবরাহ করত ; বরজে পান উৎপাদন করত বারুইরা ; কেশ কর্তন করত নাপিত ; ক্ষত্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ যুদ্ধ করে জীবিকা নির্বাহ করত আগুরিয়ারা ; মোদকেরা আখ থেকে কারখানায় গুড় ও চিনি প্রস্তুত করত এবং তা দিয়ে বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন তৈরি করে পসরা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতো ; গন্ধবেনেরা গন্ধ বিক্রি করত, শাখা কেটে শঙ্খ এবং কাঁসা দিয়ে থালা-বাটি প্রস্তুত করত শঙ্খবেনে ও কংসবেনে; সুবর্ণ বণিকেরা সোনা-রূপার কেনা-বেচা করত এবং স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করে বিক্রি করত ; কৃষি ও মৎসজীবী ছিল দাসেরা ; বাদ্য বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত বাইতিরা ; আর যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করত বাগদিরা ; মাছুয়ারা জাল বুনে মাছ ধরতো ; কোচেরা খালুই বুনতো ; দরজীরা কাপড় সেলাই করত ; সিউলীরা খেজুরের গাছ থেকে রস আহরণ করে তা থেকে গুড় প্রস্তুত করত ; চিড়া-মুড়ি ভাজতো ছুতোরেরা; পাটনীরা খেয়া পারাপার করে জীবিকা নির্বাহ করত ; এ ছাড়া কবি চৌদুলি, চুনারী, চণ্ডাল, মারহাটা, কিরাত, কোল, হাঁড়ি, শুড়ি, ডোম বিয়নী[৯] প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন-জীবিকার নানা দিকের পরিচয় পাওয়া যায় মঙ্গকাব্যগুলোতে। এছাড়া ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে রাজা মানসিংহের যশোর যাত্রায় যারা শরীক হয়েছে তাদের কেউ কেউ সমাজে শ্রমজীবী হিসেবে পরিচিত। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

Dhaka University Institutional Repository

তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল ॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট, হরকরা উরুদু বাজার ॥
সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া ॥
ধাড়ী পায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড় ॥
আগে পাছে দুই পাশে দু'সারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর ॥

(অন্নদামঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭১)

'অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায়, বিশেষকরে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসে।[১০] অর্থাভাব আর অন্নাভাব তীব্ররূপ লাভ করে এর ফলে নিম্নবর্ণের ও নিম্নআয়ের মানুষেরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। চারদিকে শুধু নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের হৃদয়ের উত্তপ্ত শ্বাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সমাজের এই করুণ আর্তি কবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বিধৃত হয়েছে অতি সতর্কতার সাথে। নিরন্ন মানুষের কাছে মণি নয়, মুক্ত নয়, হীরা জহরত কিছুই নয়, বাঁচার জন্য, অস্তিত্বের লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার জন্য পরমশক্তির কাছে মানুষের চাওয়া :

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৭)

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন

বাংলার হিন্দু সমাজে ক্রিয়াশীল দুই বর্ণ– ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। হিন্দু চতুর্বর্ণের মাঝের দু'টি স্তর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, বাংলার হিন্দু সমাজে লক্ষিত হয় না বললেই চলে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* এবং *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* গ্রন্থ দুটোতেও বাংলার হিন্দু সমাজের দুই বর্ণের কথাই বলা হয়েছে। তখন থেকে চলে আসা বাংলার হিন্দু সমাজের বর্ণবিন্যাস অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি প্রচলিত ছিল। বাংলার হিন্দু সমাজে শূদ্ররাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। পূর্বে বলা হয়েছে যে , এই শূদ্ররা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তম সঙ্কর বা জলচল শূদ্র, মধ্যম সঙ্কর বা জলঅচল শূদ্র এবং অধম সঙ্কর বা অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য শূদ্র। উত্তম সঙ্কর শূদ্রদের মধ্যে পড়ে, বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখরা। এই নবশাখরা হল, গোপ, মালী, তাম্বুলী, তাঁতী, শাঁখারী, কাঁসারী, কুম্ভকার, কর্মকার ও নাপিত–এই নয়টি ব্যবসায়ী ও কারিগর বর্ণ।

একজন ব্রাহ্মণ এদের বাড়ীতে পূজাপার্বণে, পারিবারিক ক্রিয়াকর্মে যোগ দিলে বা পুরোহিতের কাজ করলে তার জাত যেত না। এমনকি এদের জলও ব্রাহ্মণদের গ্রহণীয়। তাই এরা জলচল বা জল আচরণীয় জাতি নামে পরিচিত। মধ্যম সঙ্কর বা জলঅচল শূদ্রদের মধ্যে পড়ে, কৈবর্ত, মাহিষ্য, আগুরি, সুবর্ণবণিক, সাহা-শুঁড়ি, গন্ধবণিক, বারুই বা বারুজীবী, ময়রা বা মোদক, তেলি, কলু, জেলে, ধোপা প্রভৃতি। নিচুশ্রেণির ব্রাহ্মণরা বা বর্ণ ব্রাহ্মণরা শুধু এদের বাড়িতে পৌরহিত্য করতে পারত। উচুশ্রেণির হিন্দুরা এদের হাতে জল খেত না। হিন্দু সমাজ কাঠামোর একেবারে নিচে অবস্থানরত অধম সঙ্কর বা অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য শূদ্রদের মধ্যে পড়ে, যুগী, চণ্ডাল, নমঃশূদ্র, পোদ, চামার, মুচি, হাড়ি, ডোম, বাউরি, বাগদি প্রভৃতি জাতির লোকেরা। উপরে উল্লেখিত জাতিগুলো কখনো ঘনসন্নিবিষ্ট স্তরহীন সামাজিক গোষ্ঠী ছিল না। এদের এক একটি গোষ্ঠীর মধ্যে বহু জাতি বা উপজাতির সাক্ষাৎ মেলে। এদের তিনটি[১১] সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল–

ক. সামাজিক কাঠামোয় একটি বিশেষ স্তরে অবস্থান।

খ. একটি পারিবারিক বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন এবং

গ. বিবাহ ও খাদ্যসহ কতকগুলো সামাজিক নিয়ম-কানুন মেনে চলা।

ভারতীয় বর্ণ-ব্যবস্থায় কোনো নিম্ন বর্ণ ও জাতি থেকে উচ্চ আর এক বর্ণ ও জাতিতে উত্তরণ সম্ভব হত না। তবে বৃত্তি পরিবর্তনে বর্ণ বা জাতি খুব একটা বড় বাধা হয়ে দেখা দেয়নি।[১২] ফলে বাংলার হিন্দুদের সকল বর্ণ ও জাতির মধ্যে বৃত্তি পরিবর্তনের প্রবৃত্তি দেখা যায়, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটত।

বাংলার মুসলমান নবাবরা ব্রাহ্মণদের সহজ শর্তে জমিদারি বন্দোবস্ত দিতেন এবং রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে কড়াকড়ি করতেন না। আবওয়ার ও অন্যান্য কর থেকে তারা অনেক সময়েই রেহাই পেয়েছেন। এসব কারণেই সমকালীন সমাজে জমিদারি পরিচালনায় ব্রাহ্মণদের অধিক সংখ্যায় দেখা যেত। নাটোরের সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবার (রামজীবন, রামকান্ত ও রানী ভবানী), ময়মনসিংহের শ্রীকৃষ্ণ হালদার, শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীর, জমিদার পরিবারের এ সময় উদ্ভব ঘটে। এ ছাড়াও সমসাময়িক বাংলায় অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার ভূম্যধিকারী বা ছোট জমিদার ছিল যেমনঃ রাজশাহীর তাহিরপুর ও পুঠিয়ার জমিদার।

কবি ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনাথ রায় বর্ধমানের অন্তর্গত ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়ার জমিদার ছিলেন। এই যুগে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ-জমিদারের ম্যানেজার হিসাবেও কাজ করতেন। বৈদ্যরা জাতিগত পেশা চিকিৎসাতে নিযুক্ত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে শুরু করে শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলা পর্যন্ত বাংলার নবাবরা

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুদের ব্যাপক হারে রাজস্ব বিভাগে ও প্রশাসনে নিয়োগ দিয়েছিলেন যাদের বেশির ভাগই কায়স্থ ছিল। নবশাখরা তাদের স্ব-স্ব জাতিগত পেশা বা বৃত্তিতে নিয়োজিত ছিল। বাংলার হিন্দু সমাজে ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রচলন নেই পূর্বেই বলেছি। তাদের কাজ করত, গোয়ালা, বাগদি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি উপবর্ণের লোকেরা। সুবর্ণ বণিকদের অনেকে বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি সরকার, গোমস্তা প্রভৃতি হিসেবে কাজ করত।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে কবি ভারতচন্দ্র হিন্দু বাঙালির বর্ণ ও জাতিভিত্তিক সমাজের অনেক খুঁটিনাটি তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তা থেকে বিভিন্ন জাতির বৃত্তি বা পেশার বিস্তৃত পরিচয় পাই। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতি দরশন ॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘণ্টারব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব ॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি ॥
গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার ॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক ॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী ॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর ॥
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক ॥

(অন্নদামঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩)

অন্নদামঙ্গল কাব্যের সমাজে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের গড়নে ভিন্নতা ছিল। সমকালীন বাংলার মুসলমান সমাজ ছিল মূলত তিন স্তরে বিভক্ত–আশরাফ, আতরাফ ও আরজল এই নামে। এই জাতিভেদ সৃষ্টিতে হিন্দু সম্প্রদায় যতখানি এগিয়ে ছিল মুসলমানগণ ঠিক ততখানি এগুতে পারেনি কারণ এদেশে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠনে ইসলামধর্ম সহায়ক ছিল বিধায় জাতি-বর্ণ প্রথার গুরুত্বের চেয়ে সাম্যবাদের গুরুত্বকে ইসলামধর্ম প্রাধান্য দিয়েছিল। আশরাফ উচ্চশ্রেণি, আতরাফ সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, বৃত্তিধারী মানুষ এবং আরজল পতিতশ্রেণি। উচ্চশ্রেণির মুসলমান যেমন–শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মোগল এরা আশরাফ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। গঙ্গারামসহ সমসাময়িক লেখকদের লেখায় এই চার শ্রেণির মুসলমানকে উচ্চস্তর বলা হয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, অন্যান্য বৃত্তিজীবী,কারিগর, শিল্পী, দোকানদার, জোলা, তাঁতি প্রভৃতি সকলেই আতরাফ এবং চামার, বেদে, বাজীকর প্রভৃতি শ্রেণির লোক আরজল অর্থাৎ পতিত শ্রেণির

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান। 'সমকালীন মুসলমান সমাজে শতকরা বিশ ভাগ আশরাফ, পঁচাত্তর ভাগ আতরাফ এবং পাঁচ ভাগ আরজল বিরাজ করেছিল।'[১৩]

মুসলমান সমাজে আতরাফ বা সাধারণের সংখ্যাধিক্য থাকায় বর্ণ বা স্তর কম ছিল। বাংলার মুসলমান সমাজে আতরাফদের একটি অংশ ধর্মান্তরিত হিন্দু। বাংলার হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরেও তারা সামাজিক মেলামেশায়, মর্যাদায় বা বিবাহ-ব্যাপারে আশরাফদের সমান বলে গণ্য হত না। আতরাফদের মধ্যেও দু'টি স্তর লক্ষিত হয়, বিদেশাগত মুসলমান ও এদেশীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত মিশ্র শ্রেণি আতরাফদের মধ্যে অভিজাত যারা তারা কাজী, চৌধুরী, শেখ, খাঁ, মালিক প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত হত ; অবশিষ্ট সকলেই দ্বিতীয় স্তরের আতরাফ।

অসি ও মসিকে উপজীবিকার প্রধান উপায় বলে যে শ্রেণির মুসলমানরা দম্ভ করত, যারা আরব, মধ্য এশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান হতে এদেশে এসেছে। তারা সামরিক ও রাজকার্য ছাড়া বাকি সকল কাজকেই তাদের পদ ও মর্যাদার হানিকর বলে মনে করত। এরা কখনো নিজের হাতে জমি চাষ করত না, অন্যের দ্বারা করিয়ে নিতো। যদি কেউ এ নিয়ম ভাঙতো তাহলে সামাজিকভাবে তাকে পতিত বলে গণ্য করা হত ; তাকে ঘৃণা প্রদর্শন করা হত।

বলাই বাহুল্য, মুসলমান সমাজের জন্য এর ফল পরিণতিতে ভাল হয়নি। লোকবলের অভাবে বাণিজ্য, শিল্পের চর্চা উচ্চশ্রেণির ধনী মুসলমানদের মধ্যে যেমন বন্ধ হয়ে গেল ঠিক তেমনি ধন সঞ্চয়ের রাস্তাও আর খোলা রইল না। সমকালীন মুসলমান সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণির চামার, বেদে, বাজীকর প্রভৃতি সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষ নামেমাত্র মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধর্মের বা সমাজের সঙ্গে এদের তেমন কোনো যোগ ছিল না।

সমকালীন মুসলমান সমাজে মোল্লা ও মৌলভীরা ছিলেন পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অপরিহার্য। তারা হাজাম, পশুপাখি জবাই ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে মূল ভূমিকা পালন করতেন। ঝাড়ফুঁক, মাদুলি, তাবিজ-কবজ দিয়ে শয়তান তাড়ানো প্রভৃতি কাজ এদের একচেটিয়া ছিল। সুফী, দরবেশ ও ফকিরদের অংশগ্রহণ তৎকালীন সমাজে উল্লেখযোগ্য বলেই বিবেচিত হয় কেননা মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য ধর্মের মূল আদর্শ ও অনুশাসনগুলো তারা প্রচার করতেন। এজন্য তাদের ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক হিসাবেও আখ্যায়িত করা যায়। তাদের দ্বারাই উচ্চশ্রেণির দান খয়রাত দ্বীন-দরিদ্র নিম্নশ্রেণির মানুষের দরজায় পৌঁছায়। দুর্যোগে, দুর্দিনে ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ-বিপ্লবে নিম্নশ্রেণির মধ্যে খাদ্য বিতরণ, সেবা-চিকিৎসা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। বাংলার হিন্দুরাও এ কারণে সুফী দরবেশদের বিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত। তৎকালীন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতু নির্মাণ করেছিল এই শ্রেণির মহানুভব কিছু প্রাণ।

বাংলার নবাবদের মধ্যে মুর্শিদকুলী খাঁ ছাড়া বাকি সকলেই ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। ধর্মীয় দিক থেকে মুসলমানদের দু'টি ভাগ লক্ষ করা যায়–শিয়া ও সুন্নী। 'সমকালীন সমাজে মুসলমানদের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ সুন্নী এবং এক ভাগ শিয়া ছিল।'[১৪] সুন্নীদের কাছে বড় উৎসব দু'টি ঈদ, ঈদ-উল-ফেতর ও ঈদ-উল-আজহা' শিয়াদের কাছে বড় উৎসব মহরম-আশুরা। এগুলো ছাড়াও সামাজিক উৎসব, প্রার্থনা ও অন্যান্য ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। তবে মুসলমান ধর্মজীবনে পাঁচটি প্রধান দিক– ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়। তৎকালীন বাংলার হিন্দুরা ধর্মীয়ভাবে তিনভাগে বিভক্ত ছিল, বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব। আদিবাসীরা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) যে শক্তিশালী সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও তার রূপ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। চৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

খুব সহজ ও সরল। 'সমকালীন বাংলার হিন্দুদের এক তৃতীয়াংশ বৈষ্ণব এবং প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শাক্ত ও শৈব।'[১৫] জাতীয় জীবনের সহস্রবিধ অপমানে নিষ্পিষ্ট, হতাশা ও নৈরাশ্যের অতলস্পর্শী গহ্বরে নির্বাসিত, নিক্ষিপ্ত মানবাত্মা অদৃষ্টে করাঘাতের সঙ্গে এমন এক বরাভয়দাত্রী ভীষণা দেবীর মূর্তি কল্পনা করেছে যিনি জীবনের অনিশ্চিত দুর্ভাগ্যের উপর শান্তির প্রলেপ দিতে পারবেন, উচ্ছৃঙ্খল ব্যর্থতাকে একটি ঐক্যসূত্রে বেঁধে দিতে পারবেন। তিনিই কালিকা।[১৬] কালিকাদেবীর পদে আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হল ক্ষুদ্র গীত রচনার মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে, 'শাক্তগীতি একদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দুর্যোগে নিমজ্জমান লোকশক্তির অধ্যাত্মিক তৃণ-খণ্ড, অন্যদিকে পরাজিত মানবত্মার মুমূর্ষু মাতৃচেতনা। শাক্ত পদাবলী যুগসন্ধির বিলাপগীতি, অষ্টাদশ শতকের দুঃখের ধারাপাতে শক্তি সঞ্চয়ের শতকিয়া।[১৭] অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার হিন্দুদের এর বিরাট অংশ শিবের উপাসক ছিল অর্থাৎ তারা শৈব ধর্মাবলম্বী। অন্ত্যজ শ্রেণির হিন্দুরা অধিকাংশই শৈব-উপাসক পশ্চিম বাংলা অপেক্ষা পূর্ব বাংলায় শিব অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। বিপদাপন্ন নিম্নশ্রেণির মানুষ একাগ্রচিত্তে শিবের পূজা করত, এই শিব আর্য বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিব নন, বাংলার লৌকিক দেবতার সঙ্গে এ শিব একাত্ম। এ কারণেই পূর্ব বাংলার হিন্দুদের শিবপূজা, গাজন, চড়ক পূজা প্রভৃতি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল।[১৮]

সমসাময়িক বাংলার হিন্দুদের একটা বড় অংশ আদিবাসী ও সাঁওতাল ছিল, একথা পূর্বেই বলেছি। আদিবাসীদের মধ্যে বাগদী, বাউরি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি বর্ণের লোকেরা যে ধর্মীয় জীবনযাপন করত তার সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ধর্মীয় জীবনের কোনও মিল ছিল না, বলা যায় অন্ত্যজ বলে উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা তাদের অবজ্ঞা করত। ফলে সাধারণভাবে এদের গোঁড়া হিন্দু (সনাতন) ধর্মজীবনের মধ্যে সম্পৃক্ত করা যায় না। বাগদী, বাউরি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি বর্ণের লোকেরা প্রধানত শিব, বিষ্ণু ও ধর্মরাজের পূজা করত। দেবী চণ্ডী ও দেবী মনসাও এদের পূজা পেয়েছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের পাশাপাশি অবস্থানের কারণে পরস্পরকে জানার ও বোঝার সুযোগ প্রসারিত ছিল। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্ম-কর্ম দ্বারা একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বর্ণবাদী হিন্দু সমাজের শ্রেণি-বৈষম্যের আদর্শে মুসলিম সমাজেও শ্রেণিভেদের রীতি গড়ে ওঠে। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের ন্যায় মুসলিম সমাজেও সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠান ও দেশীয় মুসলমান, এরূপ পাঁচটি বর্ণের উদ্ভব ঘটে। মুসলিম সমাজের এই শ্রেণি-বৈষম্যের পরিণতি হিন্দু সমাজের চেয়ে কম ভয়াবহ ছিল না। বর্ণগত শ্রেণিভেদ ছাড়া আর্থিক কারণেও সমাজ ভেদাভেদের প্রাচীর গড়ে ওঠে। অর্থে-বিত্তে অভিজাতেরা যে ধর্ম বা বর্ণেরই হোক না কেন সমাজে তাদের বিশেষ মর্যাদা বা প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল সুতরাং সামাজিকভাবে তারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পৌঁছে গেছে অন্যদিকে বর্ণ, ধর্ম ও অর্থ-বিত্তের গর্ব যাদের নেই তারা সামাজিকভাবে অগুরুত্বপূর্ণ তাদের আমরা অন্ত্যজ পর্যায়ে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য যে, উচ্চশ্রেণির মানুষের জীবনাচারণের সঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের পার্থক্যও ছিল যথেষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

দেবতাকে মানুষের পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং মানুষকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করাই *অন্নদামঙ্গল কাব্যের* বৈশিষ্ট্য। কবি ভারতচন্দ্রের এ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল মূলত সাধারণ মানুষের স্থান ও অবস্থানের উপর ভিত্তি করেই আর সাধারণ মানুষের জীবনধারণ নির্ভর করেছিল সেই সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির কঠোর নিয়ম-নীতির বেড়াজালে। তৎকালীন বাংলার অর্থনীতির চাবিকাঠি ছিল কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। 'মুঘল অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। কারণ কৃষিই ছিল জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জীবিকা এবং উদ্বৃত্ত সামাজিক শ্রমের বিপুল সম্পদ কৃষি থেকে সংগৃহীত হত। শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষি।'[১৯]

মনে হয়, কৃষি-উৎপাদনের জন্য এক নির্দিষ্ট সংরক্ষিত শ্রমবাহিনী তৈরি করতেই জাতিভেদ প্রথা কাজ করে গেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। সবচেয়ে ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক কাজ বরাদ্দ ছিল নিচু জাতের লোকদের জন্য, নিজেদের হাতে জমি পেয়ে বা চাষ করে তারা কখনই চাষী হওয়ার আশা করত না। এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই, কারণ এদের অনেকেরই প্রকৃত অবস্থা ছিল আধা দাসের মতো।[২০] অর্থাৎ 'এরা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের বর্ণ-কৃষক বা জমিনদারের কাছে এক ধরণের মুচলেকা-বন্দী হয়েছিল।'[২১] কৃষির প্রধান উপকরণ ধান, আর এই ধান নিয়ে ভারতচন্দ্র *অন্নদামঙ্গল কাব্যে* রন্ধনপ্রণালী বর্ণনা প্রসঙ্গে সেরা জাতের ষাট প্রকার ধানের নাম উল্লেখ করেছেন :

মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আসু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে ॥
দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা।
মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা ॥
কালিন্দী কনকচূর ছায়াচূর পুদি।
শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী ॥
ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ি খাজুরছড়ী চিনা ধলবার ॥
দাদুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।
কেলে জিরা পদ্মরাজ দুদসার লুচি ॥
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলাভোগ রান্ধে।
ধুলে বাঁশগজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে ॥
বাজাল মরীচশালী ভুরা বেনাফুল।
কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমতুল ॥
মাকু মেটে মষিলোট শিবজটা পরে।
দুধপনা গঙ্গাজল মুনিমন হরে ॥
সুধা দুধকলম খড়িকামুটি রান্ধে।
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্ধে ॥
রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁশমতী।

Dhaka University Institutional Repository

কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি ॥
রমা লক্ষ্মী আলতা দনারগুঁড়া রান্ধে।
জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে ॥
লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু ॥
(অন্নদামঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪২-৪৩)

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় ধান উৎপাদনের সঙ্গে বাংলার একশ্রেণির মানুষ জড়িত ছিল যারা অন্যের জমি চাষ করত, নিজেদের সহায়-সম্বল বলতে তেমন কিছু ছিল না। কৃষি বাংলার অধিকাংশ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই কৃষিকাজে খুব একটা উৎসাহবোধ করত না কারণ সেকালের কৃষকেরা ছিল শাসকদের শোষণের শিকার। মুঘল আমলে বাংলার অর্থনীতিতে কৃষির পরেই স্থান ছিল শিল্পের। সেকালে বৃহৎ শিল্প ছিল না বললেই চলে তবে ক্ষুদ্র শিল্প ছিল প্রচুর। ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল হস্তচালিত তাঁত শিল্প। 'বাংলার এমন কোনো গ্রাম ছিল না যেখানে শিশু বা বয়স্ক লোকেরা কাপড় তৈরিতে হাত লাগাতো না।'[২২] অতি প্রাচীনকালে বেবিলন, মিশর, গ্রীস ও রোম এবং পরবর্তীকালে আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশসমূহে, ইউরোপ, আফ্রিকা, চীন, জাপান, তিব্বত, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য চলত। 'উইলিয়াম বোল্টের লেখা থেকে জানা যায় যে, আলীবর্দী খানের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কাশ্মিরী, মুলতানী, পাঠান, ভূটিয়া, শিখ প্রমুখ হাজার হাজার কাফেলা (Caffalahs) বাংলার পণ্যের জন্য জামায়েত হতো।'[২৩] বাংলার তাঁতীদের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা গড়ে ওঠে এই সময় থেকেই।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার বস্ত্রের চাহিদা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। 'বাংলা তখন সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের, প্রতিবেশি অন্যান্য দেশের এমনকি ইউরোপীয় বস্ত্রবাজারের আড়ৎ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।'[২৪] বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জনজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দে মুগ্ধ হয়ে বিদেশীরা এদেশকে 'সোনার বাংলা'[২৫] ভারতের ভূস্বর্গ[২৬] ও জান্নাতুল ফিলাদ[২৭] ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন।

অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের পাশাপাশি অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানহীন দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের চিত্রও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলার জন জীবনের এই দুঃখ-দুর্দশার অনেকগুলো কারণ ছিল।[২৮] যথাঃ (ক) শাসকের শোষণ, (খ) রাজকর্মচারীদের নিপীড়ন-নির্যাতন, (গ) বিদেশী বণিকের দালাল মহাজন ও মুৎসুদ্দিদের প্রতারণা প্রবঞ্চনা ও (ঘ) নানারূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। 'একদিকে যেমন সামন্তেরা অধিক লোভে ও দিল্লীর মোগল সম্রাটদের বিশাল আড়ম্বরময় বিলাস-ব্যসনের অনুকরণে প্রচুর ব্যয় করিবার জন্য প্রজাদের নিকট হইতে জোর করিয়া কর আদায় করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় রাজকর্মচারীগণ বাদশাহের দোহাই দিয়া অথবা ব্যক্তিগতভাবে অতিরিক্ত কর আদায় করিয়াছে।[২৯] রাজকর্মচারীদের নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ কখনো কখনো এমন পৈশাচিক রূপ পরিগ্রহ করত যে তারা প্রজাদের কোলের সন্তান পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছিল। শাসক ও তাদের দোসরদের অত্যাচারে জনগণ কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে। নিম্নবিত্তের মানুষ ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পরিণতিতে দ্রব্যমূল্য কল্পনাতীতভাবে সস্তা হয়। বাহ্যিকভাবে এটা প্রমাণিত হয় যে, সুখী সমাজের মানুষও সুখেই আছে। শাসকের শোষণ নির্যাতন ছাড়া বন্যা, প্লাবন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেও বাংলার জনজীবনে সময়ে-অসময়ে দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসতো। আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী* থেকে

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায়, ১৫৮৩ কিংবা ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে এক প্রচণ্ড জলপ্লাবনে বাকলার প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। এতে প্রায় দু'লক্ষাধিক নর-নারী ও গৃহপালিত পশুর প্রাণহানি ঘটে।[৩০]

অন্নদামঙ্গল কাব্যের কবি ভারতচন্দ্রের অভিজ্ঞতা ছিল বর্গী হাঙ্গামা প্রত্যক্ষ করবার। উড়িষ্যায় ভাস্কর পণ্ডিতদের শিবিরে কবি কিছুকাল থাকতে বাধ্য হন।[৩১] বর্গী হাঙ্গামার ফলে বাংলায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়েছিল। পূর্ব প্রচলিত আর্থিক শ্রেণিগত বিভেদ আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল সে সময়। বাংলার হতভাগ্য দরিদ্র জনসাধারণের লাঞ্ছনার শেষ ছিল না। মুর্শিদাবাদের শাসনযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ও নিপীড়ন অপেক্ষা ভূস্বামী সামন্ত-প্রভুদের শোষণ নির্যাতন কোনো অংশে কম ছিল না। তার ওপর ছিল দস্যুতস্করের উপদ্রব, পর্তুগীজ জলদস্যুর আক্রমণ, মর্মান্তিক দাস ব্যবসা, অতি নগণ্য মূল্যে বালিকা বিক্রয় ইত্যাদি।[৩২] এসব চিত্র আমরা *অন্নদামঙ্গল কাব্যে* প্রতিফলিত হতে দেখেছি।

বাংলার সমাজজীবনে তখন একদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন শোষিত ও পর্যুদস্ত সাধারণ মানুষ, অপরদিকে নীতিহীন বিলাসের স্রোতে ভাসমান অভিজাত বিত্তশালী সম্প্রদায়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, 'সেদিনের বাংলায় অবস্থানরত ইংরেজরাও এই নীতিহীন নবাবী বিলাস-আড়ম্বরে সমভাবে যোগ দিয়েছিল, তাই ইংল্যান্ডে তাদের নাম হয়েছিল 'নাবুব'।'[৩৩] কবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল কাব্যের* আরাধ্য দেবী হলেন, দেবী অন্নদা বা অন্নপূর্ণা। এ পর্যায়ে দু'টি বিষয়ের অবতারণা অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

প্রথমত, বর্গীর অত্যাচারে গঙ্গা নদীর পশ্চিম দিকের কৃষকরা জোত-জমি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়, ফলে শত শত বিঘা জমিতে ফলন বছরের পর বছর বন্ধ থাকে। বাংলায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘনিয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একটা বিশাল কৃতিত্ব কারণ এতো অল্প সময়ে তিনি নবাব আলীবর্দী খাঁ সরকারের করের দেনার বিরাট অঙ্ক পরিশোধ করে আপন রাজকোষও পূর্ণ করেছিলেন। এতে অনেক ঐতিহাসিক বিস্মিত হয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে এমন ঘটনায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই যেহেতু প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়ের ইতিহাস কমবেশি সকলেরই জানা। ভারতচন্দ্রের কবিকর্মের আসর ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবার, কবি নিজেও জন্মেছিলেন একটি রাজ-পরিবারে। দরবারী জীবনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কবির জানা, সে জীবনপ্রণালী বাংলার বৃহত্তর গণমানুষের জীবন থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র সেখানে ভিন্ন জাতের ছলাকলা, বুদ্ধির কৌশল, রুচির বৈদগ্ধ্য, বাচনভঙ্গির চাতুর্য, রূপসজ্জার পরিপাটি সর্বোপরি তোষামুদের কারখানা। জীবনের সহজ তাগিদ, বাঁচার অনাবিল আনন্দ, প্রেরণা আর প্রকাশের সরল অভিব্যক্তি সেখানে অনুপস্থিত। কবি সেই পরিবেশের মধ্যে থেকেও একান্ত বৈদগ্ধ্য রুচিবোধকে জাগিয়ে তুলেছেন, সাধারণ মানুষ তাঁর রচনায় গৌরবের আসনে বসতে পেরেছে। মানব ও মানবতার জয়গান সূচিত হয়েছে। এর মূলে কিছু কারণ আছে বলে মনে হয়। প্রথমত, ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা সুদূরপ্রসারী। দ্বিতীয়ত, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি যেমন একদিকে রাজসভার রসবোধের দাবী মিটিয়েছে অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার স্বতন্ত্র দিকও উন্মোচিত হয়েছে। তৃতীয়ত, সম্পূর্ণ *অন্নদামঙ্গল কাব্যে* কবি ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। পরিকল্পনায়, চরিত্রসৃষ্টিতে ও গঠননৈপুণ্যে কবি সেই সমাজকে কটাক্ষ করেছেন। চতুর্থত, *অন্নদামঙ্গল কাব্যের* যে ভাষা-সৌধ ভারতচন্দ্র নির্মাণ করেছেন তা অত্যন্ত পরিশীলিত, রুচি-বৈদগ্ধ্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

নিম্নবর্গ বা অন্ত্যজশ্রেণির দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহের মধ্যে জীবনের যে চাঞ্চল্য ও সাদামাটা উপলব্ধি সন্নিহিত থাকে ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল কাব্যে* অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। গভীর মমতা, ভালোবাসা, সর্বোপরি ব্যক্তি-সচেতনতা তাঁকে এরূপ সাহিত্যকর্ম সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। *অন্নদামঙ্গল কাব্যে* কবি ভারতচন্দ্র মানুষকে দেবতার পর্যায়ে এনেছেন আর দেবতাকে মানুষের পর্যায়ে। দেবতারা সাধারণত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবেন এটাই স্বাভাবিক। অথচ *অন্নদামঙ্গলের* শুরুতেই আমরা

Dhaka University Institutional Repository

দেবীর মানুষী রূপ দেখতে পাই। দেবী অন্নদা মর্ত্যে তার পূজা প্রচার করবেন। মর্ত্যে পূজা প্রচার কীভাবে সম্ভব সেটা তিনি জানেন না এমনটা হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেবী মনসার মতো তিনিও মহাদেবের দারস্থ হতে পারতেন কিন্তু না ঘটনা ঘটল উল্টো, তিনি স্বর্গের কোনো দেব-দেবীর কাছে পরামর্শ চাইলেন না। তিনি জয়া-বিজয়া নাম্নী দুই সখীর পরামর্শ গ্রহণ করলেন।

জয়া-বিজয়া : উমা, পার্বতী, দুর্গা, চণ্ডী, অন্নদা যে নামেই ডাকি না কেন তিনি দেবী, দুর্গতিনাশিনী। বিজয়া ও জয়া শব্দ দু'টি দুর্গার অভিধাও বটে।[৩৪] শিল্পশাস্ত্রে বিজয়া-জয়া দ্বারপালিকা রূপে চিত্রিত। এই ভূমিকায় তারা চতুর্ভুজা, শঙ্খ, চক্র ও গদাধারিনী।[৩৫]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীকে দুই সখী জয়া-বিজয়াকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যধামে পূজা নিতে দেখা যায়। *অন্নদামঙ্গল কাব্যে* জয়া ও বিজয়ার সঙ্গে দেবীর যে সম্পর্ক তা শুধু দেবতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এ সম্পর্ক নির্দেশ করে সাধারণ মানুষের, যেখানে আধিপত্য বা আদেশ পালন নয়, প্রভু-ভৃর্ত্যের আচরণের কোনো ছাপ নেই, আছে একান্ত সান্নিধ্যে সহচরীদের প্রেম, ভালোবাসা এবং অধিকারের সমন্বয়। অধিকারবোধ আছে বলেই জয়া-বিজয়াকে সকল সময় দেবী-অন্নদার পরামর্শদাত্রীর ভূমিকায় দেখা যায়। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনে এক সময় প্রচণ্ড অশান্তি দেখা দেয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, আবহমান বাংলার নিরন্ন, নিম্নশ্রেণির, নিম্ন আয়ের মানুষের ভাগ্যে অন্নের অভাবে যেমন সংসারে অশান্তি লেগে থাকে ঠিক তেমনি অশান্তির মূল কারণ ছিল শিব-পার্বতীর অন্নের অভাব। একদিন জয়া ও বিজয়ার সামনে শিব-পার্বতীর মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হল। শিব বললেন :

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি ॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই ॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল ॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারী ॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥
কিবা শুভ ক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর।
খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর ॥

(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৬)

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী শিবের এমন বাক্যে দেবী অন্নদা ক্ষুব্ধা ও ক্রুদ্ধা হলেন কিন্তু শিবের বাক্যে যে দুঃখকথা বর্ণিত হল তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ক্ষুধার জন্য চারটি অন্নের সংস্থান করতে করতে শিবকে ভিখারী হতে হয়েছে। এই ভিখারীদশা *অন্নদামঙ্গল কাব্যের* নিম্নশ্রেণির। যেহেতু নিম্নশ্রেণির কৃষি দেবতা হিসেবে শিব প্রতিষ্ঠিত সেহেতু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অন্নাভাবে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর কোন্দল 'অন্ত্যজ'শ্রেণির মানুষের সমাজে প্রকট আকার ধারণ করেছিল। যার চিত্র শিব-পার্বতীর সংসারে ভাষারূপ পেয়েছে। এমন ঘটনার প্রেক্ষিতে ক্রুদ্ধা দেবী অন্নদা দুই সখী জয়া ও বিজয়াকে সাক্ষী মেনে বলছেন :

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে ॥
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হইল চণ্ডী ॥

... ...

গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু ॥
তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ ॥
উঁহার ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা ॥
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সব গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান ॥
ভিক্ষা মাগি খুদ কোণ যে পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর ॥
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায় ॥
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ ॥

(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৮-৮৯)

দেবী অন্নদার বাক্য থেকে বোঝা যায় সংসারে সন্তান-সন্ততি জন্ম নিলে তার পরিধি বেড়ে যায় সেই হিসাবে অন্নের সংস্থান জরুরি হয়ে পড়ে। দেবী অন্নদার মনে হয়েছে স্বামী যে ধন নিয়ে দেবীকে বিবাহ করেছিল এখনও সেই ধন আছে তাহলে আমিই কি সংসারে অলক্ষ্মী? উত্তরটি দেবীর মুখ থেকেই পাওয়া যায়, তা হল সংসার বড় হলে যে অন্নের প্রয়োজন তা পর্যাপ্ত ছিল না কারণ সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের আয়-উপার্জন বাড়াতে হবে কিন্তু *অন্নদামঙ্গল কাব্যের* নিম্নশ্রেণির মানুষের সংসারে নিত্য অতিথির আগমন ঘটছে কিন্তু তাদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা নেই। দুঃখ-দারিদ্র্যের সংসারে তাই প্রতিনিয়ত স্ত্রীদের দায়ী

Dhaka University Institutional Repository

করা হয় অলক্ষ্মী বলে। কিন্তু সন্তান জন্মদানে শুধুমাত্র নারীরা দায়ী ,পুরুষের অংশগ্রহণ কি এখানে অবান্তর? দেবী অন্নদার কটূ ভাষণে জয়া-বিজয়ার সামনে শিব লজ্জা পেলেন। তিনি মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করে ভিক্ষায় বের হয়ে পড়লেন।

এদিকে দেবী স্বামীর অভাব-অনটনের সংসার ছেড়ে দু'পুত্র কার্তিক-গনেশকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন সখী জয়া দেবীকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন :

কহে সখী জয়া শুন গো অভয়া
একি কর ঠাকুরালি।
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপঘর
খেয়াতি হবে কাঙ্গালী ॥
মিছা ক্রোধ করি আপনা পাসরি
কি কর ছাবাল খেলা।
সুখমোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম
সংসার সাগরে ভেলা ॥
অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন দেহ কয়ে
দাঁড়াবে কাহার কাছে।
দেখিয়া কাঙ্গালী সবে দিবে গালি
রহিতে না দিবে নাছে ॥
জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া ॥
যা বলি তা কর নিজ মূর্ত্তি ধর
বস অন্নপূর্ণা হয়ে।
কৈলাস শিখর অন্নে পূর্ণ কর
জগতের অন্ন লয়ে ॥

(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯২)

বাঙালি নারীর সম্মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় যদি স্বামীর গৃহ থেকে বাপের গৃহে ফিরে আসে। সেক্ষেত্রে বাবা, মা সকলেই তিরস্কার করে সুতরাং নারী হিসেবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে স্বামীর গৃহেই তা সফল করতে হবে এটাই জগতের নিয়ম। দেবীর সখী জয়া এবার পরামর্শ দিলেন ত্রিভুবনের সকল অন্ন নিজের কাছে অর্থাৎ কৈলাসে নিয়ে আসার জন্য। এতে করে অন্যান্য দেবতার মতো শিবও কোথাও অন্ন না পেয়ে চণ্ডী তথা অন্নপূর্ণার কাছে অন্ন প্রার্থনা করবেন এবং তুষ্ট হয়ে দেবীর গুণগান গাইবেন। দেবী অন্নদা বা অন্নপূর্ণা সখী জয়ার সুপরামর্শে ক্রোধ সংবরণ করে অবশেষে তার কথামতোই কাজ করলেন :

জয়ার বচনে দেবী মানিয়া প্রবোধ।
বসিলেন হাস্যমুখী দূরে গেল ক্রোধ ॥

Dhaka University Institutional Repository

বিশাই বিশাই বলি করিলা স্মরণ।
জোড়হাতে বিশ্বকর্মা দিলা দরশন ॥
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৫)

দেবী অন্নদা নরলোকে তার পূজা প্রচারের সংকল্প করে সখীদ্বয় জয়া-বিজয়াকে এর উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন :

জয়া বিজয়ারে কন সহাসবদনে।
নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে ॥
কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যৎ বাণী।
কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি ॥
বসুন্ধর নামে তার আছে সহচর।
দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর ॥
রমণীসম্ভোগ তার কাননে হইবে।
সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে ॥
মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে।
ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে ॥
তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার।
কুবেরের সুতে শাপ দিবা পুনর্ব্বার ॥
ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে।
হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে ॥
দিল্লী হৈতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার।
তাহা হইতে হইবেক পূজার প্রচার ॥
তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায় ॥
তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড়।
হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড় ॥
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮৫-৮৬)

অন্নদামঙ্গল কাব্যের শুরুতেই দেবী মানুষের পর্যায়ে এসে মানুষী আচরণ করেছেন। দেবী মর্ত্যে পূজা প্রচার করবেন এজন্য সখী জয়া-বিজয়ার পরামর্শ তিনি গ্রহণ করলেন। নলকুবেরের শাপ প্রসঙ্গে জয়া বিজয়ার পরামর্শকেই প্রাধান্য দিতে দেখা যায়। নলকুবের দুই স্ত্রীকে নিয়ে কুঞ্জবনে বিহার করছেন। চৈত্র মুধমাস। সময়টাও বসন্তকাল। চারদিকে সুশোভিত তরুলতা। তখন চলছে শুক্লা অষ্টমী। কোকিলের কুহুকুহু তানে, ভ্রমরের গুঞ্জন-ঝঙ্কারে বিশ্ব মোহিত। পূজা পাওয়ার মোক্ষম সময় এটি। এ সময়েই পূজা পাবার মানসে সখীদের নিয়ে দেবী অন্নদা ভুবন ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কুঞ্জবন যেন শোভাবর্ধন করছে, চারদিকে নৃত্য-বাদ্য-গীতের শব্দ শোনা যায়, সুগন্ধী ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে, ভোজ্য আয়োজন হয়েছে এমনটি দেখে দেবী বিজয়াকে বলছেন :

কহেন অভয়া দেখ লো বিজয়া

Dhaka University Institutional Repository

কে বুঝি পূজে আমারে।
এ কৈল যেমন না দেখি এমন
এই সে ধন্য সংসারে ॥
হাসি জয়া কহে ও মা এসে নহে
এ ত কুবেরের বেটা।
পূজা কি কে জানে কারে বা ও মানে
উহারে আঁটিয়ে কেটা ॥
ধনমত্ত অতি লইয়া যুবতী
ও করে কামবিহার।
পূজিছে তোমারে বল কি বিচারে
কি কব আমি ইহার ॥
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৬-২০৭)

তারপর জয়ার পরামর্শে দেবী ব্রাহ্মণবেশে নলকুবেরের কাছে গিয়ে আপনার পূজার কথা বললেন, তখন নলকুবের কটু কথা শুনালো, বলল :

এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা ॥
এ সুখযামিনী এ নব কামিনী
এ আমি নব যুবক।

এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক ॥
জানি অন্নদারে সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।
অন্নদা যেমন কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে ॥
শঙ্কর ভিখারী সে ত তারি নারী
আমি মর্ম্ম জানি তার।
বাপার ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে
দিনে আসে তিন বার ॥
কি বলে বামন অরে চরগণ
বধ রে ইহার প্রাণ।
এমন শুনিয়া সক্রোধ হইয়া
দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৮-২০৯)

Dhaka University Institutional Repository

দেবী হুঙ্কার ছেড়ে অন্তর্ধান হলেন এবং শেষ পর্যন্ত শাপ দিয়ে নলকুবেরকে মর্ত্যে পাঠালেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> এখানে প্রশ্ন যে দেবী রাগ করে মুহূর্তেই অন্তর্ধান হতে পারেন। যিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তাকে কেন সামান্য সখীকে পুজো কে করছে তা জিজ্ঞেস করতে হয়। সখীর পরামর্শেই ব্রাহ্মণ সেজে পুজো মানতে এখানে ভারতচন্দ্র দেবীর এমনি মানষীরূপ অঙ্কিত করেছেন যাকে কোন সচ্ছল সংসারের কর্ত্রী মনে হয়। যে কর্ত্রী বুদ্ধিমতী দাসীর দ্বারা সর্বদাই প্রতারিত। এজন্য নিজের যাবতীয় অভিলাষ দেবী জয়া-বিজয়া দুই সখীকে বলেন। তাদের পরামর্শ অনুসারে সব কাজ হয়। নলকুবেরকে অভিশাপ দেয়া থেকে শুরু করে কাব্যের শেষ পর্যন্ত বাহ্যিক আচরণের দিকে দেবী অন্নদা সম্পূর্ণ লৌকিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন প্রায় ক্ষেত্রে।[৩৬]

হরিহোড়ের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় দেবীর ছলনা একান্ত মানবিক। হরিহোড়ের বাড়িতে কোলাহল, হৈ-চৈ দেবীর ভাল লাগে না। তাই ও বাড়ি ছেড়ে তাকে ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ি যেতে হবে। অন্নদা হরির নায়রী মেয়ে সেজে বিদায় চাইলেন, এখানে চিরায়ত নারীর প্রতিচ্ছবি লক্ষ করার মতো। অথচ অত্যন্ত দরিদ্র বিষ্ণুহোড় মৌলিক কায়স্থ হলেও দারিদ্রের জন্য লোকে তাকে 'বাহাত্তরে কায়স্থ' বলে পরিহাস করে। হরিহোড় এমনি দরিদ্র পিতামাতার ঘরে বিভিন্ন দুঃখ সহ্য করে যৌবনে পদার্পণ করলেন। বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ-পোষণের জন্য মাঠঘাট ঘুরে ঘুঁটে কুড়িয়ে কোনো প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। অতঃপর একদিন দেবী অন্নদা কৃপাপরবশ হয়ে বৃদ্ধার বেশে হরিহোড়ের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন যে, তার অনেক ঘুটে সংগ্রহ হয়েছে বইতে পারছেন না হরিহোড়কে তিনি বইতে বললেন।

বৃদ্ধারূপী অন্নদা হরিহোড়ের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন সুতরাং হরিহোড়কে ধন দেওয়ার পূর্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, হরিহোড় অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে কুলীন বংশের তিন কন্যা বিবাহ করবেন এবং অন্নদার পূজা মর্ত্যে প্রচার করবেন। হরিহোড়রূপী বসুন্ধরকে দিয়ে মর্ত্যে পূজা প্রচার শেষে দেবী তাকে স্বস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। স্বর্গে বসুন্ধরের স্ত্রী বসুন্ধরা দেবী অন্নদার কাছে অনুযোগ করলেন, তাকে স্বর্গে রেখে দেবী তার স্বামীকে মর্ত্যে শাপ দিয়ে পাঠালেন, এটা কেমন বিচার? আবারও দেবী সখী জয়ার পরামর্শে বসুন্ধরাকে কলহ পরায়ণা রমণীরূপে মর্ত্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন, যাতে বসুন্ধরকে স্বর্গে ফিরিয়ে আনা সহজতর হয়। ফলস্বরূপ বসুন্ধরা মর্ত্যে মহা ঠকবাজ ঝড়ু দত্তের কন্যারূপে জন্মলাভ করলেন। মর্ত্য জীবনে তার নাম হল সোহাগী। বাল্যকাল থেকেই সোহাগী কোন্দল বিদ্যায় পটিয়সী। এরপর :

ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে।
বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে ॥
শুভক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈল আসি।
লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী ॥
বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া।
আজ্ঞাবহ সোহাগীর সোহাগ করিয়া ॥
অন্নপূর্ণা ছাড়িতে সর্ব্বদা চান ছল।
চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল ॥

(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৪-২০৫)

Dhaka University Institutional Repository

কোন্দলের কারণে দেবী অন্নদা হরিহোড়ের নিবাস ছাড়ার বাসনা করলেন কিন্তু পূর্ব প্রতিজ্ঞা মতো হরিহোড় যেতে না বললে দেবী অন্নদা তাকে ছাড়তে পারেন না। সুতরাং ইতঃপূর্বে দেবী ব্যাসদেবের সঙ্গে যা করেছেন মনস্থির করলেন হরিহোড়ের সঙ্গেও একই ব্যবহার করবেন :

গৃহচ্ছেদে হরিহোড় সতত উন্মনা।
দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা ॥
এক দিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে ॥
মনে আছে তার পূর্বব দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে ॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে ॥
ওই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে ॥
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, ২১৩)

দেবী অন্নদা এই কথারই অপেক্ষায় ছিলেন বলে মনে হয় সুতরাং যেই কথা সেই কাজ। তৎক্ষণাৎ ঝাঁপি নিয়ে হরিহোড়ের বাড়ি ত্যাগ করে গাঙ্গিনী নদী পার হয়ে আন্দুলিয়া গ্রামে ভবানন্দ মজুমদারের ঘরে চললেন দেবী তাকে কৃপা করতে। এর পূর্বেই দেবী অন্নদা অনুচিত কাজের জন্য কুবেরের পুত্র নলকুবেরকে এবং তার দুই স্ত্রী চন্দ্রিনী ও পদ্মিনীকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠিয়েছিলেন কারণ দেবী অন্নদা অনুধাবন করেছিলেন, বৃদ্ধ বুদ্ধিহত হরিহোড় চতুর্থ পক্ষের কোন্দলী স্ত্রী সোহাগীর জন্য দুর্ভাগ্য টেনে এনেছেন। এখন দেবী অন্নদা মর্ত্যধামে পূজা প্রচারের উপযুক্ত মনে করেন নলকুবেরকে এজন্য সামান্য অপরাধে দুই স্ত্রীর সঙ্গে তাকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠিয়ে দিলেন। অভিশপ্ত নলকুবের মর্ত্যে আন্দুলিয়া গ্রামের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ রাম সমাদ্দার ও তার স্ত্রী সীতা দেবীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। মর্ত্যভূমিতে এসে নলকুবেরের রাম হল ভবানন্দ। দুই স্ত্রীও চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী নামে মর্ত্যে জন্ম নিলেন। পরমভক্ত ভবানন্দের ভবনের উদ্দেশে যাত্রা করে দেবী অন্নদা গাঙ্গিনী নদী তীরে এসে উপনীত হলেন এখানে দেখা হল খেয়া ঘাটের এক মাঝির সঙ্গে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে তার নাম ঈশ্বরী পাটনী।

ঈশ্বরী পাটনী : মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রটি অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে সমগ্র মঙ্গলকাব্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সকল স্থানেই ডোমনী খেয়া পারাপারকারিণী ; এক সময় বাংলাদেশের ডোম নারীই এ কাজ করত; কবি ভারতচন্দ্র তারই ঈশ্বরী নামকরণ করেছেন। মঙ্গলকাব্যের বিশেষজ্ঞ আশুতোষ ভট্টাচার্য[৩৭] ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীকে স্ত্রী চরিত্র হিসাবে নিশ্চিত রায় দিলেও অনেকে[৩৮] একে পুরুষ চরিত্র হিসেবেও অনুমান করেছেন। তার অল্প সময়ের উপস্থিতি যেন সমগ্র *অন্নদামঙ্গল কাব্যকে* নাড়া দিয়েছে। দেবতা, অতিদেবতার মাঝে হঠাৎ 'অন্ত্যজ' শ্রেণির সগৌরব উপস্থিতি যেন *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে সেই সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য করে। *মনসামঙ্গল* কাব্যে খেয়া পারাপারকারিণী ডোমনীর মধ্যে যে মানবিক পরিচয়টি তখনও প্রচ্ছন্ন ছিল, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের পরিকল্পনার মধ্যে তারই পরিপূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। দেবী অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রাকালে গাঙ্গিনীর তীরে খেয়াঘাটে এলেন, 'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।'[৩৯] সে সকল 'অন্ত্যজ' শ্রেণির মানুষের চাওয়া শান্তি, সুখ প্রত্যাশী, ধর্মভীরু একজন শ্রমজীবী নারী। কর্ম ও নিয়মনীতি

Dhaka University Institutional Repository
সম্পর্কে সে সচেতন, এজন্য একা কুলবধূকে নদী পার করে দেবার পূর্বে সে পরিচয় জিজ্ঞেস করে। যাতে তাকে পরবর্তীকালে ঝামেলায় পড়তে না হয় –

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার ॥
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৫)

ঈশ্বরী পাটনীর জিজ্ঞাসার উত্তরে দেবী অন্নদা আত্ম-পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেন :

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
... ...
অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৫)

'অন্ত্যজ' শ্রেণির পাটনী দেবী অন্নদার আত্ম-পরিচয়ের গূঢ়ার্থ বুঝতে না পারলেও সরল বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরী পাটনী বুঝেছিল :

পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল।।
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৫)

সমাজে কুলীন জাতের অভিশাপ পরবর্তী সময় পর্যন্ত এক ভয়াবহরূপ ধারণ করেছিল। 'কুলীন' শব্দটি ছোট জাতের পাটুনীর কাছে তাই কোন্দলপূর্ণ মনে হয়েছে। এই কোন্দল নিম্নবর্ণের নয় উচ্চবর্ণের। একদিকে সমবেদনা আর অন্যদিকে সচেতনতা উভয় গুণে 'ঈশ্বরী পাটনী' চরিত্রটি সমগ্র মঙ্গলকাব্যে অন্ত্যজ শ্রেণির পথ-প্রদর্শক হিসেবে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। ব্যক্তি-সচেতন ঈশ্বরী পাটনী দেবী অন্নদাকে নদী পার করতে স্বীকৃত হলেও পারাপারের পারিশ্রমিক কড়ির কথা ভোলেননি। বলেছেন :

শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৬)

Dhaka University Institutional Repository

আবার মানুষের প্রতি মানুষের সমবেদনার দৃষ্টিতে 'ঈশ্বরী পাটনী' যখন দেখল দেবী পা ঝুলিয়ে রেখেছেন তখন ' কুমীর এসে টেনে নিয়ে যাওয়ার কথা' বলেন। দেবীও বুঝতে পারলেন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ হলে কি হবে, এতো স্নেহভরা বাণী উচ্চশ্রেণির মুখেও হয়ত শোনা হয়নি। পরম আত্মীয়ের মতো সাবধান করে, সমবেদনা জানিয়ে ঈশ্বরী পাটনী দেবীর মন জয় করেছেন, তাই 'ঈশ্বরী পাটনী' যখন নৌকার মধ্যে পা রাখতে বললেন দেবীকে তখন কাঠের সেঁউতি স্বর্ণে রূপান্তরিত হল, ঈশ্বরী পাটনী বুঝলেন :

এত মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।

(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৬)

ভয়ে কাতরা ঈশ্বরী পাটনীর শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে চোখে জল নেমে এল। অন্ত্যজ শ্রেণির 'পাটনী' শিক্ষা-দীক্ষা, মন্ত্র-সাধনা কিছু জানে না তারপরও :

তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ॥

(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৭)

এবার দেবী নিজ পরিচয় প্রকাশ করে বর প্রার্থনা করতে বললেন ঈশ্বরী পাটনীকে তখন ঈশ্বরী পাটনী 'ভোগীর মত ধন-সম্পদ এবং সাধকের মত মুক্তি'[৪০] না চেয়ে নির্লোভ জীবনের সুখ-শান্তি চেয়ে জোড় হাতে প্রার্থনা করলেন :

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।

(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৭)

বাঙালির চিরন্তন কামনাকে বাণীবহ করে ঈশ্বরী পাটনী চিরদিনের জন্য বাংলার মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন এই কৃতিত্ব ভারতচন্দ্রের নিজস্ব। তিনি রাজপুত্র হলেও, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের কারণে তাঁকে দু'মুঠো অন্নের জন্য দাসত্ব করতে হয়েছিল। আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি জনসাধারণের ক্ষুধাক্লিষ্ট, যন্ত্রণাকাতর হাহাকার উপলব্ধি করেছিলেন। একদিকে অপরিসীম বিলাসের স্রোত, সঞ্চয়ের অপচয়, অপরদিকে দারিদ্র-প্রপীড়িত জনসাধারণের অভাব-অনটন এই বিপরীতমুখী জীবন-সম্পর্কে কবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষের মূল্যবোধ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মের আবরণ ভেদ করে দেখা দিতে পারেনি। মানবতা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েও একটি হাত দেবী মনসার কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়েছে কিন্তু প্রকৃত মানবতার দরজা খুলে গেল বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে। এদেশ ইংরেজদের হাতে চলে না গেলেও জাতির জীবনবিবর্তনের অনিবার্য ফল হিসাবে যে রেনেসাঁ ঘটতো তার একটা অস্পষ্ট পূর্বাভাস যে কবি ভারতচন্দ্রের মানবতাবোধে প্রকাশিত এটা ধারণা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

হীরা মালিনী : ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল কাব্যের* 'বিদ্যাসুন্দর' আখ্যায়িকায় বর্ণিত হীরা মালিনী চরিত্রটি কবির অসামান্য সৃষ্টি। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণির এই নারী চরিত্রটি যেমন জীবন্ত তেমন সমাজ-ইতিহাসকারদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতচন্দ্রের লেখনীতে হীরা মালিনীর পরিচয় :

সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেন কালে তথা এক আইল মালিনী ॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম ॥
গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে ॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥
ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ঠুলি ॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায় ॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া ॥
(অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯)

কুটনী, দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন হীরা মালিনীর বাসায় আগন্তুক সুন্দর সহজেই আশ্রয় পায়। কবি তৎকালীন সমাজচিত্র হীরা মালিনীর চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন বলেই এই চরিত্রে অর্থগৃধ্নু, চতুরা, প্রবঞ্চক নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । যেমন :

টাকা পেয়ে মুটাভরা হীরা পরধনহরা
বুঝিল এ মেনে আজবোজ ॥
সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি রাঙ্গ তামা বারি করি
হাটে যায় বেসাতির তরে।
(অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২)

হীরা মালিনীর পসারীকে প্রবঞ্চনার ধরনটাও অতি চমৎকার। যেমন :

যদি দেখে আঁটাআঁটি কান্দিয়া তিতায় মাটি
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর ॥
রাঙ্গ তামা মেকী মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে
বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
(অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩)

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন অন্ত্যজ শ্রেণির, নিম্নআয়ের নারীরা এতো চতুর হয় তা হীরা মালিনীকে না দেখলে বোঝা যাবে না। মালিনীর নষ্টামীর কথা সুন্দর জানতে পেরে সে মালিনীকে 'মা'-এর তুল্য 'মাসী' বলে সম্বোধন করে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে :

রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।
আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী ॥
মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর ॥
(অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০)

হীরা মালিনীর মধ্যে নিয়ম-নীতির ছোঁয়া নেই। নেই শুভবুদ্ধি, যার সাহায্যে সে ভাল কোনো কাজ করতে পারে। আছে শুধু জানা ছলনা করার কৌশল, আর পুরানো দিনের কামাচারের কিছু কিছু কৌশল তার চরিত্রে এখনও বর্তমান। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের বড়াই যেমন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দূতী, হীরা মালিনীও সুন্দর ও বিদ্যার অবৈধ প্রণয়ে দূতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ প্রসঙ্গে সামলোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> গোরক্ষ বিজয়ের যোগিনী, ধর্মমঙ্গলের নয়ানী ও বিদ্যাসুন্দরের মালিনী অভিন্ন চরিত্র। সংস্কৃত সাহিত্যেও কুট্টিনী নামক অনুরূপ চরিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এই বিশেষ প্রকৃতির স্ত্রী-চরিত্রের পরিকল্পনা বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের উপরও কতকটা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের এই বর্ণনাতে এই চরিত্রটি কেমন যেন নিষ্প্রাণ মৃৎ-প্রতিমার মত বাহিরে কৃত্রিম অলঙ্কার সজ্জায় সমুজ্জ্বল, কিন্তু দৃষ্টি অপলক। ইহাকে তিনি একটি ছাঁচ (type) চরিত্র রূপেই কল্পনা করিয়াছেন– বিশিষ্ট একটি রূপের মধ্যে ইহাকে জীবন দান করিতে পারেন নাই।[৪১]

সমাজ সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ। তৎকালীন সমাজে ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি যে চরম আকার ধারণ করেছিল সে তথ্য হীরা মালিনীর মুখে শোনা যায়, এ থেকে বোঝা যায় এই চরিত্র নিজেই কলুষিত ছিল তথাপি সমাজের কলুষ দৃষ্টির প্রতি তার ইঙ্গিত ছিল সচেতন।

অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা সব সময় ভয় পেয়েছিল উচ্চশ্রেণিকে যেহেতু দণ্ডদাতা ও দণ্ডকার্যকরের মতো বিশাল ক্ষমতার অধিকারী ছিল এই সমাজটি। হীরা মালিনী এ কারণেই সুন্দরকে গোপন সাক্ষাতের মতো অবৈধ কাজ করতে নিষেধ করেছিল, বিদ্যাকে সদ্‌বুদ্ধি দিয়েছিল অবশ্য চতুরা নারী বলে এটা সম্ভব হয়েছে :

কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে।
মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে ॥
মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ মায়।
আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায় ॥
বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে ভায়।
ধর্ম্ম জানে আমি নাহি এ সব কথায় ॥
(অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৯)

Dhaka University Institutional Repository

হীরা মালিনীর বারণ সুন্দর বা বিদ্যা কেউই মান্য করেনি, উভয়েই তার অগোচরে গোপন সুড়ঙ্গ পথে গোপন অভিসারে মত্ত ছিল এর ফলস্বরূপ কাব্যের শেষ পরিণতির দায়ভার হীরা মালিনীকে বহন করতে হয়েছে। তার ঘরে সুড়ঙ্গ কাটার অপরাধে সাজা তাকেই ভোগ করতে হয়েছে, ভর্ৎসনা তাকেই সহ্য করতে হয়েছে :

নষ্টের এ বড় গুণ পিঠেতে মাখয়ে চূণ।
কি দোষ পাইয়া অরে কোটালিয়া
মারিয়া করিলি খুন ॥
... ...
সুন্দর হাসি আকুল মাসী সকলের মূল।
বিদ্যার মাশাশ মোর আইশাশ
পড়ি দিয়াছিল ফুল ॥
কৌতুক না বুঝে হীরা পুনঃ পুনঃ করে কিরা।
কি বলে ডেগরা বড় যে চেগরা
ঐ কথা ফিরা ফিরা ॥
(অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৫ ও ১১৮)

হীরা মালিনী দোষ না করেও সাজা ভোগ করেছে এজন্য পাঠকমনে সহানুভূতি জাগে তার জন্য কিন্তু এই সহানুভূতি কি সেই সমাজের সমাজপতিদের সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পেরেছিল নাকি হীরা মালিনীদের মতো অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের ভাগ্যই এমন ছিল?

'বিদ্যাসুন্দর' আখ্যানে আমরা পূর্ব থেকেই সুন্দরকে দেখেছি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে হাজির হতে। রাজবাড়িতে ফুল তথা ফুলের মালা যোগান দেওয়া মালিনীকে দিয়ে সুন্দরের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে এই আশায় একাকিনী বসবাসরত মালিনীর হাবে-ভাবে 'নষ্টরীত'[৪২] বোঝা সত্ত্বেও সুন্দর সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। সুন্দরের সমস্ত কুকর্ম মালিনীর অগোচরে হয়েছে, এ কথা জানিয়েও মালিনী রেহাই পায়নি। এই চরিত্রের মাধ্যমে একদিকে যেমন অন্ত্যজ নারী জীবনের অসহায় অবস্থার কথা ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি উচ্চশ্রেণির কোপদৃষ্টিতে পড়ে চরিত্রটি তার মৌলিকতা হারিয়েছে যা মধ্যযুগের সমাজের প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যেই পড়ে। 'মালিনী' সম্পর্কিত সমালোচকের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> এদের নিজস্ব ব্যক্তি-সত্তা নেই, তারা অর্থ ও লোভের কীট। নীচ সম্প্রদায়ের রমনী হিসাবে তারা জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে দীক্ষা পায় না। এজন্য সহজে অপরের প্রলোভনের শিকার হয়। মালিনীর এরূপ ভূমিকা রূপকথা ও লোককথায় প্রচুর আছে, বিদ্যাসুন্দর কাব্যে আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসে আছে। এরা নাগরিক জীবনের সঙ্গে মিশে ছল-চাতুরী শিখে। এজন্য বাকপটু হয়।[৪৩]

এই চরিত্রগুলো যে সব-সময় সফল হয়েছে এমন নয়, কারণ সকল কাব্যের কবির পাণ্ডিত্য এক রকম নয়। কাব্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও চরিত্রগুলো ব্যর্থ নয়। জীবনের দূষিত, পঙ্কিল, অন্ধকার দিকের পর্দা উন্মোচন করাই এদের সার্থকতা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘেসেড়ানী : মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলোতে নারীর বিভিন্নমুখী শ্রম বা বৃত্তির মধ্যে 'পতিতাবৃত্তি' বা বেশ্যাবৃত্তির উল্লেখ রয়েছে। পেশাদার 'বারবণিতা' ছাড়াও সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েদেরও এই কাজে প্রবেশ করার ঘটনা ঘটেছে তৎকালীন সময়ে। সাধারণ অন্ত্যজ ঘরের যুবতী মেয়েরাও এসব পেশার সাথে জড়িত ছিল। যৌবনে পা রাখার পর থেকে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এরা পুরুষদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হত। পুরুষেরাও তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অর্থের বিনিময়ে এইসব অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের ভোগ করত।

মধ্যযুগের পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর অবস্থান-মর্যাদা কেবলমাত্র পুরুষের সম্ভোগ ও বিলাসিতার বস্তু ছাড়া কিছু নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে নারীর সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তা মোটেও সুখকর নয়। মঙ্গলকাব্যের নারীরা তাদের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করত, তা তাদের মুখেই শোনা যায়। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে এমনই এক নারীর সন্ধান পাওয়া যায়, যার বয়স পনের-ষোল অথচ পেটের ক্ষুধা মেটানোর জন্য তাকে এগারো পুরুষের যৌনবাসনার সামগ্রী হতে হয়েছে। ঘেসেড়ানী তার নিজ জবানীতে বলেছে :

খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মালমাত্তা উরুদু বাজার ॥
বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজরানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া।।
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে ॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোঁসাই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই ॥
বৎসর পনর ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার ॥
(অন্নদামঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৮)

'ভাত দেয় যে পুরুষ' তাকে 'ভাতার' বলা হয়। এই ভাতের জন্যই নারীকে গ্রহণ করতে হয় 'পতিতাবৃত্তি'র মতো জঘন্য পেশা যার কারণে সমাজ, জাতি তাদেরকে 'পতিত' হিসেবে সমাজে স্থান দেয় না।

'ঘেসেড়ানী'দের জীবন যেমন চলেছে তা দেখে মনে হয় মধ্যযুগের সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর নিশ্চিন্ত জীবনের, নিরাপদ আবাসনের ও আশ্রয়ের সঠিক কোনো স্থান ছিল না। নারীরা নিগৃহীত হয়েছে স্বামীগৃহে, সমাজের ভিতরে ও বাহিরে। পুরুষ-শাসিত এ সমাজে নারীরা চিরটাকাল মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছে বিভিন্নভাবে, তাই বলা যায় মধ্যযুগের সমাজ নারীকে তার যথার্থ সম্মানে সম্মানিত করেনি।

দাসু-বাসু : 'ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে ক্রীতদাস, ঋণদাস ও যুদ্ধদাস ইত্যাদির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তবু ভারতের দাসপ্রথাকে (Slavery) প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দাসপ্রথার মতো মনে করা হয় না। কেননা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দাসেরা মূলত উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হত এবং তারা হস্তান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি (Chattel) ছিল। অপরপক্ষে ভারতের দাসরা তাদের প্রভুর পরিবারে থাকত। এরা প্রধানত

Dhaka University Institutional Repository

গৃহদাস (Domestic slave) বলে পরিচিত।'[৪৪] ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে এরূপ কিছু গৃহদাসের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের বর্ণ, জাতি বলতে এক অর্থেই 'দাস' বোঝায়।

দাসু, বাসু ভবানন্দের দেহরক্ষী হয়ে দিল্লীতে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সমীপে গিয়েছিল। সেখানে বিস্তর বচসা করে, জাহাঙ্গীর কর্তৃক ভবানন্দ বন্দী হলে দুই দেহরক্ষীর যে খেদ তার মধ্যে সাধারণ জীবনবোধ প্রস্ফুটিত হয়েছে। যেমন :

দাসু বলে বাসু ভাই পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকরি পাব বিস্তর পরিব খাব
কোনরূপে পরাণ থাকিলে ॥
যুবতী রমণী আছে না রয়ে তাহার কাছে
কেন আনু বামণের সাথে।
নারী রৈল মুখ চেয়ে তবু আনু মাটি খেয়ে
তারি ফল পানু হাতে হাতে ॥
দিবসে মজুরি করে রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী ॥
নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তারে বড় কেবা আছে দুখী ॥
কান্দিয়া কহিছে বাসু উচিত কহিলা দাসু
এই দুখে মোর প্রাণ কাঁদে।
মরি তাহে দুখ নাই নারী রৈল কোন ঠাঁই
বিধাতা ফেলিল এ কি ফাঁন্দে ॥
(অন্নদামঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯২-৯৩)

দাসু-বাসুর মাধ্যমে কবি সমগ্র অন্ত্যজ শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষের জীবনবোধের কথা বলেছেন যারা সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর গৃহে এসে কী প্রত্যাশা করবে? তারা প্রত্যাশা করবে শান্তি-শ্রান্তির, যা পাওয়া যাবে নারী-পুরুষের চিরায়ত জীবনচর্যার মাধ্যমে।

সাধী-মাধী : *অন্নদামঙ্গল কাব্যে* ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রীর দুই দাসী, সাধী ও মাধীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মানসিংহের কারাগার থেকে মুক্ত ভবানন্দ কাশী হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে শয়নকালে ভবানন্দ কার ঘরে আগে যাবে, এ নিয়ে বড় রানীর দাসী সাধী ও ছোট রানীর দাসী মাধী দু'জনে আপন আপন কূটনৈতিক তৎপরতায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

সাধী–
আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো।
ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো ॥
টেনে টুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো।
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো ॥
দেহুড়ীর কাছে থাক হয়ে দানী গো।

Dhaka University Institutional Repository

ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো ॥
ভারত কহিছে এত জানাজানি গো।
পতি লয়ে দু সতীনে হানাহানি গো ॥
(অন্নদামঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৫)

মাধী–
আগে তাঁরে ঘরে আনি তোমারে ত করি রাণী
তবে সে সতিনী পায় ফাঁকি ॥
এত বলি তাড়াতাড়ি চলিল বাহির বাড়ী
মাধী যেন মাতাল মহিষী।।
চূড়া ছাঁদে বাঁধা চুল তাহাতে চাঁপার ফুল
আঁচল লুটায় মাটি মিশি ॥
(অন্নদামঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৭)

এভাবে ভবানন্দের দুই স্ত্রী এবং তাদের দাসী সাধী ও মাধীর মধ্য দিয়ে সামাজিক মানুষের জীবনচরিত্র বিম্বিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের সময়টাই ছিল দেবতাদের অনুগ্রহের। দেব-নির্ভরতা এবং সামন্তাদেশ একই সঙ্গে এই দুই ব্রত পালন করতে গিয়ে নিজস্ব মতামত প্রদর্শন করার সাহস কবি সাহিত্যিকগণ পাননি। 'সে সময় কবিদের দেবতার অনুগ্রহ নিগ্রহের চিত্রাংকন দ্বারাই মানবজীবনের মানবাতীত দিকটির প্রতি কবিগণকে ইঙ্গিত করতে হতো।'[৪৫] মঙ্গলকাব্যের কবিদের চরিত্র নির্ভরতা অপেক্ষা কাহিনি নির্ভরতার দিকে বেশি আগ্রহ ছিল তারপরও জীবন সম্পর্কে, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন সম্পর্কে নতুন ভাবনা-চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ভারতচন্দ্রের কাব্যে লক্ষ করা যায়। তবে *অন্নদামঙ্গল কাব্যের* অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনাচারণ আরো বেশি জীবনঘনিষ্ঠ হতে পারত সেই সুযোগও হয়তো ছিল। অবশ্য অনেক খ্যাতিমান সমালোচক অন্যভাবে মন্তব্য করেছেন :

> সমাজের এই মারীগ্রস্ত অবস্থায় ধর্মকলহের উত্তেজনা কী বিসদৃশ। ভারতচন্দ্রের মতো বুদ্ধিমান নিপুণ বাক্ মানুষের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। অথচ বলবেন কিভাবে? একমাত্র উপায়, উপায়ান্তরহীন কবি তাকেই অবলম্বন করেছিলেন। ধর্মকাব্যে নবভাবনা ও নব মূল্যবোধের যন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্য কবিকে আজ পর্যন্ত গাল দিচ্ছি।[৪৬]

অন্ত্যজ শ্রেণির অর্থনৈতিক বাস্তবতা, সামাজিক-স্তরবিন্যাস ও জীবনযাত্রার মান উচ্চবর্গ থেকে পৃথক ও বিভক্ত। গ্রামীণ সমাজে এরা যেমন দরিদ্র ও বিপর্যস্ত তেমনি শহরে উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল ও ভবঘুরে। সামাজিকভাবে যারা নিচু বা সাধারণ স্তরের মানুষ; ধর্ম, জাতি, বর্ণে যারা অধস্তন তাদের জীবনের বাস্তবতা, আদিম জৈব-প্রবৃত্তি, নর-নারীর সম্পর্কে প্রচলিত নীতি-শাসন বহির্ভূত আচরণ, সামন্তবাদের অত্যাচার, শোষণ-শাসন ও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে উঠে এসেছে প্রতীকীরূপে কারণ পূর্বেই বলেছি সময়টি ছিল দৈবানুগ্রহের। তবে এ কথা সত্য যে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের মুখ দিয়েই কবি মানবতার জয়গান গেয়েছেন উচ্চবর্গ বা উচ্চশ্রেণির মানুষকে এতোবড় মর্যাদা তিনি দিতে সম্মত নন। অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনাচার, সংস্কার ও জীবন-যাপনের রীতি-পদ্ধতির আড়ালে প্রচ্ছন্নরূপে দেখা যায় মানবতার হাস্যোজ্জ্বল রূপ যা সমগ্র মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে অনুপস্থিত। কবির প্রার্থনা :

Dhaka University Institutional Repository

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥
(অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৭)

এই অমোঘবাণী সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে ভারতচন্দ্র উৎসর্গ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ :

১. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, *ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ* (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৫৬), পৃ. ৭

২. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক্-পলাশী বাংলা* (কলকাতা : কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২), পৃ. ১৪

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৪. উমা সেন, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ* (কলকাতা : ১৯৭১) মুখবন্ধ, পৃ. ২

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

৭. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা:), *মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান* (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলা বাজার, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফাল্গুন , ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), (ভূমিকাংশ)

৮. গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী, *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৫/ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯), পৃ. ১০০

৯. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ , মাঘ ১৪০২/ জানুয়ারি ১৯৯৬), পৃ. ৩৫

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

১১. বাসুদেব রায়, *চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট, জুন, ২০০৫), পৃ. ২০৪

১২. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১৮

১৬. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা:), *শাক্ত পদাবলী, রত্নাবলী* (কলকাতা : ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৯৯৯), পৃ. ১৯

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

১৮. *প্রাক্-পলাশী-বাংলা* পৃ. ১১৯-২০

১৯.গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ* (কলকাতা : সুবর্ণ রেখা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩),পৃ. ১

২০. ইরফান হবিব, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯১), পৃ. ১১১

২১. (নিউইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন; জুন ২৫, ১৮৫৩; কার্ল মার্কস, *আর্টিকলস অন ইন্ডিয়া* বোম্বাই ১৯৫১), পৃ. ২৮-২৯ (পুনর্মুদ্রিত)

Dhaka University Institutional Repository

২২. Robert Orme : *Historical Fragments of the Moghal Empire* Vol. 1, p. 263

২৩. তোফায়েল আহমদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৯৯/ জুন ১৯৯২), পৃ. ১১

২৪. বিনয় ঘোষ, *বাদশাহী আমল* (ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের ট্রাভেলার্স *ইন দা মুঘল এম্পায়ার* অবলম্বনে রচিত), (কলকাতা : ১৮৭৯ শকাব্দ), পৃ. ২৪২

২৫. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৪২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬৫৮

২৬. S. C. Hill , *Bengal in 1856-57* Vol. III, p. 160 (foot-note)

২৭. Muhammad Ishaque , *The Romance of East Bengal* (Dacca : First edition, Bangla Bazar, 1957), p. 1

২৮. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪

২৯. পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, *ঘনরাম চক্রবর্তী : শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ খ্রি.) ভূমিকা, পৃ. ২

৩০. সুরেন্দ্রনাথ সেন , *ডাকাতের জেলা* (ঢাকা : ঢাকা রিভিউ, ২য় খণ্ড, কার্তিক-চৈত্র, ১২শ সংখ্যা, ১৩২১ সাল), পৃ. ৪০০

৩১. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সমাজতত্ত্ব* (কলকাতা : প্রথম সংস্করণ ২০০০) পৃ. ৬২

৩২. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল* (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ ২০০১), ভূমিকা, পৃ. ১১

৩৩. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

৩৪. মুখলেসুর রহমান, *মাতৃকা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯), পৃ. ৩৬

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৩৬. অনীক মাহমুদ, *চিরায়ত বাংলা ভাষা সংস্কৃতি রাজনীতি সাহিত্য* (ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০০), পৃ. ১১৯-১২০

৩৭. *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* পৃ. ৭৯৮

৩৮.শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ চরিত্র* (কলকাতা : পুঁথি, প্রথম সংস্করণ ১৯৯২), পৃ. ১১০

৩৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী* (প্রথম ভাগ), (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মাঘ ১৩৪৯), পৃ. ২১৫

৪০. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র* (কলকাতা : পুঁথি, দ্বিতীয় সংস্করণ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬), পৃ.৫৬

৪১. *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* পৃ. ৮২২

৪২. *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী* ২য় খণ্ড, পৃ. ২০

৪৩. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান* (ঢাকা : ১৯৮৭), পৃ. ২৫৭

৪৪. রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস* (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারীদাস রোড, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট ২০০৯), পৃ. ৪৩

৪৫. অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৪৬. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *কবি ভারতচন্দ্র* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০০/মাঘ ১৪০৬), পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় :

ধর্মমঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

নৃপতি চাকর বল্যা না করে তল্লাস ॥
আমার সঙ্গতি আছে তের ঘর ডোম।
বলে ইন্দ্রজিত রণে বিশাল বিক্রম ॥
কপাল প্রসন্ন নয় কালে কষ্ট পাই।
কান্তা বুনে কুলা পেথ্যা তাহা বেচ্যা খাই ॥
শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ।
হাণ্ডা দশ হল্যে হয় উদর পূরণ ॥
ছেড়া কানি পরিধান জুড়ে নাঞি বাস।
আপুনি পরিচয় দিবে এই অভিলাষ ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩১০)

ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষকরে হিন্দু সমাজে বর্ণপ্রথার সঙ্গে জীবিকার একটি সম্পৃক্ততা আছে যা বংশানুক্রমিক জীবিকার সঙ্গেও জড়িত। মালিরা সাধারণত বাগান পরিচর্যা করে, ফুল ফোটায়। মালিদের স্ত্রীরা মালিনী নাম ধারণ করে। 'গ্রাম বাংলায় মালি বৃত্তিতে যারা নিয়োজিত আছে, তাদের মালাকার বলা হয়।'[৫] এরা অর্থনৈতিকভাবে অন্ত্যজ। উল্লেখ্য গবেষণাকর্মে দুই পর্যায়ের অন্ত্যজ নিয়ে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। জন্মগতভাবে অন্ত্যজ, জন্ম-পরিচয় যাদের অন্ত্যজ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে ; অপরদিকে অর্থ, প্রতিপত্তির দিক থেকে যারা দুর্বল, অধিকারহীনা তারাও অন্ত্যজ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যগুলোতে 'মালিনী' খুবই পরিচিত নাম। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে কালকেতুকে দিয়ে গুজরাট নগরীতে মালিদের অবস্থান নির্ণয় করে দিয়েছেন :

মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে
মালা মউড় গড়ে ফুলে ঘর
ফুলের পুটলি বান্ধে সাজি দণ্ড করি কান্ধে
ফিরে তারা নগরে নগর।[৬]

বিজয় গুপ্তের *পদ্মাপুরাণে* লখিন্দরের বিবাহ-যাত্রায় 'নয়শত মালি'র সঙ্গী হবার সংবাদ পাওয়া যায়। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যেমন :

সাজে নাই সুন্দর শরীরে শুধু গলা।
মালির ভবনে যাই পরি গিয়ে মালা ॥
বলে এত বাঘটা ব্যানন্দ হৃদয়।
মালির ভবনে এল সন্ধ্যার সময় ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৯১)

মালি বা মালাকার দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ভূঁইমালি ও ফুলমালি। ভূঁইমালিদের কাজ বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা এবং আবর্জনা দূর করা। জমিদারি প্রথার উদ্ভব ও বিকাশের সাথে এই বৃত্তির লোকদের আবির্ভাব বলে ধারণা করা হয়।[৭] সুতরাং জমিদারশ্রেণি যেহেতু তিরোহিত হয়েছে সেহেতু এই মালাকার শ্রেণির অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়েছে। বর্তমানে ভূঁইমালিদের অনেকেই হাটে-বাজারে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করছে, ঝাড়ু তৈরি করে বাজারে বিক্রি করছে অথবা বাজার চলাকালে দোকানিদের কাছে থেকে 'তোলা' নিয়ে জীবন-ধারণ করছে। এক্ষেত্রে বলা সমীচীন যে, এই শ্রেণিটি সামাজিক অন্ত্যজ পর্যায়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূঁইমালিদের থেকে ফুলমালিরা একটু উপরে অবস্থান করছে কারণ এদের কাজই এদের সম্মান নির্ধারণ করেছে। এদের কাজ বাগান তৈরি করা এবং ফুলের পরিচর্যা করা। কখনও কখনও ফুলমালিরা একই মালিকের গৃহে বংশানুক্রমিকভাবে কাজ করে থাকে। ফুলমালি বাগান থেকে ফুল সংগ্রহ করে ধনী গৃহে বা বিভিন্ন পূজামণ্ডপে বা অনুষ্ঠানাদিতে ফুল বা ফুলের মালা সরবরাহ করে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে এই সম্প্রদায়কে ফুলের পসরা সাজিয়ে হাটে-বাজারে বিক্রয় করতেও দেখা যায়। জীবিকা নির্বাহের জন্য এই পেশাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানুষ ফুল ভালবাসে, যুগে যুগে এর কদর ছিল, থাকবে। সুতরাং মালি বা মালাকার শ্রমজীবীদের মধ্যে অন্যতম– এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[৮]

বারুইদের কাজ পান চাষ করা। তাদের উৎপাদিত পান বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। প্রাচীনকাল থেকে এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছে কৃষিজীবী এই সম্প্রদায়। *কালকেতু উপাখ্যানে* কালকেতুর গুজরাট নগরে বারুইরা বসতি স্থাপনের পর নিত্যদিন মহাবীরের নিকট পান পাঠানোর কথা বলেছেন কবিকঙ্কণ :

বারুই বসিয়া পুরে বরজ নির্ম্মাণ করে
মহাবীরে নিত্য দেই পান।
বলে যদি কেহ লেই বীরের দোহাই দেই
অনুচিত না করে বিধান ॥[৯]

মানিকরাম গাঙ্গুলির *ধর্মমঙ্গল কাব্যে* 'বারুই পাড়া' নামে একটি পালা আছে সেখানে বারুইশ্রেণির মানুষের জীবনযাপন প্রণালীর একটি সচিত্র সংবাদ পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়।

পান-সুপারি বিক্রি করে তাম্বুলীরা। গ্রামীণ হাট বাজারগুলোতে আজও পান 'বিড়া' দরে বিক্রি হয়ে থাকে। সাধারণত ৮০টি পানে এক 'বিড়া' হয়। তাম্বুলীরা পানের সাথে সুপারি, চুণ, খয়ের, এমনকি সুগন্ধি কর্পূরও দিয়ে থাকে। মানিকরাম গাঙ্গুলি *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে তাম্বুলীদের পানের সাথে 'তামাক' জাতীয় নেশাযুক্ত দ্রব্য বিক্রয়ের কথাও বলেছেন। কবি নাপিত সম্প্রদায়কে 'নরসুন্দর' বলেছেন। সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকে নাপিত সম্প্রদায় স্ব-বৃত্তিতে বর্তমান। সামাজিক মর্যাদায় নাপিত অস্পৃশ্যদের তুলনায় একটু উপরে অবস্থান করে। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে আমরা দেখতে পাই লাউসেনের জন্মসংবাদ নাপিত, কর্ণসেনের আদেশে গৌড়েশ্বরের দরবারে নিয়ে যায়। সংবাদ শুনে নৃপতি নাপিতকে নানা ধনে পুরস্কৃত করেন। এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগের সমাজে নাপিত চুল, দাড়ি কামানো ছাড়াও জন্ম-মৃত্যু, বিবাহাদি অনুষ্ঠানের সংবাদ বহন করত। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে দেখা যায় নাপিত গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন চলে যাচ্ছে ঠিক তখন :

নাপিত বিদায় হয়্যা নৃপতির স্থানে।
গমন করিল সুখে ময়না অয়নে ॥
হেন কালে মাহুদ্যে মন্ত্রণা করে মনে।
অবিলম্বে আজ্ঞা দিল অনুচরগণে ॥
নরসুন্দর নরাই নগর হতে পার।
সকল লইল কেড়্যা করে তিরস্কার ॥
লাথালোথা চড় চাপড় ধাকা ধোকা মেরে।
রেখে আইল্য নিরাগসে পদ্মাপার করে ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১০৫)

Dhaka University Institutional Repository

রাজকর্মচারীদের দৌরাত্ম্যের কারণে নিম্নশ্রেণির মানুষ পদাঘাত সহ্য করেছে এই ঘটনাটি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে প্রায় সব কবিই কর্মকার বা কামার সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন। বাংলাদেশের এমন কোন গ্রাম পাওয়া যাবে না যেখানে কামার শ্রেণির অস্তিত্ব নেই। কামার লোহা পুড়িয়ে, দা, কুড়াল, কোদাল, শাবল, বটি, পেরেক, জালের কাঠি, ছুরি, রামদা, বল্লম, লেজা, সরকি, সরতা, কাস্তে, কাঁচি, বাইশ, বাঁটল, বাঁদা ইত্যাদি তৈরি করে।[১০] বিজয় গুপ্তের *পদ্মাপুরাণে* কর্মকারের ভূমিকা ব্যাপক।

মনসার কোপ থেকে লখিন্দরকে রক্ষা করার জন্য চাঁদ সদাগর লোহার বাসর ঘর তৈরির জন্য চৌদ্দশত কামার নিয়োগ করেন। এই শ্রেণির মানুষ শ্রমজীবী অথচ সমাজের নিম্নস্তরে বসবাস করে। উচ্চবিত্তের সৌখিনতায় তাদের শ্রম আছে, শ্রদ্ধা নেই, সততা আছে, ভোগ নেই অথচ বিরামহীন কষ্টে তাদের চলে জীবন-সংগ্রাম। কামারদের উদোম গা, পরিপাটহীন চুল, হাতে লোহার হাতুড়ি, বা-হাতে দাড়িপাল্লা, পরিধানের বস্ত্রটি কালিময়, নাকে মুখে আগুনের ঝলসানো ছাপ, দেখতে অনেকটা বিকৃত স্বভাবের। বেহুলার বাসরঘর তৈরিতে কামারশ্রেণি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রকৃত শ্রমশিল্পীর পরিচয় প্রদান করে। এজন্য আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদগণের মতে কর্মকার আজও শ্রমশিল্পী হিসেবে স্ব-বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে কামার বা কর্মকার শ্রেণিকে অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির মানুষ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। যেমন :

এথা কামারের কান্তা উঠিয়া প্রত্যূষে।
গৃহকর্ম কৈল রামা গদগদ আবেশে ॥
কোলে করে সেই শিশু কুতূহল চিত্তে।
দুগ্ধ দেই ঐমনি দাণ্ডায়ে রাজপথে ॥
সেই পথ দিয়া যায় রাজার কোটাল।
কার শিশু কোলে তোর কহিবি তৎকাল।
কালিরাত্রে চুরি গেছে রাজার নন্দন।
নয়তো সর্বনাশ হবেক এখন ॥
কামারকামিনী কয় কাতর অন্তরে।
দিয়া গেছে এই শিশু এক দ্বিজবরে ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১১১)

মধ্যযুগে ইট পোড়ানোর কাজটি কুমারদের দ্বারা সম্পন্ন হত। *ধর্মমঙ্গল কাব্যে* কুমার শ্রেণির কথা উল্লেখিত হয়েছে।

'কুলু' বা 'কলু' তেলিদের মতো তেল উৎপাদনকারী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মানিকরাম গাঙ্গুলি *ধর্মমঙ্গল কাব্যে* 'কলু' সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন :

বাঘ বলে বিশ্বমাতা বর দিয়ে গেল।
মাংস খেয়ে মনের মহৎ সুখ হল ॥
তৈল বিনে তনুতে কেবল উড়ে খড়ি।
কল্য হই কাল যাব কলুদের বাড়ি ॥
বলে এত বাঘটা বিটপী তলে শুল।

Dhaka University Institutional Repository

অহমুখে উঠিয়ে কলুর বাড়ি এল ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৯১)

'গোয়ালা' সামাজিকভাবে গো-প্রতিপালক বা গোয়াল বা গোপ নামে চিহ্নিত হয়ে আসছে। গোয়ালা সম্প্রদায়কে 'আভীর' জাত হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। 'গোয়ালা' সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রথম বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে*। সেখানে নন্দ-যশোদা, আইহন-রাধিকা সকলেই গোয়ালা সম্প্রদায়ভুক্ত। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যেও গোয়ালার উল্লেখ আছে :

ঐছনে আনন্দে অঙ্গ অবশ হইয়ে।
নিধুবনে নৃত্য করে গয়ালার মেয়ে ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৯৯)

পূজা-অর্চনা ও পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে 'বাইতি' মঙ্গলসূচক বাদ্য পরিবেশন করে থাকে। রাজা কর্ণসেনের স্ত্রী রঞ্জাবতী পুত্র লাভের আশায় পাত্র-মিত্র, ভক্ত ও সখীদের নিয়ে চাপাইয়ের কুলে যখন শালে ভর দিতে যান, তখন সঙ্গে নিয়েছিলেন 'বাইতি' হরিহরকে। 'হরিহর' মঙ্গলকাব্যের একটি ক্ষুদ্র চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও তার উপস্থিতি পাঠক হৃদয়কে স্পর্শ করে। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে হরিহর বাইতির উপস্থিতি লক্ষণীয় :

পুরোহিত দিবাকর মনোরথ কপিলা।
হরিহর বাইতি আদি যে কেহ আছিলা ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৫৩)

শুঁড়ি বা সৌগণ সমাজ বহির্ভূত এক 'অন্ত্যজ' শ্রেণি। এদের পেশা মদ চোলাই, সুরা তৈরি ও বিক্রি করা। মাদকদ্রব্য তৈরি সমাজ-গর্হিত কাজ বিধায় তারা সমাজ থেকে পরিত্যক্ত। পরিত্যক্ত হলেও সমাজের নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত পর্যন্ত সকল মাদকাসক্ত মানুষের সাথে শুঁড়িদের সম্পর্ক বর্তমান। বেশিরভাগ সময় দোকানে শুঁড়ি রমণীরা মদ বিক্রি করত এবং ক্রেতাগণ সেখানে বসেই মদ পান করত। মদের দোকানগুলো গভীররাত পর্যন্ত খোলা থাকার কারণে শুঁড়ি রমণীরা অনেক সময় মাতালদের আক্রমণের শিকার হত। এর ফলে শুঁড়ি রমণীদের জীবনযাপন প্রণালী যে স্বাভাবিক মানুষের ন্যায় ছিল এমনটি বলা দুষ্কর। *ধর্মমঙ্গল কাব্যে* এই 'অন্ত্যজ' শ্রেণিটির উপস্থিতি অনেক বেশি স্পষ্ট। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

হাতী লয়্যা মাহুত হুকুম পেয়্যা চলে।
শহরের সাতকড়ি শুঁড়িকে গিয়ে বলে ॥
হুকুম দিলেন তোকে পাত্র মহারাজা।
সদ্য কর্যা সাত ঘড়া সুরা দিবি তাজা ॥
বক্সিস বিস্তর পাবি কালি টাকাকড়ি।
শুভকথা শুনিয়া শুঁড়ির দড়বড়ি ॥
যার যে স্ববৃত্তি তার আছে তায় ত্বরা।
সদ্য দিল চুয়াইয়া সাত ঘড়া সুরা ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ২৯৭)

সংস্কৃত শব্দ 'চোর'-এর ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদে' প্রথম লক্ষ করা গেছে। যেমন :

১. সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই

Dhaka University Institutional Repository

তা দেখে কর্পূর কিছু লাউসেনে কয় ॥
বৈউশ্যা মাগীর হাতে খেতে হল্য ভাত।
এতদিনে বাম হৈল বৈকুণ্ঠের নাথ ॥
এই ছিল কপালে অহেতু গেল জাতি।
মরি এস্য দুভায়ে গলায় দিয়ে কাতি ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ২৬৭)

অন্ত্যজ এই শ্রেণির হাতে অন্ন ভক্ষণ করলে জাত চলে গেল বলে দু'ভাই আত্মহত্যা করতে চায়। এ থেকে বোঝা যায় যে জাত চলে যাওয়ার চেয়েও মৃত্যু ভাল, এজন্য মৃত্যু কামনা করছে কর্পূর।

মানিকরাম গাঙ্গুলি *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের সপ্তম পালায় বৃহৎ পরিসরে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের এক ফিরিস্তি প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে জাতিগত ভাবে সবাই অন্ত্যজ পর্যায়ের না হলেও সমাজ তাদের অন্ত্যজ করে রেখেছে। মানিকরাম গাঙ্গুলি 'জাত' বিচারে উঁচু-নিচুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করে গোলাহাটের সুরিক্ষা নটিনীর গৃহের বর্ণনায় কর্পূরের মুখে বাণী তুলে দিয়েছেন, যেখানে জাতির বিচার নাই–সব একাকার হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

বার জন ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বিচক্ষণ।
পাক কর্য়া পিতাবধি যোগায় ওদন ॥
উঠে বসে বচন বলিতে নারে কিছু।
পাগলের মত হয়ে বুলে পাছু পাছু ॥
সন্ধ্যা গায়ত্রী সব গেছে সুরিক্ষার ঠাঁই।
ইষ্টপূজা কৃষ্ণভক্তি কিছুমাত্র নাই ॥
একজন ক্ষেত্রী আছে আসন জোগায়।
চারিজন বৈশ্য তারা চামর ঢুলায় ॥
সৎ শুদ্র দুজন দর্পক বান আছে।
দাঁতে কুটা দণ্ডব্য দাণ্ডাইয়া কাছে ॥
সাতজন কায়স্থ কাগজ লেখে সদ্য।
চিকিৎসা চেষ্টায় আছে চারি জন বৈদ্য ॥
দুই জন দৈবজ্ঞ দিবসে পাতে খড়ি।
রাত্রি হলে রাতুল চরণে গড়াগড়ি ॥
নয় জন নাপিত নিযুক্ত নিজ কাজে।
মাখায় চন্দন চুয়া মত্ত মনসিজে ॥
আট জন অনুরক্ত আছে মালাকার।
মিনি সুতে মালতীর গেঁথে দেয় হার ॥
পাঁচ জন পোদ্দার পরক করে কড়ি।
নজন কুমার আছে নিত্য দেয় হাঁড়ি ॥
প্রেমে বদ্ধ হয়েচে মোদক পাঁচ ভাই।
মনোমত কর্য়া দেয় মুড়কি মিঠাই ॥

Dhaka University Institutional Repository

অনুগত একজন আছে কর্মকার।
নটিনী মাগীর তরে গঠে অলঙ্কার ॥
তিন জন তাঁতি আছে জোগায় বসন।
কাটকুটা কর‍্যা দেয় ছুতার ছয় জন ॥
বার জন বারুই জোগায় তারা পান।
মন্দ বলে মুদ্রা করে তাকে নাই মান ॥
আট জন ধোবা আছে ধৌত করে বাস।
পদধূলি পাব বল্যা মনে অভিলাষ ॥
বার জন গুয়ালা বিক্রীত পদতলে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত দেয় ভোজনের কালে ॥
চারি জন চাষা আছে তিনজন তেলি।
কেহ ঘর ছায় কেহ পাকায় বিচালি ॥
তিন জন কলু আছে তৈল দেয় নিত্য।
হেরিয়ে নটিনী রূপ হরষিত চিত্ত ॥
একজন বেন্যা আছে অতি বিচক্ষণ।
যাজ্ঞবল্ক্য জায়ফল জোগায় তখন ॥
যুগল তামুলি আছে তামুক জোগায়্যা।
চিত্তের সন্তোষ পায় চাঁদমুখ চেয়্যা ॥
দাস আছে দুজন দিবসে লয়ে জাল।
মৎস্য ধর‍্যা জোগায় মৃগাল শোল শাল ॥
একুনে ছকুড়ি জাতি ছটী আর বাড়া।
লেখা করে দেখ দাদা তুমি আমি ছাড়া।
নটী বেটী সাক্ষাৎ মোহিনী অবতার।
জেতের বিচার নাই সবে একাকার ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ২৪৬-২৪৮)

ধর্মঠাকুর আদিতে ডোম জাতির একান্ত দেবতা ছিলেন, পরে তার পূজাক্ষেত্র প্রসার লাভ করেছে অর্থাৎ অন্যান্য বহুজাতি ধর্মঠাকুরকে উপাসনা করেছেন। বর্তমানেও বিশেষভাবে রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুরের অধিকাংশ মন্দিরে বা থানের পুরোহিত বা সেবায়েৎরা ডোম এবং বাংলার বহুস্থানের ডোমরা ধর্মঠাকুরকেই মাত্র উপাসনা করেন।

দু' একজন গবেষক বলেছেন,[১৪] 'ডোম' শব্দ থেকে 'ধর্ম' শব্দ এসেছে, কী প্রকারে সে বিষয়েও তাঁরা দেখাবার চেষ্টাও করেছেন... ডোমদের উপাস্য– 'ডোমরাজ', ডোমরাজ থেকে ডোমরা (যেমন 'যমরাজ' থেকে যমরা চলিত শব্দ হয়েছে) এবং ডোমরা থেকে 'ধরমা' আর 'ধরমা' থেকে 'ধর্ম' এসেছে। বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাতত্ত্বে শব্দবিকারের যে বৈজ্ঞানিক রীতি আছে সে রীতিতে হয়ত এই বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটেনি, ইহা হয়েছে চলিত কথার রূপান্তর অনুসারে। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ডোমজাতির সম্পর্ক বহু প্রাচীন কালের। প্রায় সকল ধর্মমঙ্গলে ডোমজাতির প্রাধান্য বর্ণিত দেখা যায় ধর্মঠাকুর পূজায় আদি প্রচারক (কেহ কেহ বলেন প্রবর্তক) রামকানাই পণ্ডিত ছিলেন জাতিতে ডোম, তিনি খ্রিস্টীয় ১০০০ শতাব্দীতে (মতান্তরে খৃ. ১৫০০ শতকে) ধর্মের সেবক ছিলেন।[১৫]

ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি বর্তমান সময়ে কৌতুক বোধ হয়; সে-কৌতুক কাব্যের জন্য নয়, গ্রাম্য উদ্ভটতা ও সামাজিক আবর্তন-বিবর্তনের জন্য। সামাজিক বিচারে ধর্মঠাকুর অন্ত্যজ শ্রেণির পূজ্য দেবতা, তাই অন্ত্যজ শ্রেণির আচার-ব্যবহার সবকিছুই এই কাব্যে স্থান পেয়েছে। মানিকরাম গাঙ্গুলি 'জাতি যাওয়ার ভয়' পেয়েও কাব্য রচনা করে দেখলেন জাতি আর গেলনা কেননা ব্রাহ্মণ বংশের কবি যখন জাত-ব্যবস্থার ত্রুটি খুঁজতে উদ্যত হয়েছেন তখন জাত আর যাবে না এটাই সত্য তবে *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের কবিরাও অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ তিনজন, কৈর্বত ও শুঁড়ি পাওয়া যায় একজন করে। আসলে অন্ত্যজ শ্রেণির পক্ষে লেখাপড়া শেখা অসম্ভব ছিল তাই তাদের মধ্যে শিক্ষিত কবি পাওয়া গেল না। সামাজিক প্রেক্ষাপটে *ধর্মমঙ্গলের* কবি ও কাব্য দুয়েরই থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব ধর্মপূজার ও ধর্মমঙ্গল কাহিনির, কারণ এই দুই উপকরণ দ্বারাই বাঙালির রহস্যাবৃত জাতিব্যবস্থার পর্দা উন্মোচন সম্ভব। সুতরাং এই পরিচ্ছেদে সমাজের অন্তে যাদের বসবাস তাদেরকে অন্ত্যজ বলা হল, সামাজিকভাবে যারা অধস্তন তারাই সামাজিক অন্ত্যজ পর্যায়ের, বিষয়টি বিশ্লেষণযোগ্য বলেই পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন

মানিকরাম গাঙ্গুলির *ধর্মমঙ্গল কাব্যে* অষ্টাদশ শতকের ছবি চিত্রিত হয়েছে। সেই সময়কার বাংলা সাহিত্যের যে রূপ পাওয়া যায় মানিকরামের কাব্যেও তা বর্তমান। কলিযুগের অনাচারের যে 'ফরদি' মানিকরাম দিয়েছেন তাতে করে সে-যুগের একটা সমাজচিত্র পাওয়া যেতে পারে। রাজ্যে যে বিশেষ সুখ-শান্তি ছিল এমন বলা যাবে না। 'রাজার মঙ্গল হলো রাজ্যের মঙ্গল'–মানিকরাম বার বার এ কথা পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয় দেশ থেকে লোক পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করেছে। এ ধরনের চরম দুঃসময়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন মানিকরাম গাঙ্গুলি স্বয়ং। সুতরাং রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে আদর্শ রাজার আকাঙ্ক্ষা মানিকরামের মতো সকল মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। গৌড় রাজদরবারের যে ছবি মানিকরাম প্রকাশ করেছেন তাতে ঐতিহাসিকতা না থাকলেও রাজসভার বর্ণনা প্রমাণ করে অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি রাজসভার বর্ণনা করেছেন যা ছিল সম্পূর্ণরূপে সত্য ও অকাট্য। তখনকার রাজসভায় শাস্ত্র আলোচনা চলত। শাস্ত্র আলোচনার দায়িত্ব পড়ত ব্রাহ্মণদের উপর কারণ শাস্ত্র অনুযায়ী তারা শ্রেষ্ঠ। *ধর্মমঙ্গলে* আছে :

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিজাতি।
সৃজিলেন অপর বিস্তর প্রজাপতি ॥
বিদিত পুরাণ কত কহিব বিস্তারে।
হিমাদ্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ২৭)

সভায় পুরাণ পাঠ করত ব্রাহ্মণ পাঠক। মানিকরাম গাঙ্গুলি *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে তা স্পষ্ট করে বলেছেন :

সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ।
অনিরুদ্ধ উপাখ্যান ঊষার হরণ।।
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩১৯)

কবি অন্যত্র বলেছেন :

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বেড়ে চণ্ডীপাঠ করে ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১২৪)

পুরাণ ইত্যাদির সঙ্গে 'রায়বার'ও পড়া হত। ভাটেরা এসে এই 'রায়বার' পড়ত। 'ভাট' শব্দের আভিধানিক অর্থ স্তুতি বা বন্দনাকারী। সংস্কৃত 'ভট্ট' শব্দ থেকে 'ভাট' শব্দের উৎপত্তি। ভাটের কাজ ছিল রাজার বন্দনা করা। গৌড়েশ্বরের রাজ্যে আরও যারা ছিলেন তারা হলেন :

অধ্যা হল্য সমাপ্ত পাঠক পুথি বাঁধে।
ভাট পড়ে রায়বার পিঙ্গল সুছন্দে ॥
কারকুন মুহরি কাগজ লয়্যা বসে।

Dhaka University Institutional Repository

মোখাদিম মণ্ডল মজুত আশপাশে ॥
বারভূঁয়া বস্যা আছে বুকে দিয়া চাল।
শোভে সব রাউত সম্মুখে সমকাল ॥
জয়সিংহ জমাদার কোটাল জীবন।
শিবরাম শিকদার সর্দার সনাতন ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩২০)

কারকুন মুহুরি মামলা-মোকদ্দমার কাগজপত্র পরীক্ষা করত। বড় বড় রাজকর্মচারী রাজাকে ঘিরে বসত। এদের বিশেষ কোনো বিবরণ মানিকরাম দেননি। মোখাদিম, মণ্ডল, বারভূঞারা রাজার বিভিন্ন কার্যের সহায়ক। জমাদার, কোটাল, শিকদার, সর্দারের উল্লেখও রাজসভার বর্ণনাতে আছে। মহাপাত্র মাহুদ্যা রাজার বামপাশে বসতেন। *ধর্মমঙ্গলের* একাদশ পালায় গৌড় রাজার দরবারের আরও একটি দৃশ্য :

বরাসনে বারামে বসেচে গৌড়ের রাজা।
রাবণের প্রতাপ রবির সম তেজা ॥
বারভূঞা বাহাত্তরি বসিল মণ্ডল।
দাণ্ডাইয়া দুপাশে দক্ষিণ দলবল ॥
কোটাল আদেশ আগে কয় করজোড়ে।
রায়বার পড়ে ভাট রাজার নিয়ড়ে।
কুলীন ব্রাহ্মণ কত শ্রোত্রিয় আর।
সভায় বসিয়া করে শাস্ত্রের বিচার ॥
সভাগণ সচেষ্টিত সম্মুখে সকাজ।
অমরাবতীতে যেন ইন্দ্রের সমাজ ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৪০৯)

আলোচ্য বক্তব্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে রাজদরবারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দের অবস্থান উচ্চ আসনে ছিল। অন্যদিকে চতুর্বর্ণের বাকি দুই বর্ণ বৈশ্য ও শূদ্রদের প্রতিনিধির কথা বলা হয়নি। অমরাবতীর ইন্দ্রের সমাজে তাহলে কী তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল? এর উত্তরে বলা যায় মধ্যযুগীয় বাংলার সমগ্র সমাজ ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। একটি অভিজাত অপরটি অনভিজাত।[১৬] হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জন্য এটি সমভাবে প্রযোজ্য ছিল।

ভারতীয় শাস্ত্রকথা অনুসারে একথা মনে করা হয় যে, আদি যুগে কোনকিছুই ছিল না; অনাদি যুগে সৃষ্টি হয়েছে উদ্ভিদ। দিব্য বা তৃতীয় যুগে ছিলেন শুধু হাড়িরাম–আর কেউ নয়। তার হাই থেকে সৃষ্টি হল হৈমবতী বা প্রথম নারী, যার থেকে সৃষ্ট হল আদি দেবতারা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, যারা পুরাণ বর্ণিত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের পবিত্র এবং সেই সঙ্গে অপবিত্র ইতিহাসেরও পথ-নির্দেশক।[১৭] হাড়িরামকে স্মরণ করার অর্থ হল মরণশীল জীবনের নিষ্কৃতির পথ-সন্ধান, যে পথে পৌঁছানো যায় সেই সময়টি প্রাগৈতিহাসিক যখন হাড়ি ছিল মহান, শুদ্ধ এবং পূজনীয়। এই সৃষ্টিতত্ত্বের রূপটি কিন্তু সেই একই, যা আমরা বাংলার বেশিরভাগ জনপ্রিয় ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির সাহিত্যেই পেয়ে থাকি, যার আদর্শরূপ দেখতে পাওয়া যায় শূন্যপুরাণে।[১৮] সেখানে দেখা যায়, সব যুগের আগে আছে আর একটি যুগ, যখন কোথাও কিছু নেই, সর্বোত্তম ঈশ্বর বিচরণ করছেন শূন্যে। এরপর করুণাবসে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন আরেকটি চরিত্র, নাম যার নিরঞ্জন; এবং যার হাই থেকে জন্ম নিল উলুক পাখি। এরপর ঈশ্বরের

Dhaka University Institutional Repository

ঘাম থেকে নারীরূপে জন্মাল আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি থেকেই জন্ম নিলেন তিনজন দেবতা–ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব।

ধর্মপুরাণে যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে তা সংস্কৃত পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। অনুমিত হয় যে এদেশের প্রাচীন অনার্য আদিবাসীদের শাস্ত্রে অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি প্রচলিত ছিল। 'ঋগ্বেদের নাসদীয় সুক্তে বর্ণিত সৃষ্টির আদিকথার সঙ্গে ইহার কিছু মিল আছে।'[১৯] *ধর্মপুরাণে* কথিত সৃষ্টি কাহিনি সংক্ষিপ্তাকারে বলার প্রয়োজন মনে করছি, "সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না, শুধু ছিল শূন্য। শূন্যরূপ সনাতন ব্রহ্ম তখন জগৎসৃষ্টি করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। তার ইচ্ছার ফলে অকস্মাৎ এক বৃহৎ বুদ্বুদের সৃষ্টি হল। ডিম্বাকৃতি বিম্বুর ভিতরে প্রবেশ করে শূন্যরূপী ধর্মভ্রূণে পরিণত হলেন এবং কালক্রমে পরিণত আকার ধারণ করে বিম্বভেদ করে বের হলেন। বের হয়ে তিনি বিপদের সম্মুখীন হলেন ভর করার জন্য তার স্থান নির্মাণের প্রয়োজন হল। তার পূর্বে তিনি আদ্যাশক্তিকে সৃষ্টি করে তাকে বিবাহ করলেন। বিবাহ করেই ধর্মের তপস্যা করতে ইচ্ছে হল। তিন-কোণ পৃথিবীর দুইভাগ ছেড়ে একভাগে মধ্যস্থলে তিনি 'বল্লুকা' নদীর সৃষ্টি করলেন। অনাদ্যদেব তখন বল্লুকার জলে যোগ-ধ্যানে বসলেন; বাহন উলুকও বটগাছের ডালে বসে যোগসাধনা করতে লাগল। এদিকে অনাদ্যের বিরহে অদ্যাদেবী চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। তার চিত্ত-চাঞ্চল্য হতে কামের জন্ম হল। দেবী কামদেবকে বল্লুকায় পাঠিয়ে দিলেন ধর্মের ধ্যানভঙ্গ করতে। কামের প্রভাবে ধর্মের ধ্যানভঙ্গ হল। অকালে তপস্যাভঙ্গ হওয়ায় 'বল্লুকায় কালকূট বিষ উপজিল।' উলুক মাটির ভাঁড়ে সেই বিষ ধরে রাখল এবং অন্যত্র রাখা নিরাপদ নয় ভেবে আদ্যার কাছে বিষপাত্র দিয়ে বলল, 'দেখলে ভয় হবে, খেলে মৃত্যু হবে, এই বিষ নিরঞ্জন পাঠিয়েছে।' এই বলে উলুক বল্লুকায় গিয়ে পুনরায় যোগে বসে।

ধর্মের বিরহ কাতরা দেবীর মন আরও উচাটন হল। তিনি সেই কালকূট বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করলেন। আদ্যা সেই বিষ খেলেন কিন্তু যা ভেবে তিনি বিষ খেলেন কার্যত তা ঘটল না। রজঃ সত্ত্ব এবং তমঃ তিনগুণে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের জন্ম হল। তিন ভাই পিতাকে না দেখে কাতর হয়ে দেবীকে পিতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করায় দেবী বল্লুকার কথা বললেন। তিন ভাইয়ের আগমনের বার্তা বুঝে ধর্ম নিরাকার হলেন। বল্লুকার তীরে অনাদ্যকে না দেখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বল্লুকার জলে বসে তপস্যায় মগ্ন হলেন।

তপস্যায় বার বছর কেটে গেলে ধর্মের মনে দয়া হল। তিনি ছয় মাসের মরদেহ হয়ে প্রথমে ব্রহ্মার নিকট পৌঁছলেন, ব্রহ্মা সেই পচা মরদেহ হাত দিয়ে জল নাড়িয়ে দূরে ঠেলে দিল। মরদেহ-রূপী ধর্ম এবার বিষ্ণুর কাছে গেলেন, বিষ্ণুও ঠেলে দিল। অতঃপর শিবের কাছে যেতেই শিব ধর্মকে পিতা ভেবে চিনতে পারল। শিবের মুখে পিতার কথা শুনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাকে বুদ্ধিহীন বলে উপহাস করল। তারা শিবকে অনুনয় জানাল, মরদেহকে জলে ফেলে দিতে বলল। শিব তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে দিব্যজ্ঞান দিল, তারা সকল বিষয় বুঝতে পারল এমন সময়ে বটগাছ থেকে 'উলুক' তাদের কাছে উড়ে এসে মরদেহকে ধর্মঠাকুর বলে সনাক্ত করল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিন দেব 'উলুক'কে মৃতদেহ সৎকারের স্থান নির্ধারণ করতে বলল। উলুক ভেবে দেখল "আপোড়া পৃথিবী সংসারের মধ্যে নাই' তবে দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের কূলে বার আঙ্গুল অদগ্ধ স্থান আছে কিন্তু সেখানেও হবে না কেননা সে স্থানে কলিযুগে ধর্মঠাকুর অবতার হবেন বলে রক্ষিত আছে। শেষে উলুক এই উপায় বলে দিল যে 'শিবের জানুর উপরে দাহ করা যেতে পারে যদি বিষ্ণু কাঠ হতে রাজী হয়। বিষ্ণু আনন্দের সঙ্গে সম্মতি জ্ঞাপন করল। সব ঠিক ঠাক হলে তাকে কোন কাজে লাগান হল না বলে ব্রহ্মা দুঃখিত-চিত্তে নিঃশ্বাস ছাড়ল। ব্রহ্মার নিঃশ্বাসে কাঠে আগুন ধরে গেল। এদিকে আদ্যাদেবী ধর্মের সৎকার হচ্ছে জানতে পেরে ত্বরিতগতিতে চলে এসে স্বামীর সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

অনুমৃতা হলেন। ধর্মের নাভিপদ্ম বল্লুকার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল এবং আদ্যার অস্থি শিব গলায় বেঁধে রাখল। তিন দেবতার এই পরীক্ষায় সৃষ্টি কাহিনি শেষ হল।"

ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধ দেবতা নন সে সুনিশ্চিত।[২০] ধর্মপূজার পুরোহিত ডোম সম্প্রদায়ের লোক। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এই কারণে ধর্মঠাকুরের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতী ছিল না এই কারণেই বৌদ্ধ ধর্মের ইঙ্গিতের প্রতি সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে না। মানিকরাম যে "জাতি যায়" বলে আশঙ্কা করেছিলেন সে বৌদ্ধত্বের জন্যে নয় বরং 'অন্ত্যজ শ্রেণির পূজ্য দেবতার মাহাত্ম্য কাহিনি গাইবেন বলে।'[২১] প্রকৃত অর্থে ধর্ম সম্বন্ধে ভারতীয় উদারনৈতিক মনোভাবটি সকল মঙ্গলকাব্যে যেমন, *ধর্মমঙ্গলেও* তেমনি অনুসৃত হয়েছে।

ধর্মঠাকুরের পূজা সমাজের নিম্নস্তরের জাতিদিগের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে ধর্মপূজা ও ধর্মের গান গাওয়া ছিল নিতান্ত গর্হিত।[২২] ধর্মপূজকদিগের পুরাণের মতে, সর্বাপেক্ষা পবিত্র নদী বল্লুকা, যার তীরে ধর্মের আদিস্থান–'হাকন্দ' ও 'হাখণ্ড' অবস্থিত। বল্লুকা দামোদরের প্রাচীন উপনদী বাঁকার শাখানদী ছিল। এই নদীর শুষ্ক খাত বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে মেমারীর নিকটবর্তী স্থানে এখনও স্পষ্ট দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দী হতে ধর্মঠাকুর শিব অথবা বিষ্ণু অথবা উভয়ের সঙ্গে একীভূত হতে শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে ধর্মপূজা ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে অজ্ঞাতসারে আপনস্থান অধিকার করে নিতে থাকে। ধর্মঠাকুরের কোন প্রতিমা নেই; কুম্মাকৃর্তি প্রস্তরখণ্ডই ধর্মঠাকুরের প্রতীক। বর্তমানে যে সকল স্থানে ধর্মঠাকুর আছেন তাঁরা প্রায়ই শিবরূপে পূজিত হচ্ছেন; এইসব স্থানে ধর্মের গাজন শিবের গাজনরূপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিন্তু এইসব ঠাকুর যে মূলে শিব-ঠাকুর ছিলেননা তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি অনুষ্ঠানে–'শিবের গাজনে পাঠা বলি হয় না, কিন্তু ধর্মের গাজনে শুধু পাঠা কেন হাঁস, পায়রা ও শূকর বলিও হয়ে থাকে।[২৩]

ধর্মের বার্ষিক (গাজন) ও নৈমিত্তিক (ঘরভরা) পূজা-অনুষ্ঠানে সেকালের নগর ও জনপদের সংস্কৃতির প্রায় সব আয়োজন সম্পৃক্ত হয়েছিল। সব জাতি, সব বৃত্তি, রাজসভার সকল পদের স্থান ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, এক্ষেত্রে ধর্মঠাকুর রাজদেবতা, রাজার দর্শন পেতে হলে রাজদ্বারে এসে গোহারি করতে হবে তারপর না রাজদ্বার উন্মুক্ত হবে। এটাই রারমতি(দ্বার মৌক্তিক)। রাজদ্বার খোলা হলে দর্শনার্থীদের ডাক দেওয়া হত, রাজদর্শনের জন্য সমবেত হতে। এরই নাম ধর্মডাক, রাজসভা মণ্ডপ চৌদুয়ারি। চার দরজায় চার কোটাল প্রহরী। ধর্মের সিংহাসন "পাট"। তাই প্রধান ভক্তিয়ার নাম পাটভক্ত্যা। আর অন্যসব ভক্তিয়া রাজসভার উচ্চপদাধিকৃত অর্থাৎ জাতিগত ও পদাধিকারবলে উচ্চশ্রেণির যেমন :

ধর্মাধিকরণিক, আমিনী, প্রতিহার, কুমারস্বামী, শান্তিবিগ্রহী, সান্ধিবিগ্রহিক ইত্যাদি। ধানচাষ থেকে আখমাড়াই এমনকি পাটনিবৃত্তি পর্যন্ত, সবকিছুর স্থান আছে ধর্মের গাজন অনুষ্ঠানে। এগুলি সবই মৌলিক রীতি-আগত নয়, স্থানীয় সংস্কৃতিকে কালে কালে আত্মসাৎকরণ।[২৪] ব্রাহ্মণ শ্রেণির উচ্চবর্ণেরা যেমন ধর্মের মন্দিরে বা বৃক্ষতলায় গিয়ে ধর্মের অর্চনা করে থাকেন তেমনি আবার ডোম, পোদ প্রভৃতি সমাজের নিম্নস্তরের নরনারীও ধর্মের পূজা উপলক্ষ্যে উপাসনা করে থাকে। এখনও হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণেরা কোনো কোনো স্থলে ধর্মের গাজনকে শিবের গাজন বলে উৎসব-অনুষ্ঠানে পরম নিষ্ঠাভরে যোগ দেয়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর সঙ্গে ধর্মঠাকুরের এইখানে বিশেষ পার্থক্য। 'মোট কথা ধর্মঠাকুরের পূজা-উপাসনা ও *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের বিষয়বস্তু যে অন্য মঙ্গলকাব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তাহাতে সন্দেহ নাই।'[২৫]

ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু ও ধর্মঠাকুরের পূজার বিবরণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সামাজিক অন্ত্যজ শ্রেণি ও ধর্মীয় অন্ত্যজ শ্রেণি উভয়েই ধর্মঠাকুরের পূজারী। এছাড়া সমাজের নিম্নশ্রেণি ও উচ্চশ্রেণি, ডোম-নমশূদ্র-যুগী হতে শুরু করে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদি সর্বশ্রেণির ভক্ত ধর্মঠাকুরের পূজা উৎসবে যোগদান

Dhaka University Institutional Repository

করেন, অংশগ্রহণ করেন, মানত করেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে ঘটা করে পূজা ও বলি দিয়ে থাকেন। কেবল এই একটি উপাসনায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সমাজের ভেদ ঘুচে যায়, ডোম পুজারীকেও ব্রাহ্মণভক্ত ভক্তিভরে প্রণাম জানায়। রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণ মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে ঘরে ঘরে নব ব্রাহ্মণ্যের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। তাদের চেষ্টায়ই বঙ্গভাষা সাধুভাষায় পরিণত হয়েছে। প্রাকৃত যুগের দৈন্য ঘুচে গিয়ে নব্যভাষার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। রাজসভায় বহু আরবি-ফারসি ভাষা প্রবেশ করেছে আইন ও আদালতের ভাষা মুসলমানী ভাষার অধিকৃত হয়েছে। বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন :

> নিশাপতি, মহাপাত্র, পাত্র, মণ্ডল, মহামণ্ডল প্রভৃতি পদবী কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তৎস্থলে– উজির, ওমরাহ, নাজির, চাকলাদার, কাজি, দেওয়ান, নায়েব, কারকুন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র সর্দ্দার ও বরকন্দাজ প্রভৃতি সমস্তই মুসলমানী শব্দ হইয়া গিয়াছে।[২৬]

ধর্মমঙ্গল কাব্যের উৎসভূমি রাঢ় চিরকালেই বীরের আবাসভূমি। এ অঞ্চলের অনার্য অধিবাসীরা অপার্থিব অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, মনোবাসনা পূর্ণের জন্য তারা চিরকালই নির্ভর করেছে আত্মশক্তির উপর। আত্মশক্তি থেকেই তারা দৈবের উপর জয়ী হতে পেরেছে।

বাংলা মঙ্গলকাব্যে মুসলমান শ্রমজীবী শ্রেণির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়–এরা কলু, সনাকার , জোলা, পিঠারী, হাজাম প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত। হিন্দুর উচ্চ-নীচ শ্রেণির মতো মুসলমানদের মধ্যেও রয়েছে আশরাফ ও আতরাফের প্রভেদ।[২৭] *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে হাসন-হুসন ধর্মীয় দুটি নাম ব্যবহার করা হয়েছে যাদের সঙ্গে ইতিহাসের কোন সত্যতা নেই। যেমন :

সাজিল হাসনবীর হাতীর উপর।
হুসন পশ্চাৎ সাজে হাতে যমধর ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩৭৭)

জাতি-ধর্ম ব্যবস্থা হিন্দু ধর্মে যতটা প্রকট ছিল মুসলমান ধর্মে ততটা নয় ফলে মঙ্গলকাব্যের মতো সাহিত্যগুলো রচিত হয়েছে হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক আবার অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলো বিদেশী শক্তি এবং দেশীয় ব্রাহ্মণ প্রতিভূ দ্বারা এতোটাই শোষিত, নির্যাতিত ছিল যে তারা সব সময় একজন দেবতার কৃপায় থাকতে চেয়েছে। নারী হোক, আর পুরুষ হোক, অন্ত্যজ কিংবা উচ্চ, দেবতা বলেই তার কাছে সাহায্য প্রার্থনাই ছিল সাধারণ মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মমঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

মানিকরাম গাঙ্গুলির *ধর্মমঙ্গল* কাব্য *রামায়ণ মহাভারতের* কাহিনিতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণকথা এবং রামকথা যে সেকালে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় ছিল এই কাব্য তার বিশিষ্ট নিদর্শন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে শ্রীকৃষ্ণ অথবা রামচন্দ্রের কথা প্রসঙ্গত ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু *ধর্মমঙ্গলে* পৌরাণিক উপাখ্যান এবং লাউসেন, কর্পূর, রঞ্জাবতী, কর্ণসেন, মহামদ প্রভৃতি চরিত্র রাম-কৃষ্ণকথার আবরণে স্থাপিত হয়েছে। কবি যেন *রামায়ণ মহাভারতের* অনুরূপ আদর্শ *ধর্মমঙ্গলের* বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে উপস্থাপিত দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। জাতির ধ্যানে ও মননে রাম-কৃষ্ণ যে কতটা স্থান জুড়েছিল এই সকল কাহিনি থেকে তা বোঝা যায়।

মানিকরামের কাব্যে লাউসেন-কর্পূর প্রায়শই রাম এবং লক্ষণ, কখনও কখনও ভরত-শত্রুঘ্ন, আবার কৃষ্ণ-বলরাম কদাচিৎ লব ও কুশ। মাতা রঞ্জাবতী কৌশল্যা আর কর্ণসেন দশরথ। হনুমানের কৃতিত্ব অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে যেমন দেখা যায় *ধর্মমঙ্গলেও* ঠিক তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে হনুমান মহামদার জারিজুরি ভেঙ্গে দিয়েছে, লাউসেনকে যেকোন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। হনুমান রামচন্দ্রের বীরত্বের কথা বারবার স্মরণ করেছে। লাউসেনের সঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণির লাউদত্তের মৈত্রীবন্ধন হলে কবির রামায়ণ কাহিনি মনে পড়ে যায় :

মিত্রভাবে শ্রীরাম চণ্ডালে দিল কোল।
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ২৭৯)

রামায়ণে রামচন্দ্রের পদরেণু স্পর্শ করে অনেক শাপগ্রস্ত নরনারী মুক্তি পেয়েছিল। কুমীরকে বধ করে লাউসেন কুমীরকে পাপজীবন থেকে মুক্তি দিলেন রামায়ণের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার সাযুজ্য রয়েছে। কবি লাউসেন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেছেন :

ধরণীর ধর্মপুত্র লাউসেন হবেক।
সেই পথে ভাই সঙ্গে গৌড়ে যাইবেক ॥
তার হাতে মুক্তি তোর হবেক তখনি।
শীঘ্র যায় শুন সত্য সমুচিত বাণী ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ২২০)

আবার মহামদাকে বার বার কংসের ন্যায় কৃতান্ত বলা হয়েছে। মহামদও নিজেকে কংস মনে করতেন। সুতরাং কংস-নিধন কাহিনি লাউসেন-মহামদ কাহিনিতে অতি সহজেই ঢুকে পড়েছে। মহামদ নিজেই বলেছে :

কৃষ্ণ হল্য লাউসেন আমি কংস রাজা।
কর্ণসেন বসুদেব দৈবকী হল্য রঞ্জা ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৪৮৩)

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মমঙ্গল কাব্যে মানিকরাম কোন কোন প্রচলিত রূপকথা কিংবা কাহিনিকে এমন কৌশলে মিলিয়ে নিয়েছেন যে কাহিনিটি কোথাও বেমানান হয়নি। বোঝা যায়, সে কালের শ্রোতারা আবেগে উত্তেজনায় উৎকণ্ঠায় এবং পরম দুশ্চিন্তায় এই কাহিনিটি উপভোগ করেছেন।[২৮] সে সময় রাজ্যে যে বিশেষ সুখশান্তি ছিল এমন নয়। মানিকরাম বার বার একটি শক্তির কথা বলেছেন যারা ক্ষমতা হাতে পেয়ে অর্থনৈতিক অন্ত্যজ, ধর্মীয় অন্ত্যজ এবং অধিকারহীনদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। মানিকরাম বলেছেন :

দুরাচার দুষ্টমতি অতি খলচিত্ত।
দোষ বিনে প্রজাগণে দুস্‌খ দেও নিত্য ॥
জবুল জমির জমা বেশী করে ধরে।
যে না দেয় তার সদ্য গুণাকার করে ॥
ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব।
বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে অধিভব ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩৩)

শুধু কি তাই? দেশ থেকে দলে দলে মানুষ পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। এসব ঘটনা মানিকরাম গাঙ্গুলির সমসাময়িক। সুতরাং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মতো রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আদর্শ শাসকের আকাঙ্ক্ষা মানিকরামের পক্ষে স্বাভাবিক।[২৯] *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের গৌড়েশ্বরের রাজদরবারের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের সৈনিকদের কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বেনের মেয়ে'তে যে যুদ্ধ-দৃশ্যের অবতারণা করেছেন তা মানিকরাম থেকে নেওয়া।[৩০] সৈন্যদের মধ্যে ছিল- বন্দুকী, পদাতি, সিফাই, অশ্বারোহী, ঢালি, পাইক, সুবাদার, মল্ল, শার্ঙ্গীধর, বাগদী, খোজা, মোগল, পাঠান, খানসামা, কাজি, মুস্তকিম, সেকজাদা, মীর, মদ্দ এবং গাজি। তীর, ধনুক, গোলা ইত্যাদি ছিল যুদ্ধের অস্ত্র। বিভিন্ন দেশের ঘোড়া এমনকি উটও যুদ্ধে ব্যবহৃত হতো। হাতী তো ছিলই প্রধান বাহন হিসেবে। যুদ্ধের শুভ অশুভ 'লক্ষণ' মানা নিয়ম ছিল।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সমাজে উচ্চবর্ণের মানুষের আচার-আচরণ, আহার-বিহার, ব্যবহার সবকিছুতেই আভিজাত্যের ছাপ পাওয়া যায়। এদেরকে কেন্দ্র করে চারপাশে যেসব নিম্নবর্ণের, নিম্ন-আয়ের ও অধিকারহীনদের জীবন যাপন ব্যবস্থার বর্ণনা মানিকরাম দিয়েছেন তা সমগ্র মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে যে-সব অন্ত্যজ মানুষের ছবি অঙ্কিত হয়েছে, নিম্নে তাদের পরিচয় ও পেশা উপস্থাপিত হল।

কালু ডোম :

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র কালু ডোম। কালুকে লাউসেন সঙ্গে করে এনেছিলেন, পরবর্তী কালে সেনাপতির পদে আসীন করেছেন। কালুর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, কষ্টে দিনাতিপাত করতে হত। কালু ডোমের সাহায্যকারী হিসেবে লাউসেনকে নির্মাণ করেছেন কবি। কালুর আবির্ভাব-লগ্নটি মানিকরাম স্মরণীয় করে রেখেছেন :

কপালের কথা কিছু কয়া নাঞি যায়।
কালুবীর কিরিকুল কাননে চরায় ॥
হরিতক শাল হাতে হৈ হৈ হাঁকে।

Dhaka University Institutional Repository

সাঙনি সামলি ধনি কালি বল্যা ডাকে ॥
ম্লান মুখ সদাই শূকর সঙ্গে ফির‍্যা।
কটিতে কৌপীন তায় গণ্ডা দশ গির‍্যা ॥
তৈল বিনে তাম্র কেশ চনু যেন খড়ি।
কেবল সঙ্কট কষ্ট কপালের দেড়ি ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩০৯)

কালুর জীবনে কষ্ট হত না যদি সে মনের মত কাজ পেত। অসীম তার সাহস, অমিত তার শক্তি। সে শক্তি, সাহস আর দক্ষতা অপচিত হচ্ছে দেখে তার মনে জমেছে চরম খেদ। কালুর খেদোক্তি :

কালু কয় কিমর্ম কহিব মিথ্যা কহ।
বিক্রমে বিশাল বীর সিংহ পিতামহ ॥
কিঙ্কর বীরের বেটা কালুবীর নাম।
সাখাসুরা আত্মজ অবনী অনুপম ॥
বৃদ্ধ সিংহ পদবী সদার বংশ জেতে।
রাজার চাকর হই রাজ্য খণ্ড হইতে ॥
অষ্টম পুরুষ এই রমতিয়ে বাস।
নৃপতি চাকর বল্যা না করে তল্লাস ॥
আমার সঙ্গতি আছে তের ঘর ডোম।
বলে ইন্দ্রজিত রণে বিশাল বিক্রম ॥
কপাল প্রসন্ন নয় কালে কষ্ট পাই।
কান্তা বুনে কুলা পেখ্যা তাহা বেচ্যা খাই ॥
শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ।
হাণ্ডা দশ হল্যে হয় উদর পূরণ ॥
ছেড়া কানি পরিধান জুড়ে নাঞি বাস।
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩১০)

এমন অবস্থা দেখে লাউসেনের মনে দুঃখ হয়, সে সঙ্গে নিতে চায় কালু ডোমকে। কিন্তু মহত্ব ও নৈতিক কর্তব্যবোধ থেকে কালু ডোম একা লাউসেনের সঙ্গে যেতে আপত্তি জানায়। সে বলে :

কালু কয় সম্মুখে জুহার সাত বার।
ঘরে আছে লখ্যা ডুমনী রমণী আমার ॥
তের ঘর ডোম তারা আছে আজ্ঞাকারী।
সে যদ্যপি বলে যেতে তবে যেতে পারি ॥
জন্মভূমি জননী স্বর্গের সমতল।
কেমনে করিব ত্যাগ মমত্বে আকুল ॥
দীনহীন দেখ্যা যদি দয়া হইল চিত্তে।

Dhaka University Institutional Repository

তের ঘর ডোম যাব সগোষ্ঠী সহিতে ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩১১)

সুতরাং কী আর উপায়, কালু ডোমের কথানুসারে তের ঘর ডোমকেই নিয়ে গেলেন লাউসেন। 'অন্ত্যজ' শ্রেণির সংঘবদ্ধতার ছবি কালু ডোমের অনুরোধে চমৎকার প্রকাশিত :

সাখা সুরা দু বীর ঘোড়ার আগে ধায়।
তের ডোম তারা সব আশে পাশে ধায় ॥
পড়িয়া রহিল কুড়্যা পত্রের ছাউনি।
পশ্চাৎ চলিল লখ্যা যতেক ডুমনী ॥
ধাইল ডোমের শিশু হইয়া মিশাল।
তাড়িয়ে চলিল কালু শূকরের পাল ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩১২-৩১৩)

এর মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয় কালু ডোমের নিজ জাতিবৃত্তি ও দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধেরই সুর। প্রভূর প্রতি আনুগত্যে ও কর্তব্য পালনে অতুলনীয় সে। তার বিশ্বাস যার অনুগত সে, তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। যেমন রাজা, তেমনি তার সেনাপতি, উচ্চবর্ণের রাজ্যাধিকারী বলেই যে তার 'অন্ত্যজ' শ্রেণির সেনাপতি থাকবে না এটা সত্য নয় *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে। সেনাপতি হিসেবে কালুকে কখনও কখনও দার্শনিক মনে হয়। কাঙুর জয় করতে যখন লাউসেন প্রস্তুত তখন দার্শনিকের মতো কালুর উপদেশ লাউসেনের কাছে যুদ্ধজয়ের প্রস্তুতিকে বেগবান করেছে। কালুর মুখে উচ্চারিত হয়েছে :

কালু কয় মহারাজা কর অবধান।
বল হতে বুদ্ধি হয় বিশেষ প্রধান ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩৩৭)

কালুর বীরত্বে লাউসেন কর্পূরধলকে পরাজিত করতে পেরেছিল, তারপর তার কন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করেছিল। লাউসেন কখনও কখনও কালুবীরকে 'দাদা' সম্বোধন করেছে। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে উঁচু-নিচু শ্রেণির এই আচরণে কবির ব্যক্তি-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে :

সেন কন কালুকে স্বরূপ শুন দাদা।
বচনে বিশ্বাস সহলে বিশেষ মর্যাদা ॥
সেনের বচনে কালু বুঝিল নিঃশেষ।
ভূপতি ভবনে গেল ভাবিয়া বিশেষ ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩৪৪)

লাউসেনকে চিন্তিত দেখেও কালুবীর স্থির থাকতে পারে না । কাব্যের কাহিনি ও কাহিনির গতি-নির্ধারক হিসেবেও আমরা কালু ডোমকে পাই। ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধের প্রারম্ভে লাউসেনকে চিন্তিত দেখা যায়। লউসেন কেন চিন্তিত, কালু তা জানতে চায়। কালু প্রশ্ন করে :

অধোমুখে লাউসেন ভাবে অনুক্ষণ।
জোড়হাতে কালুবীর জিজ্ঞাসে কারণ ॥
ভৃত্যকে জানাতে হয় ভাল মন্দ কাজ।
কোথাকার পরোয়ানা কহিবে মহারাজ ॥

Dhaka University Institutional Repository

সেন কন শুন দাদা আভিল অসীম।
রাজার হুকুম যাত্যে ঢেকুর মহিম ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৪১৪)

কালুবীর লাউসেন বাহিনীর প্রধান। লাউসেনকে সাহায্য করতে তার পরিবারের এবং অন্যান্য ডোম পরিবারের প্রায় সকল নারী-পুরুষ সদস্য অংশগ্রহণ করেছে। এ থেকে মনে হয় অন্ত্যজ শ্রেণির নারী-পুরুষ সকলেই কালুবীরের অনুগত ছিল। কালুবীর ও লোহা দু'জনেই অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি, তাই উভয়ের মুখে স্বজাতির চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। লোহা ও কালুর কথোপকথন :

তোর কথা জানি কালু স্বগ্রাম নিবাসী।
এমন কয়দিন হলি বিড়াল তপসী ॥
দেখ্যাচি চাগুনি হাতে শোকর চরান।
কালু কয় সর্বকালে না যায় সমান ॥
তোর আমি পূর্বাপর জানি আমি সন্ধি।
চুরি কর্যা তোর বাপ বনে ছিল বন্দী ॥
লোহাটা তখন কয় ততক্ষণ সেটা।
পুখুরে পুখুরে তুঞি কুড়াতিস লোটা ॥
দুঃখের নাহিত ওর গেল সব দিন।
পরিধান ছিল কলাপাতের কৌপীণ ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৪২৮)

আবার কালু লোহা সম্পর্কে বলে :

তখন কেবল ছিলি লোহাটা চাঁড়াল।
এখন পরের ধনে এত ঠাকুরাল ॥
দেখেচি পুখুরে তোর পানিফল তোলা।
সারাদিন বেড়াতিস কান্ধে কর্যা ভেলা ॥
বাদাবাদ বিবাদ হইল বড় তায়।
ধরাধরি দুজনে ধরণী গড়ি যায় ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৪২৯)

কথা কাটাকাটির একটা পর্যায়ে তাদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ শুরু হল। এভাবে অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। সমাজের উচ্চবিত্তরা ঠিক সে-সময় সুযোগ গ্রহণ করত; লোভের ফাঁদ পেতে রাখত। এটাই ছিল সেই সমাজের একটি পরিচিত কর্মকাণ্ড। আবার উচ্চবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্তের দ্বন্দ্ব হওয়াটা স্বাভাবিক নয় বরং উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্তকে শোষণ করবে এটাই স্বাভাবিক। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে ইছাই ঘোষের সঙ্গে কালুর কথা কাটাকাটির মাধ্যমে বর্তমান বিত্তহীন ও অতীত বিত্তহীনের একটি চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন :

কালু ডোম নাম তোর সহজে মলিন।

Dhaka University Institutional Repository

শূকর চরায়্যা বেটা গেছে সর্বদিন ॥
কৌপীণ জুটিত নাঞি কপালের দোষে।
না জুটিত অন্নজল লঙ্ঘন দিবসে ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৪৫০)

আবার কালু ডোম বলে :

যে কালে গৌড়ে ছিলি আমি সব জানি।
পিতা পিতামহ তোর অন্নাভাবে মরে ।
জায়া তার জাতি দেই যবনের ঘরে ॥
বাপ তোর ছিল বলে গরুর রাখাল।
তিন দিন খেয়েছিল তিন গোটা তাল ॥
ক্ষুধায় মলিন মুখ ক্ষীণ হইল রা।
রাখালি সাধিত তোর অভাগিনী মা ॥
কেহ দিত খুদ কুড়া কেহ শাক লাউ।
উদর পুরিয়া খাইত আউটিয়া জাউ ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৪৫০-৪৫১)

অতঃপর দুজনেই যুদ্ধ শুরু করল। ইছাই ঘোষের কাছে পরাজিত হয়ে জীবন দিল কালুবীর। কালুর জীবনসংগ্রাম থেকে বোঝা যায় জন্ম অনুযায়ী মানুষের বর্ণ নির্ধারিত হলেও সমাজের অর্থ, বিত্ত ও প্রতিপত্তি যাদের ছিল তারাও উচ্চশ্রেণির বলে গণ্য হত। ইছাই ঘোষের আদি পুরুষ ছিল অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত কিন্তু বর্তমানে ইছাই ঘোষ ঢেকুরের রাজা, শাসক, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কালুবীরের মতো 'অন্ত্যজ' শ্রেণির মানুষ জীবন দেবে এটাই চিরায়ত সত্য। সৎবন্ধু লাউসেনের প্রার্থনায় ধর্মঠাকুরের কৃপায় জীবন ফিরে পায় কালু :

প্রাণ পেয়্যা কালুবীর কাল যেন রোষে।
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৪৫৪)

জীবন ফিরে পেয়ে কালু আরও বেশি তেজস্বী আরও বেশি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল, মৃত্যুর ভয় আর সে করল না। লাউসেনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে নেমেছে কিন্তু শুঁড়িনীর গৃহে তার আচরণ কিংবা অর্থের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তার চরিত্রে দুরপণেয় কলঙ্ক এনে দিয়েছে। এটি যেমন বাস্তব তেমনি রক্ত-মাংসের শরীরে এই স্বভাব তেমন অস্বাভাবিক নয়। আবার পুত্রস্নেহ তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যখন মহামদ কর্তৃক ময়না আক্রান্ত হয়ে তার দুইপুত্র প্রাণ হারায়, তখন নেশাগ্রস্ত হয়েও তার গভীর মমত্ববোধ চাপা থাকেনি :

পুত্র শোকে মহাবীর পরাণ বিকল।
সমরে সাজন করে শক্রসম বল ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৫৩৩)

সমকালীন নৈতিক মূল্যবোধের অপূর্ব রূপালোক এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে । তাই বিশ্বাসঘাতক কাম্বার কথায় প্রতারিত হয়ে নিজের মাথা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কোনভাবেই ভঙ্গ করেনি সে। অন্ত্যজ শ্রেণির বিজয় অবদমিত করে রাখতে পারেনি কেউ, সেদিন কালুর জীবন উৎসর্গের মাধ্যমেই

Dhaka University Institutional Repository

কর্তব্যপরায়ণতা ও আনুগত্যের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> কালু ডোমের চরিত্রে বীরত্ব ও প্রভূভক্তি ছাড়াও একটি অসাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত তার অপমৃত্যুর কারণ হয়েছিল। কালু প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করার জন্য প্রাণত্যাগ করতেও পারে।[৩১]

মধ্যযুগের পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে আধুনিক যুগের অনেক খ্যাতিমান গবেষক নানা রকম মন্তব্য করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন, 'পুরুষের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা প্রশংসার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এ বিষয়ে যে যত বেশি ও কৃতকর্ম সে যেন বাহাদুর বলে গণ্য হতো।'[৩২] জিতেন্দ্রলাল বসু বলেছেন, 'অধিকাংশ লোকই নৈতিক চরিত্র হারাইয়া আত্মসংযম হারাইয়া তুচ্ছ ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় গা ঢালিয়া দিয়াছিল।'[৩৩] ড. আহমদ শরীফ প্রায় একই রকম মন্তব্য করেছেন, 'আসলে সমাজে বেনামাজী চোর, ডাকু, লম্পট, মিথ্যাবাদী, জুয়ারী প্রভৃতি সবই ছিল।'[৩৪] সুতরাং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি চরিত্রের শৌর্য-বীর্যের চেয়ে ভীরুতা ও কাপুরুষতার চিত্রই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৩৫] তবে একথা সত্য যে বাঙালির শৌর্যবীর্যের যা কিছু পরিচয় তা একমাত্র *ধর্মমঙ্গল* কাব্যেই পাওয়া যায়।[৩৬] *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের কালু ডোম অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ হয়েও সহযোদ্ধা হিসেবে লাউসেনকে সাহায্য করেছে। লাউসেনের ভাগ্যে কী আছে তা সে জানে না। এক অজানা শক্তি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অথবা লাউসেন সেই শক্তিকে সহায়ক মনে করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনো উচ্চশ্রেণি বা উচ্চবিত্তের সাহায্যকারীকে দেখা যায় না। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং সামাজিক অবস্থান কালু ডোমকে প্রশ্ন করায়, তাইতো সে স্বর্গে যেতে চায় না, যাওয়ার সময় বেঁকে বসে :

কালু কয় মহারাজা মনে অবিসার।
জিউ গেলে না ছাড়িব জেত্যের ব্যবহার ॥
স্বর্গ গেলে সদ্য যদি মদ্য মাংস পাই।
সংসার অসার বলে তবে স্বর্গ যাই ॥
সেন কন সুরা মাংস স্বর্গে নাঞি পাবে।
দরশন করিবে দেবাদিদেব দেবে ॥
কালু কয় দেব দেবে মোর কিবা কাজ।
মদ্য মাংস না পাইলে মাথায় পড়ে বাজ ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৬০৩)

সংসার যে অসার নয়, এখানেই যে মানব জীবনের সুখ-শান্তি বিরাজমান, কালুর জবানীতে তা আরও বেশি স্পষ্ট হয়েছে। সংসার তো অমরাবতী নয়, এখানে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, জীবন-মৃত্যু সবকিছুই পালাক্রমে আসে সংসার জীবনের সুখ সবার ভাগ্যে সমান নয়। উঁচু-নিচু প্রভেদের চিত্র মধ্যযুগের সমাজ-সংসারকে বৈষম্যমূলক করে রেখেছে অথচ নিচু শ্রেণির মানুষের পরম ত্যাগেই সমাজ-সংসারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কালুবীরের জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে আমরা স্মরণ করতে পারি তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির সকল মানুষকে, যাদের সহযোগিতায় সেকালের সমাজের উচ্চশ্রেণির জীবনযাপন সহজতর হয়েছে।

সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> আজ আমরা হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতিকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে ছি! ছি! করিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণ হইতে তাড়াইয়া দিতেছি– আমাদের সমাজের ইহারাই এককালে ভিত্তি রক্ষা করিতে যাইয়া অকাতরে প্রাণ দিয়াছে। এই অকৃতজ্ঞ সমাজের প্রতি বিরূপ হইয়া যদি তাহারা এখন প্রতিশোধ লয়, তবে আমরা কি বলিতে পারি? ক্ষুদ্রতম কীটও জন্মে জন্মে পদ-দলিত হইয়া শেষে সর্পে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রের মধ্যেও অনন্ত শক্তির বীজ লুক্কায়িত আছে। আমরা আপনার লোকদিগকে পর করিয়া দিয়া জাতীয় শক্তির কতটা হানি করিতেছি, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে।[৩৭]

সমাজে জাতি-ব্যবস্থার কারণে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য যারা, তারা সমাজের একটি বৃহৎ অংশ; আবার পেশা বা বৃত্তির দিক থেকে যারা নিম্নবৃত্তির তাদেরকেও 'অন্ত্যজ' তৈরি করেছে সমাজ, যাদের সংখ্যাও কম নয়।

সমাজের উচ্চশ্রেণির চরিত্রকে প্রস্ফুটিত করার জন্য নিম্নশ্রেণির ভূমিকা অনস্বীকার্য কেননা নিম্নশ্রেণির সমাগম ঘটেছে বলেই উচ্চশ্রেণিকে চেনা যায় *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে। লাউসেনের মামা মহামদ। গৌড় রাজ্যের নিঃস্ব সামন্ত কর্ণসেনের সঙ্গে মহামদের ভগিনী রঞ্জাবতীর বিবাহকে কেন্দ্র করেই কর্ণসেন-রঞ্জাবতী ও মহামদের বিরোধের পটভূমি তৈরি হয়েছে। কাব্যে দেখা যায় শিশু লাউসেনকে যে চোর চুরি করেছিল তার নাম 'ঙিদা'। 'ঙিদা'কে মহামদ পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বশ করে আপন বোন রঞ্জাবতীর শিশুপুত্র লাউসেনকে চুরি করায়। চুরি করা কোন পেশা নয় এটি মানুষের সামাজিক অধঃপতনের একটি স্তর। মানবিক আচরণ সর্বস্ব হওয়ায় চোরগণ একেবারেই বিবেকহীন হয় না তবে সমাজগর্হিত কাজ করে বলে সামাজিকভাবে তারাও 'অন্ত্যজ' শ্রেণির বলে মনে করা হয়েছে উক্ত গবেষণাকর্মে। মহামদ চরিত্রটিকে আমরা সামাজিকভাবে পঙ্কিলতাপূর্ণ বলতে পারি কারণ সমগ্র *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে কোনও স্থানে এই চরিত্রের মধ্যে ভালত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। সমাজে এমন ভণ্ড, কুচক্রী মামাকে বার বার কংস বলেই কবি বর্ণনা করেছেন। দুর্গম কাঙুর রাজ্যে লাউসেনকে পাঠানোর মাধ্যমেই এই বোধ আরও বেশি প্রকটিত হয় কেননা কাঙুরের যুদ্ধে লাউসেনের পরাভব ও মৃত্যুর আশঙ্কাই প্রবল।

কালী সাধক ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে লাউসেনকে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছে মহামদের প্ররোচনায়। লাউসেন তার বুদ্ধি, শক্তি ও বীর্যবত্তা দিয়ে সকল ক্ষেত্রেই জয়ী হয়েছে। দেশ, মানুষ, মানবতার জন্যই লাউসেন প্রার্থনা করেছে। বন্যা ও বৃষ্টিতে দেশ প্লাবিত হওয়ায় তা রোধ করার জন্যও লাউসেনকে দূরদেশে পাঠানো হয়েছে ধর্মোপাসনা করে পশ্চিমে সূর্যোদয় করার জন্য। এই সুযোগ নিয়েই মহামদ গৌড়রাজকে ভুল বুঝিয়ে ময়না আক্রমণ করেছে। এখানেও কালু ডোমের বীরত্ব ফুটে উঠেছে 'অন্ত্যজ' শ্রেণির কালু ছাড়া অন্য কোন পরাশক্তি সেদিন ময়নাকে বাঁচাতে আসেনি। মহামদ কালু ডোমের বীরত্বে ভীত হয়ে লখাকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস চলিয়েছে, বলেছে :

> এন্যাচি তোমার তরে ইনাম কিঞ্চিত ॥
> কালুকে করিব রাজা তুমি হবে রানী।
> এক দণ্ড ছেড়্যা দেয় ময়না অবনী ॥
> *(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৫১৫)*

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলোতে মহামদের মতো খল চরিত্র প্রায়শই দেখা যায় অবশ্য এর মূলে রয়েছে সামাজিক অসঙ্গতি। এসব চরিত্র সব সময় যে সফল হয়েছে এমন নয়। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে 'মহামদের সব চক্রান্তই হয়েছে ব্যর্থ। কাব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই চরিত্র নিষ্ঠুর-খল-প্রতারক হিসাবেই চিত্রিত।'[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

বীরাঙ্গনা লখাই ও অন্যান্য নারী চরিত্র :

কালুর স্ত্রী লখাই বা লখ্যা জাতে ডুমনী, অন্ত্যজ শ্রেণির একজন। সুতরাং 'কান্তা' বোনার কাজ তাকেও করতে হত। আর লোহার মারফত জেনেছি কালুর পরিধানে থাকত কলাপাতার কৌপীণ। ঘরের ছাউনি ছিল হোগলার, সেও 'দিবসে বাতাসে যাইত দশ বার উড়্যা।' কালু 'পুখুরে পুখুরে' লোটা কুড়িয়ে বেড়াত, চাগুনি হাতে 'শূকর' চরাতো, এমন হতদরিদ্র পরিবারে অন্নজল জুটতো না প্রতিদিন। ভাঙা ঘরের খোঁটা, অন্নাভাবের খোঁটা লখ্যাকে নিশ্চয়ই শুনতে হত। কালুও মর্মপীড়া অনুভব করেছিল, কিন্তু অনুভব করে কী লাভ? সমাজে নিচু জাতের বলে সকল কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত না, আবার সংসারের নিত্য ক্ষুধা-দরিদ্রতা এই দম্পতির জীবনে কাল হয়েছে। কালকেতুর তেআঁটিয়া তালের জন্য ফুল্লরার কষ্ট আমরা অনুমান করতে পারি, লখ্যা ডুমনীর স্বামীও 'হাণ্ডা দশ' ভাত খেতেন। সুতরাং কালু লাউসেনের আশ্বাস পেয়ে যখন আনন্দে বিভোর তখন একইভাবে আন্দোলিত হয় লখ্যা কিন্তু তার প্রকাশের ভাষা ভিন্ন, লখ্যা এখানে ধীরস্থির ও সংযমী। কালুকে লাউসেন নিয়ে যেতে চাইলে লখ্যা বলে :

নৃপতির লবণ নিয়ত মোরা খাই।
তার আজ্ঞা না পেল্যা কেমন কর্য্যা যাই ॥
চাকর হইয়া যদি করি অন্যমত।
এই পাপে বিরুদ্ধ হবেক ধর্মপথ ॥
পদছায়া দিলে যদি পাষণ্ড দেখিয়া।
লয়্যা চল নৃপ কাছে ছাড়ান করিয়া ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩১২)

বীরত্ব, নিষ্ঠা, বুদ্ধিদীপ্তি, স্নেহশীলতা ও কর্তব্যবোধে লখ্যা'র তুলনা নেই। অন্ত্যজ নারী হলেও তার কর্তব্যপরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ পরিস্ফুট হয়েছে কাব্যের সূচনালগ্নে। লাউসেন তার সততার পুরস্কার স্বরূপ ময়নার দায়িত্ব লখ্যার ওপর অর্পণ করে বলেন :

বিপত্ত্য সাগরে পার তুমি কর যদি।
আনন্দে হাকন্ডে যাই সাধিতে উপাধি ॥
তোমাকে দিলেন সঁপ্যা এ চারি তরুণী।
যৌবনে জীবন দিয়া রাখিবে যামিনী ॥
চিত্রসেনে না করিবে চক্ষের আয়ড়।
স্বামীভাব সমান রাখিবে সাত গড় ॥
লখ্যা বলে প্রাণপণে লবণ শুধিব।
অন্যমত করিলে সবংশ নাশ হব ॥
অধম দেখিয়া দয়া কর্য্যাচ আপুনি।
কি দিয়া শুধিব ধার আমি অভাগিনী ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৪৮৮)

মানিকরাম গাঙ্গুলি ইছাই ঘোষের জবানীতে কালু-লখাই দম্পতির অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। চির অভাবী শ্রমজীবী এই দম্পতিকে লাউসেন তুলে এনে অন্নের নিশ্চয়তা বিধান করেছে সেজন্য তাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত্য নেই।[৩৯] ছলনার জালে কালু ডোমকে বেঁধে ফেলে মহামদ দিতে চায় ধনসম্পদ, রাজ্য আর বিবাহের জন্য সুন্দরী নারী কিন্তু লখ্যাকে লোভ দেখিয়ে কোনো উপায় বের করতে পারেনি মহামদ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীকে ফেরাবার জন্য লখ্যা যেভাবে চেষ্টা করেছে তা দেখে মনে হয় তৎকালীন সমাজে অন্ত্যজ নারী শ্রেণির ভাগ্যে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। লখ্যা পূর্বের জীবন স্মরণ করে স্বামীর পায়ে পড়ে :

পড়িয়া বীরের পায়।
কান্দে লখ্যা উভরায় ॥
পূর্ব দুস্‌খ পড়ে মনে।
অন্ন না জুটিত মনে ॥
রমতি নগরে ঘর।
পড়শি স্ববাসী পর ॥
সদাই শূকর সঙ্গে।
ভ্রমিতে ক্ষুধিত অঙ্গে ॥
আছিলে অনাথ নাথ।
কৌপীণ কলার পাত ॥
ছিল হুগলের কুড়্যা।
অনিলে যাইত উড়্যা ॥
শয্যা না জুড়িত শুতে।
আমানি খাইতে গর্তে ॥
অভাগী সঙ্গের সাথী।
কষ্ট পেয়্যাচি যে কতি ॥
আছিল কপালে লেখা।
সেনের সহিত দেখা ॥
আনিল আপন দেশে।
করিলা খণ্ডন ক্লেশে ॥
ইবে পূর্ণ অভিলাষ।
পরিধান পট্টবাস ॥
ভবনে দুই তিন ঘোড়া।
শোভা অঙ্গে সুচেল জোড়া ॥
সিনান সুগন্ধি জলে।
অন্ন খায় স্বর্ণ থালে ॥
শয়ন রতন খাটে।
রাজত্ব রাজার পাটে ॥
এ সুখ সম্পদ যত।
কি জানি লাগিল তিত ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৫০৫-৫০৬)

অন্ত্যজ জীবনযাত্রা থেকে অভিজাত জীবনযাত্রার দিকে হঠাৎ কিসের প্ররোচনায় কালু ডোমের পরিবর্তন হল লখ্যা তা বুঝতে পারে না, তাই স্বামীকে উপদেশ দেয় 'ধনপ্রাণ লাউসেন ধর্ম যার সখা' তার সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

বেঈমানী করলে নিশ্চয়ই নরকে স্থান হবে। কালুকে বশ করে মহামদ ময়না অধিকারের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে কিন্তু লখ্যা তখন মহামদের সৈন্যদলকে প্রতিহত করে, লখ্যার বাণীতে অগ্নি ঝরে, বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়, যা আধুনিক নারী হিসেবে লখ্যার সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ। লখ্যা বলে :

শুধিব সেনের নুন সাধিব সাধনা।
মরণ অবধি আমি রাখিব ময়না ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৫০৭)

নারী বলেই যে দেশপ্রেম কোনো অংশে কম, সৌহার্দ্যের জায়গাটি দুর্বল এমন ঘটেনি লখ্যার চরিত্রে। মানবিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল বর্তিকা লখাই চরিত্রে প্রকট, তাই লাউসেনের অবর্তমানে মহামদ ময়নায় এসে যখন তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, কালু ডোমকে রাজা আর তাকে রাণী করবে বলে লোভ দেখায়, তখন যে বাণী লখাই উচ্চারণ করেছে তা সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যে বিরল সুতরাং এ সকল বৈশিষ্ট্য থেকেই বলা যায় যে লখাই মধ্যযুগের অন্ত্যজ নারী হয়েও সচেতন, আধুনিক।লখ্যার কাছে মহামদ বলে :

এন্যাচি তোমার তরে ইনাম কিঞ্চিত ॥
কালুকে করিব রাজা তুমি হবে রাণী।
এ দন্ড ছেড়্যা দেয় ময়না অবণী ॥
লখ্যা বলে তোর মুখে তুল্যা মারি লাথি।
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৫১৫)

মন্ত্র বলে মহামদ ময়নার জনগণকে নিদ্রাভিভূত করে রাখলে লখাই নিজ পুত্রকে প্রথমে যুদ্ধে পাঠায়। পুত্র নিহত হলে পরে স্বামী কালুকে বহুবিধ অনুরোধ-উপরোধ করে যুদ্ধে পাঠায়। লখাইয়ের এই বীরাঙ্গনা বৈশিষ্ট্যের কথা *ধর্মমঙ্গল* কাব্যধারার সব কবিই কম-বেশি উল্লেখ করেছেন :

রূপরাম বলেছেন :

ডাক দিয়া বলে আমি লখিয়া ডুমনী।
কোন রাজা বেড়িয়াছে ময়না অবণী ॥...
অন্ধকার সংগ্রামে বিষম গালাগালি।
লখ্যার সমুখে যুঝে বিশ হাজার ঢালী ॥
নৈ কাহন ধানুকী ধর‍্যাছে কালচাপ।
ডুমনী উপরে শর পরে ঝুপঝাপ ॥[৪০]

মানিকরাম বলেছেন :

ডাক দিয়্যা ডুমনি ডাগর ডাক ছাড়ে।
অন্তরীক্ষে লাফ দিয়্যা উঠে গিয়া গড়ে ॥
হেদে বেটা মহামদ গৌড়ের নাবড়।
মরিতে আইলি কেনে ময়নার গড় ॥
তোর নবলক্ষ দলে তৃণ জ্ঞান করি।
হেল্যা যাব এখনি হেত্যার যদি ধরি ॥[৪১]

ঘনরাম বলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

কষে বাঁধি কাঁকামি কালিকা করে জপ।
যার মুখে আগুন উগারে দপ্ দপ্ ॥
ছোরা ছরি কাটারি কুটিল হীরাধার।
তর কোচে তীরগুলি তেত্রিশ হাজার ॥
বামকরে ধরে ঢাল কালমুখী ফলা।
টঙ্কারি ধনুক নিতে কাঁপিল অচলা ॥[৪২]

সুতরাং বলা যায় মধ্যযুগের কাব্যে অন্ত্যজ নারী চরিত্র রূপায়ণে কবিগণ যে প্রচলিত ধারা অনুসরণ করেছেন, লখাই চরিত্র সেদিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। আধুনিক বীরাঙ্গনা রমণীদের পাশে লখাইকে বেমানান মনে হয় না। সমালোচক উমা সেনের ভাষায় 'বীরত্ব, নিষ্ঠা, স্নেহ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্তব্যবোধে লখা অদ্বিতীয়া।'[৪৩] অন্ত্যজ বলেই কী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না এমন নয়, অপমানিত হয়ে ক্রোধে জাতি তুলে মহামদ গালাগালি দেয় লখাকে। এতে চরম আঘাত লাগে লখার স্বাজাত্যবোধে। স্বামীর গর্বে গরবিনী, পুত্রস্নেহে কাতরা মাতৃহৃদয় এবং স্বদেশ রক্ষার জন্য দ্বিতীয় পুত্র সুখাকে পাঠানোর মাধ্যমে একজন বীরাঙ্গনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে লখ্যার চরিত্রে। চরিত্রটি সম্পর্কে সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'লক্ষ্মী ডোমনী শুধু বীর নয়, মাতার স্নেহে, পতিভক্তিতে এবং পালক রাজাদের প্রতি আনুগত্যে এক অসাধারণ রমণী।[৪৪] ড. অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন, 'লখাই একটা অনন্য সাধারণ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন।'[৪৫] লখাই-এর পাশাপাশি নারীর সৈনিক বেশে যুদ্ধে গমন করতে কোলিঙ্গা, কানড়া এবং ধুমসী দাসীকে দেখা যায়। এ কাব্যে তাদের উপস্থিতি নারীকে নিজস্ব অবস্থান থেকে অনেক বেশি বেগবান করে তুলেছে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো *ধর্মমঙ্গলে*ও বারবণিতার পেশায় নারীকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। আর্থিক অবস্থা যাই থাকুক শুঁড়িনীদের জীবন ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। পুরুষ খদ্দেরকে খুশি রাখার জন্য সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পসরা সাজিয়ে শুঁড়িনীরা অপেক্ষা করত। মদ চোলাই করা, সুরা তৈরি করা এবং দিনরাত খদ্দের সামলানো প্রভৃতি পর্যালোচনা করে এটাই স্পষ্ট হয় যে, স্বাভাবিক নারীদের মতো জীবনযাপন তাদের ছিল না। সমাজে দাসদাসীর জীবন কোনকালেই সুখকর ছিল না। তাদের জীবনযাপন প্রণালী ছিল মানবেতর। কানড়ার দাসী 'ধুমসী' তার সামাজিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করে বলে :

এইবার অভয়া আসিয়া কর রক্ষা।
কানড়ার আগুনি কেবল বল পক্ষা ॥
মরি তার দায় নাহি এই ভয় মনে।
আমি যে তোমার দাসী জগজনে জানে ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩৯৩)

পুরুষপ্রধান সমাজে নারীরা ছিল অধিকারহীনা। উচ্চশ্রেণি কিংবা নিম্নশ্রেণি উভয় সমাজে তারা অধিকার পায়নি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এজন্য তাদের অন্ত্যজ বলাই শ্রেয়।

কানড়া যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী রাজকন্যা তারপরও দাসী হিসেবে 'ধুমসী'র চিন্তার শেষ নেই। কাব্যের বহু স্থানে আমরা ধুমসী দাসীকে কখনও উপদেশদাত্রী কখনও সাহায্যকারী হিসেবে পেয়েছি। কানড়ার যুদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

সাজে একজন বীরাঙ্গনা মনে হয়, সিঁথির সিদুর রক্ষার লড়াইয়ে ধুমসী যেন আশীর্বাদ বয়ে এনেছে কানড়ার জীবনে। কাব্যে দেখা যায় :

কপালে সিন্দুর ফোঁটা করে ঝলমল।
কুরঙ্গ নয়নে সাজে কাঞ্চিৎ কাজল ॥
হেতার লইল যার হীরাধারে জ্বলে।
ঢাকিল সকল অঙ্গ অনুপম ঢালে ॥
পাছু আসি সাজিল ধুমসী পরাধিকা।
আক্রোশ আকার যেন আগুনের শিখা ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৫৪৪)

তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় নারী জীবনকে সবচেয়ে বেশি কলঙ্কিত করেছিল যে তিনটি প্রথা তা হল 'কৌলিন্য, সতীদাহ ও দাস-দাসী কেনাবেচা।'[৪৬] আজীবন পরাধীন দাসী-বাদীরা মনিবদের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও মনিব কর্তৃক দাসীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায়নি কখনো উপরন্তু সামাজিকভাবে সেই দাসীকেই শাস্তি ভোগ করতে হত। মধ্যযুগের সমাজ তাই পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করত। সতীদাহ প্রথার বীভৎস রূপ মানবিকতাকে পদদলিত করে অথচ এই প্রথা উঁচু-নিচু উভয় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য ছিল। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে স্বামীর জন্য অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী কলিঙ্গাকে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। যেমন :

একে সে অবলা তায় অষ্টমাস গর্ভ।
উঠিতে অবশ অঙ্গ বসিতে অথর্ব ॥
কেবল সাহস মনে কালীর চরণ।
সমরে প্রবেশে গিয়া সিংহিনী যেমন ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৫৪১)

কলিঙ্গার যুদ্ধবিদ্যা দেখে অনেকেই ধারণা-পোষণ করল যে :

রণে এল লাউসেন রমণীর বেশে।
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৫৪১)

মধ্যযুগের সমাজ-ব্যবস্থায় একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত ,এতে দোষের কিছু ছিল না। এজন্যই কাব্যে দেখা যায় চার স্ত্রীকে নিয়ে বেশ সুখেই দিন কেটেছিল লাউসেনের :

কলিঙ্গা কানড়া আর সুআগা বিমলা।
এ চারি সতিনে অতি আনন্দে লিখিলা ॥
কালু বীর আদি করে তোমা তের জনা।
লখ্যাকে লিখিলা অতি অরুণ লেচনা ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৫৩)

মৃত লোহার মুণ্ডুকে লাউসেনের ন্যায় তৈরি করে যখন ছলনা করা হয় তখন লাউসেনের মিথ্যা অভিব্যক্তি হলেও এটা প্রমাণিত হয় যে, অনুমরণ প্রথাও সেই সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি-পদ্ধতি ছিল। যেমন :

অবীরা অবলা হল্যে রাখা নয় ঘরে।
অগ্নিকুন্ড কর্য্যা যেন চারি বৌ মরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

এইরূপ অভিসার লিখিয়া লিখন।
লঘু ডেক্যা নিজ চরে নিরোষে তখন ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৪৩২)

শ্রমজীবী নারীর অন্তর্ভুক্ত 'নটিনী' ও 'দেহ-পসারিণী' পূর্বের মঙ্গল কাব্যেও যাদের বলা হয়েছে, তাদের পুঁজি নেই, জাত নেই, সামাজিক কোনো সম্মানজনক অবস্থান নেই অথচ জীবিকার তাগিদেই তারা গ্রহণ করেছে এমন হীনবৃত্তি বা পেশা।

সমাজে নটীদের কাজ নৃত্যগীত পরিবেশন করা। বাংলা কলা-বিদ্যার অন্যতম এই শাখা 'নৃত্যকলা' বর্তমানে সম্ভাবনাময় একটি পেশায় পরিণত হয়েছে কিন্তু মধ্যযুগে যে নৃত্যকলা পরিবেশিত হয়েছে তা শুধুমাত্র উচ্চবিত্তের পুরুষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। নৃত্য পরিবেশনের নটীকে কেশ-বিন্যাস, বিচিত্র পোশাক ও অলঙ্কারে বিভূষিত হতে হয়েছিল, অন্তরে যত দুঃখ-কষ্টই থাকুক না কেন বাহিরের আবরণটি হতে হবে জাকজমকপূর্ণ। এরপর বাদ্যের তালে তালে তাল মিলিয়ে নাচতে হত নটিনীদের। তাল ভঙ্গ হলে নটিনীর জীবনে দুর্ভোগের অন্ত ছিলনা।

অপমান সীমা ছাড়িয়ে শারীরিক নির্যাতনে পৌঁছেছিল। *মনসামঙ্গল* কাব্যে আমরা দেখেছি ঊষার নৃত্যের তাল ভঙ্গের জন্য অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গ থেকে মর্তে চলে যেতে। নটীর উপার্জনে তার পরিবার চলে, হয়ত বৃদ্ধ পিতা, বৃদ্ধা মাতা, ছোট ভাই-বোন তার পরিবারে থাকতে পারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি সেই নটিনী অথচ পুরুষের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে নির্মিত 'নটিনী' তাদেরই তৈরি সমাজের বিধি-নিষেধ দ্বারা কলঙ্কিত একটি চরিত্র।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের গোলাহাট পালায় দেখা যায়, 'সুরিক্ষা' নামে যে 'নটী' আছে সে গোলাহাটের প্রধান। তার অনেক দাস-দাসী কারণ পান-পড়া, সুপারি-পড়া এসব দিয়ে সে সকলকে বশ করে। এই বশ করার উপায়টিও পুরুষ শ্রেণিকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই, এতে পুরুষ শ্রেণি যে খুব বেশি শাস্তি পায় তাও নয়। মানিকরাম গাঙ্গুলির রচনায় 'নটিনী' তাই হয়ে উঠেছে আরও বীভৎস, হিংস্র, উচ্ছৃঙ্খল :

সুরিক্ষা নটিনী নামে তার এই পাট।
শুনেচি ইহার নাম গঞ্জ গোলাহাট ॥
মেয়েরাজা মর্দের মর্যাদা নাঞি রাখে।
চিত করে চরণ দুখানি দেয় বুকে ॥
উলঙ্গ হইয়ে নাচে নাই লাজ ভয়।
ব্রহ্মচারী ঠাকুর বচনে বশ হয় ॥
ঔষধ অশেষ বিদ্যা বিলক্ষণ জানে।
রূপের তুলনা নাই এ তিন ভুবনে ॥
বিদগ্ধ বিদেশী পুরুষ যদি পায়।
কুচের কাঁচলি খুলে মোহনি লাগায় ॥
গাড়র করিয়া রাখে ঔষধের গুণে।
সুন্দর পণ্ডিতা বিটি সর্বশাস্ত্র জানে ॥
ছকুড়ি নাগর তার অনধিক ছটী।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ করিয়া বুলে আঁটে নাঞি দুটী ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ২৪৪-২৪৫)

শারীরিক ভোগবিলাসে ব্যর্থ সুরিক্ষার অন্তর শেষ পর্যন্ত আপন শিশু সন্তানকে আছড়িয়ে মারতে এতটুকু বাধেনি। তবে নটিনীরা স্বভাবতই উচ্ছৃঙ্খল হবে এমন নয়। সমাজ যেমন একদিকে শাস্তি দিয়েছে তেমনি অন্যদিকে পুরস্কৃতও করেছে। 'নয়ানীর নাক কান কাটিল নোটন।'[৪৭] এটা যেমন সত্য তেমনি নটী হয়ে তবেই বেহুলা স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা পেয়েছে। সমাজের অন্য সকল মানুষের মতো নটীদের বাঁচার অধিকার আছে তাইতো তাদের জীবনে প্রেম আসে; তবে সেই প্রেম কখনও প্রতিষ্ঠা পায় না; ব্যর্থ প্রেমে পরিণত হয়। সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> নারীর পতিতাবৃত্তি তখনকার দিনে, পরবর্তী যুগের বিভিন্ন দেশের ধনতান্ত্রিক সমাজের মত আইন-কানুন স্বীকৃত পণ্য-চরিত্রে পরিণত না হলেও, অলিখিতভাবে সামাজিক স্বীকৃতি তার পিছনে ছিল। আর রাজা-রাজড়া, কুলীন ব্রাহ্মণ অভিজাত শ্রেণীর বেলায় তো কোন বাধা নিষেধই ছিল না।[৪৮]

লাউসেনের প্রতি অমলিন আনুগত্য প্রদর্শনকারী আরও একটি চরিত্রের নাম হরিহর বাইতি। সে ছিল লাউসেনের পশ্চিমে সূর্যোদয়ের সাক্ষী। কুচক্রী মহামদ তাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রলোভন দেখায় কিন্তু হরিহর তার সততায় অটল, স্থির। অন্ত্যজ শ্রেণির হরিহরের মাধ্যমে এই সত্যই প্রকটিত যে ,তৎকালীন সমাজে উচ্চশ্রেণির মধ্যে যতটা সততা ছিল তার চেয়ে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সততা কোনো অংশে কম নয়; অন্ত্যজ বলেই যে সে সৎ হবে না এমন নয়। মিথ্যা অভিযোগে শূলে চড়িয়ে তার জীবননাশ করা হল কিন্তু মিথ্যা বলে সে নিজের জীবনের মায়া পর্যন্ত করল না।

'কবির অন্তর্নিহিত সমবেদনা এই চরিত্রের সঙ্গে মিশে একে করে' তুলেছে অপরূপ এবং নমস্য।[৪৯] তথাকথিত ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে নিন্দিত ও ঘৃণিত অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্রের মাধুর্য ও মহানুভবতা বিস্ময়কর আবার তাৎপর্যবহ। কালু ডোম, লখাই চরিত্রের মাধ্যমেই তার পরিচয় পাওয়া গেছে। এই স্বকীয়তার গুণেই বর্ণাশ্রম বহির্ভূত সম্প্রদায় ও ঘৃণিত বর্ণসমূহের অন্তর্নিহিত মানবতাবোধ উচ্চশ্রেণির, উচ্চবিত্তের মানুষের তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে এই সত্যে উপনীত হতে হয় যে, সহজ অধিকারের বলেই তাদের যে মর্যাদা প্রাপ্য, তার জন্যেই তারা সংগ্রাম করেছে। অধিকারহীনের অধিকার অর্জনের লড়াই 'মঙ্গলকাব্য' বলা যায় নির্দ্বিধায়। ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্কারের দুরতিক্রম্য প্রাচীর ভেদ করে বাংলার আর্যেতর লৌকিক জীবনযাপন এমনভাবে জেগে উঠেছে যে, তাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে মানিকরাম গাঙ্গুলি অন্ত্যজ শ্রেণির বিশাল এক পরিবারকে উপস্থাপন করেছেন, তাদের পরিবারের সবার কথা বিশদভাবে বলার সুযোগ সৃষ্টি না হলেও তাদের পেশাগত পরিচয়টি তিনি চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন :

কামার :

শুনিয়ে সুতের বাক্য যেন সুখী অতি।
কুশল কামারে ডেকে কহেন ভারতী ॥
বার কাহন বরাটিকে বেতনার্থ লহ।
অদ্য মধ্যে সদ্য ফলা নির্মাইয়ে দেহ ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৪৩)

কলু :

বাঘ বলে বিশ্বমাতা বর দিয়ে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

মাংস খেয়ে মনের মহৎ সুখ হল ॥
তৈল বিনে তনুতে কেবল উড়ে খড়ি।
কল্য হই কাল যাব কলুদের বাড়ি ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৯১)

মালি :

সাজে নাই সুন্দর শরীরে শুধু গলা।
মালির ভবনে যাই পরি গিয়ে মালা ॥
বলে এত বাঘটা ব্যানন্দ হৃদয়।
মালির ভবনে এল সন্ধ্যার সময় ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৯১)

রাউত :

ভূপতি বারতা পাইল ভৃত্যের বদনে।
লঘুগতি আইল যতেক সেনাগনে ॥
ঢাকঢোল ধামসায় ঘন পড়ে কাঠি।
রাউত সাজিল কত করে পরিপাটি ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৯৩)

গোয়ালা :

ঐছনে আনন্দে অঙ্গ অবশ হইয়ে।
নিধুবনে নৃত্য করে গয়ালার মেয়ে ॥
এইরূপে লাউসেন দেখে তার পরে।
বাঘ অন্বেষণে আল্য বিপিন ভিতরে ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৯৯-২০০)

বারুই :

কর্পূরের দৃষ্টি হৈল কয় লাউসেনে।
বরুই অঙ্গনা সব আইসে কি কারণে ॥
এই গেল জল লয়ে জান কিছু ভাষ।
ভুলাইতে তোমাকে করেচে বেশ বাস ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ২৩১)

ময়রা :

বিপদ সময় হল্য নাঞি বন্ধু ভাই।
তা দেখিয়া কর্পূর তরাসে দিল ধাই ॥
সম্মুখে ময়রা ঘর ভিতর দেউড়ি।
গোপাল গোবিন্দ বল্যা গেলা তার বাড়ি ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ২৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

ধীবর :

সিফাই পালায় ফেল্যা সরনিয়ে ঘোড়া।
কার গেল যমধর কার গেল জোড়া ॥
আছিল ধীবর পাঁকে লুকাইয়া জলে।
বেনাবনে বস্যা কেহ রাম রাম বলে ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৫১৭-৫১৮)

অন্ত্যজ শ্রেণির নানামাত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পাশাপাশি সমাজের এমন কোনো অসঙ্গতিকে বলতে দ্বিধাবোধ করেননি মানিকরাম। যেমন :

মদের ব্যবহার :

শহরের সাতকড়ি শুঁড়িকে গিয়ে বলে ॥
হুকুম দিলেন তোকে পাত্র মহারাজা।
সদ্য কর্যা সাত ঘড়া সুরা দিবি তাজা ॥
বস্কিম বিস্তর পাবি কালি টাকাকড়ি।
শুভ কথা শুনিয়া শুঁড়ির দড়বড়ি ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ২৯৭)

অর্থের ব্যবহার :

পাত্রে কন মহীশ্বর মহামন্দ মনে।
লেখ্যা দেয় ময়না বস্কিম লাউসেনে ॥
পাত্র কন পৃথ্বীপতি নিবেদন পায়।
ন লাখ টাকার জায়গা দিয়্যা নাই যায় ॥

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ২৯৭)

করপ্রথা :

নৃপতি কহেন বাপু প্রবল হইল রিপু
মন দিলে মনস্তাপ দূর।
কাঙুরে কর্পূরধল না দ্যায় ভূমের কর
তার তুমি কর দর্পচূর।

(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩২৫)

স্বামীকে বশ করা :

বিমলা বলেন শুনে বচন সুরস।
আছে এক ঔষধ স্বামীকে কর বশ ॥
ওদন সহিত কর্যা খাওয়াইলে কিছু।

Dhaka University Institutional Repository

বসে উঠে বচনে বেড়ান পাছু ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩৩২)

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার :

খমক খঞ্জরি তুরি ভেরী ঢাক ঢোল।
মার্দ্দল মরুজা বাজে মৃদঙ্গের বোল ॥
সানি শঙ্খ মূচঙ্গ ভুরঙ্গ বীণা বাঁশী।
কাঁসর দগড় আর কাড়াপড়া কাঁসি ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩৪৬)

যৌতুক :

কন্যাকে যৌতুক দিল কত রত্ন ধন।
কালিনি পাখর ঘুড়ি কাঞ্চন ভরণ ॥
দিল আর দুই দাসী দক্ষিণা দ্রৌপদী।
সারিল সকল ক্রিয়া শেষে যথাবিধি ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩৪৯)

ঘটকালী :

ধুমসী তখন কয় ধার্য শুন বলি।
না কহিলে মিথ্যা কথা না হয় ঘটকালি।
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৩৭২)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ : বন্যা

ব্রাহ্মণের বেদ ভাসে বৈষ্ণবের মালা।
তামুলীর ভেসে গেল তামুকের ছালা ॥
কামারের জাঁতা ভাসে কুমারের হাঁড়ি।
পাট পাট ভেসে যায় পোদ্দারের কড়ি ॥
দেউল দেহারে ভাসে দেবতার খাট।
তাঁত ভাসে তাঁতির ধোবার ভাসে পাট ॥
(ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৪৭৭)

জাতি যাওয়ার ভয় কবিরও ছিল কারণ নিচুশ্রেণির মানুষের কল্পকাহিনি লিখতে ব্রাহ্মণদের জাত চলে যেতেও পারে। কবি অন্ত্যজ, নিরন্ন মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে অলৌকিকতার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। *ধর্মমঙ্গল কাব্যে* অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণে তাই অলৌকিকতা বিদ্যমান। সমালোচকের মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণীয় :

> বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষই কি অলৌকিক ছাড়া ধর্মের কথা ভাবতে পারে? এই অলৌকিকের কল্পনায় মঙ্গলকাব্যেও যেখানে মানবীয় জীবনের আভাস আসে, মানব-সম্পর্কের ছায়া পড়ে, সেখানেই

Dhaka University Institutional Repository

> মানব-রসের প্রসাদে সেই সব আজগুবি উদ্ভট কাহিনি কোনো রূপে কাব্যগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। না হলে সে-সব কাহিনি ইতিহাসের বা সমাজতত্ত্বের গবেষণার বিষয়, বড় জোর শিক্ষিত মানুষের শুধু কৌতূহলের বিষয়, আর তাই সাহিত্য-সন্ধানীর পক্ষে ক্লান্তিকর। ধর্মঠাকুরের গানের মধ্যে এই মানব রস ভাগ্যক্রমে ভালো করে এসে জুটেছে আরও একটি কারণে ধর্মমঙ্গলের রচয়িতারা প্রত্যেকে নিজেদের কাহিনিও রেখে গিয়েছেন।[৫০]

জাতির জীবনে সফলতা যেমন আসে, তেমনি বিপর্যয়ও দেখা দেয় মাঝে-মাঝে। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের সাধারণ পরিস্থিতি নানা দিক থেকেই অরাজক, জীবনের পরিপন্থী কারণ এই কাব্যের কবিরা ব্যক্তিগত জীবনে অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন, আবার দেশের সাধারণ, শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ ও অধিকারের জন্য তারাই কলম ধরেছিলেন। যার ফলে উচ্চবিত্ত, উচ্চশ্রেণি ও উচ্চবর্ণের মানুষের চেয়ে নিম্নবিত্তের, নিম্নশ্রেণির ও নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনযাপন ব্যবস্থা অনেক বেশি সোচ্চার মঙ্গলকাব্যগুলোতে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে অন্ত্যজ শ্রেণিকে উচ্চশ্রেণির সেবা করতে দেখা যায়, কিন্তু *ধর্মমঙ্গল কাব্যে* অন্ত্যজ শ্রেণিকে সাহায্যকারী হিসেবে পাওয়া যায়। এ জন্যই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় *ধর্মমঙ্গল কাব্যটি* স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা* (কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮), পৃ. ১৯৫

২. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকা* (ঢাকা : ১৯৭৩), পদসংখ্যা-১০

৩. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে পুরুষ চরিত্র* (কলকাতা : ১৯১৯), পৃ. ৯৫

৪. গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী, *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪০৫/ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯), পৃ. ৩৫

৫. মুস্তফা পান্না, *বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৮৬

৬. সুকুমার সেন (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত *চণ্ডীমঙ্গল* (নতুন দিল্লি : সাহিত্য আকাডেমি, ১৯৯৩ সন), পৃ.৭৯

৭. *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ* পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৮. *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ* পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৯. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, *কালকেতু উপাখ্যান* (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলাবাজার, পঞ্চম সংস্করণ, আষাঢ় ১৪০২), পৃ. ১০০

১০. মুস্তফা পান্না, *বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ* পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

১১. *চর্যাগীতিকা* পৃ. পদসংখ্যা ২

১২. *চর্যাগীতিকা* পৃ. পদসংখ্যা ৩৩

১৩. *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

১৪. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

১৬. মাহমুদা খাতুন, "মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ" (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, *সুন্দরম*, ষষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মে-জুলাই, ১৯৯২), পৃ. ২২

১৭. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ* (কলকাতা : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লী, আই সি বি এস সিরিজ-২৪), পৃ. ৯১

১৮. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *অবস্কিওর রিলিজিয়াস কাল্টস* (কলিকাতা), পৃ. ৩১১-৩৩৭

১৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৫০), পৃ. ৭০

২০. রূপরামের *ধর্মমঙ্গল* সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণ্ডল ও সুনন্দা সেন (সম্পাদক), (ভূমিকা অংশ)

২১. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত *ধর্মমঙ্গল* (কলকাতা :

Dhaka University Institutional Repository

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০),(ভূমিকা)

২২. সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

২৪. বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* চতুর্থ খণ্ড, (কলকাতা : ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭), পৃ. ১৩৬

২৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পর্ব, (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬-২০০৭), পৃ. ২৪৮

২৬. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ* দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৪২, তৃতীয় মুদ্রণ ১৪১২ ফাল্গুন, মার্চ ২০০৬), পৃ. ৯৮৭

২৭. *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ* পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

২৮. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত, *ধর্মমঙ্গল* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০), ভূমিকা/১০

২৯. ঐ, (ভূমিকা/১১)

৩০. ঐ, (ভূমিকা/১১)

৩১. ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ চরিত্র* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি , ১৯৯২), পৃ. ৯৬

৩২. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ* (কলকাতা : ১৯০৯), পৃ. ৩০-৪০

৩৩. জিতেন্দ্রলাল বসু, *মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র* (কলকাতা : প্রথম সংস্করণ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮৩

৩৪. আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* (ঢাকা : ১৯৭৭), পৃ. ৩৩৫

৩৫. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৮৬), পৃ. ১৫৩

৩৬. ঐ, পৃ. ১৫৩

৩৭. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ* প্রথম খণ্ড (ভূমিকা), (কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৬), পৃ. ০৩

৩৮. ঐ, পৃ. ৯৬

৩৯. গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী, *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪০৫/ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯), পৃ. ৭৫

৪০. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, রূপরাম চক্রবর্তী প্রণীত, *ধর্মমঙ্গল* জাগরণ পালা, (কলকাতা : ভারবি, ১৩৯৯), পৃ. ৩২২

Dhaka University Institutional Repository

৪১. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, মানিকরাম গাঙ্গুলি প্রণীত, *ধর্মমঙ্গল* দ্বাদশ পালা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৪

৪২. যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রণীত *শ্রী ধর্মমঙ্গল* জাগরণ পালা, (কলকাতা : ১৩১৮), পৃ. ২৩৪-৩৫

৪৩. উমা সেন, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ* (কলকাতা : ১৯৭১), পৃ. ১১৭

৪৪. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯১), পৃ. ৫৭

৪৫. অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ৪র্থ মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৫), পৃ. ৯৯

৪৬. অতুল সুর, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস* (কলকাতা : ১৯৭৬), পৃ. ৮৮

৪৭. মানিকরাম বিরচিত, *ধর্মমঙ্গল* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২

৪৮. কনক মুখোপাধ্যায়, *বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৯), পৃ. ২৮

৪৯. অরবিন্দ পোদ্দার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

৫০.গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ,(কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী,পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪১৫),পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় :

শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়নে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ

সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত একশ বছরের বাংলার সামাজিক জীবন-বিকাশের ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। পঞ্চদশ শতাব্দী হতে ধর্মান্তরীকরণের ফলে বহু নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল। একদিকে রাষ্ট্রের চণ্ডনীতি, নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের অসহনীয় আচরণ, অন্যদিকে উদারতর ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্বের আহ্বান, পীর-ফকির-দরবেশদের আধ্যাত্ম্য কলা-কৌশল ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দুসমাজের এক প্রান্তে ধর্মান্তরকরণের যে ধারা বয়ে চলেছিল তা মুঘল যুগেও বর্তমান ছিল। হিন্দুসমাজ মুসলমানের সংস্পর্শে এসে ইসলামি ধরন ধারণ সম্বন্ধে অল্পকিছু অবহিত হয়েছিল। উভয় সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও প্রীতির সম্পর্ক গঠিত হত,কখনও বা কারণে-অকারণে সেই প্রীতিবন্ধন ছিঁড়েও যেত। মুসলমানগণের সাংস্কৃতিক বিজয়কে অবদমিত করার জন্য উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের নিকটবর্তী মনোভাব তৈরি করানো হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত সামন্তবাদী শাসনের বহু-ধাপবিশিষ্ট নিষ্ঠুর শাসন-যন্ত্রের চাপে নিমজ্জিত গণমানস জাগরিত হয়েছিল লৌকিক কাহিনির অন্তরালে।

শিবায়নে যে লোক-চিত্তরঞ্জক বর্ণনা আছে তা থেকে মনে হয়, 'এদেশে আর্যাচার ও পৌরাণিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আর্যেতর জনসমাজে কৃষিদেবতা রূপে কোনো ক্ষেত্রপাল দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল।'[১] এই লৌকিক দেবতাই কাব্যে, ব্রতছড়ায়, গ্রাম্য বৃক্ষমূলে, বাবার থানে, গাজন উৎসবে এবং ক্ষেত্রকর্মে এখনও বর্তমান। অস্ট্রিক অধ্যুষিত কৃষি-সভ্যতায় কৃষিদেবতার উদ্ভাবন একটা সাধারণ স্বাভাবিক সামাজিক ঐতিহ্য, যার সঙ্গে যুক্ত আছে নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবন ও জীবিকা। বাংলাদেশে এরূপ কোনো দেবতা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে আর্যধর্ম-বহির্ভূত গ্রামীণ সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করেছিলেন। পরবর্তীতে পুরাণের হর-পার্বতী পুত্র-কন্যাদি নিয়ে আর্দ্রভূমিতে পা রেখেছেন ঠিক তখনই খুব সহজেই এই লৌকিক দেবতার সাথে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এ মিলন শাস্ত্রসম্মতভাবে না হয়ে লোক-জীবন ও লোক-সংস্কৃতির আবহ তৈরি হয়েছে।

এই লৌকিক দেবতার ধরন-ধারণ, আচার-আচরণ পৌরাণিক হিন্দুসমাজে সর্বদা প্রশ্নের জন্ম দেয়। ইনি বৃদ্ধ, অতি দরিদ্র, তার স্ত্রী তরুণী, অনেকগুলো সন্তান, ভিক্ষাই একমাত্র উপজীবিকা। আবার মাদক সেবনে তার নিষ্ঠা অসাধারণ; ততোধিক নিষ্ঠা পরস্ত্রীর প্রতি। কোচবধূদের সঙ্গে রঙ্গভঙ্গে তিনি রোমাঞ্চিত, উল্লাসিত অন্যদিকে ইনি কৃষি দেবতা; ভাগ্নে ভীমকে নিয়ে কৃষিকার্যে ব্যাপৃত হন, বাগদিনী যুবতী শিবানীকে দেখে মত্ত হয়ে ওঠেন। তার আলিঙ্গন কামনা করে হাঁটুজলে নেমে মাছ ধরতে তার কোনোও আপত্তি নেই; এইসব কর্মকাণ্ড সমাজে শিব ঠাকুরকে নিম্নশ্রেণির দেবতা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সমাজে বৃত্তি অনুযায়ী শ্রেণি নির্ধারণ মঙ্গলকাব্যের সমাজের প্রথা বলা চলে। পূর্বের মঙ্গলকাব্যগুলোতে অন্ত্যজ অর্থে অন্তে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে। এরা জাতিগতভাবে ভারতীয় জাত ব্যবস্থায় অন্তে বা শেষে অবস্থানকারী, আবার সামাজিকভাবে সমাজে বসবাসকারী সকল শ্রেণির নিম্নস্তরে যাদের রাখা হয়েছে। এদের নিম্নস্তরে রাখা হয়েছে বৃত্তি অনুযায়ী, মনে রাখা প্রয়োজন মানুষের শ্রেণিভেদ প্রথা ছিল বর্ণনির্ভর আর বর্ণ ছিল জন্মনির্ভর। সুতরাং সমাজে জাতিগতভাবে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মানুষের কোনো হাত নেই। জন্মই নির্ধারণ করে কে উঁচু শ্রেণির, কে নিম্ন শ্রেণির।

Dhaka University Institutional Repository

শিবায়নে সমাজের পেশাজীবী শ্রেণির পরিচয় পাওয়া যায় যা পূর্বের মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ। যেমন :

তখন গোবিন্দ গাইয়া গোয়ালার ঘরে।
গব্য নিল গৌরী গুহ গণেশের তরে ॥
চাষা দিল শশা ফুটি আলু শাক কচু।
করলা কুমড়া কচি কাচকলা কিছু।
মোদকের মন্দিরে মহেশ তোলে তোলা ॥
নাড়ু মুড়ি মুড়কি সোনামতি ছোলা ॥
থালি পুর‍্যা তেলিঘরে তৈল লয়্যা শেষে।
বণিকের বাটী গেল বিজয়ার আশে ॥
বিরহিণী বান্যানী বসিয়াছিল একা।
বৃদ্ধের বনিতা তায় বিদ্যার কি লেখা ॥
হর বলে হেট হৈলে হয় নাই কেন।
বুড়ার বিক্রম কিসে বাড়ে যোগী জান ॥

((শিবায়ন, পৃ. ৯৯)

বাগদী, কোচ, শাঁখারি ছাড়াও ব্যাধশ্রেণির উল্লেখ আছে, যারা সমাজের অন্তে বসবাস করে। যেমন :

সর্ব্বদা হিংসক হন দুর্জ্জন দুষ্কৃতি ॥
খর্ব্ব খল কৃষ্ণবর্ণ তপ্ত তাম্র কেশ।
পিঙ্গললোচন পাপী পিশাচের বেশ ॥
পশুহিংসা সজ্জা তার পরিপূর্ণ ধাম।
বাগুরা সল্ল্যাদি কর্‍্যা কত লব নাম ॥
একদিন সেই ব্যাধ প্রবেশিয়া বনে।
বধিল বিস্তর পশু বিস্তর সন্ধানে ॥
মাংসভার বান্ধিয়া মনের অভিলাষে।
গমন উদ্যম কৈল আপনার বাসে ॥

(শিবায়ন, পৃ. ২০২)

নলকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চর্মকার, নাপিত, বেন, রথকার, নিষাদ, পুক্কস এ সকল জাতি সম্পর্কে পণ্ডিতদের ধারণা, কাছাকাছি সময়ে এই সম্প্রদায়গুলো একত্রে চণ্ডাল নামে অভিহিত হতো।[২] *শিবায়ন* কাব্যে চণ্ডালের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায় :

বেশ্যাবৃত্তি কর্‍্যা নিত্য স্বতন্তরা বুলে।
বুকে বস্ত্র রাখে নাই থাকে আল্বচুলে ॥
নিবারিতে নাহি কেহ নহে পরাধীন।
জারগত তার চিত্ত হৈল সারাদিন ॥
চণ্ডাল আইলে আলিঙ্গন দেই তাকে।
দুই লোকে ভয় নাই এইভাবে থাকে ॥
শুক-পক্ষী বিক্রয়ার্থে বাসে আল্য ব্যাধ।

Dhaka University Institutional Repository

বারাঙ্গনা নিল কিন্যা বড় হইল সাধ ॥

(শিবায়ন, পৃ. ১৩০)

ভবদেব ভট্টের বিধান[৩] অনুযায়ী এই সব সম্প্রদায় সামাজিকভাবে 'পতিত' বলে এদের হাতের অন্নগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল এবং অন্নগ্রহণ করলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল। মধ্যযুগের সমাজ-ব্যবস্থায় সর্বত্র সামাজিক কৌলিন্য ও আভিজাত্য, আজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞার প্রাচীরে কোণঠাসা শ্রেণিভেদ প্রথা। ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত মানুষের সমাজ সংগঠন এমনই দৃঢ়বদ্ধ যে, সেই অদৃশ্য বিধাতাকে ফাঁকি দেওয়া কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। হিন্দুধর্মের বা হিন্দুশাস্ত্রের সুবিন্যস্ত দূরতিক্রম্য প্রাচীর ঘেরা ব্রাহ্মণ্য সমাজকে কেউ কেউ পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'সেই কল্পিত পিরামিডের গঠন এইরূপ, সুউচ্চমার্গে অর্থাৎ চূড়ায় ব্রাহ্মণ, মধ্যে শূদ্র সম্প্রদায় আর পদতলে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়।[৪] চূড়ায় অধিষ্ঠিত থেকে ব্রাহ্মণ তার সৃষ্টিকে প্রতি মুহূর্তে নিরীক্ষণ করছেন। বলা সমীচীন যে, ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত মানুষের ভেতর সমাজ প্রবেশ করে সামাজিক মর্যাদায় উঁচু-নিচুতে ভাগ করেছে যার মূল কারণ হচ্ছে আভিজাত্য ও অধিকার।

শিবায়নে বর্ণশ্রেষ্ঠ জাতির পাশাপাশি অন্ত্যজ শ্রেণির উল্লেখ আছে। যেমন :

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অন্যাত্মজ।
হরিভক্ত যে তার বন্দিব পদরজ ॥
অভক্ত ব্রাহ্মণ সে চণ্ডাল হৈতে হীন।
হরিভক্ত চণ্ডালের সে দ্বিজ অধীন ॥
বিষ্ণুভক্তি বিবর্জিত সে কেন ব্রাহ্মণ।
সে কেন চণ্ডাল যার চিত্তে নারায়ণ ॥
অব্যাজে বিষ্ণুর পূজা চণ্ডাল যে করে।
চর্তুব্বেদী ব্রাহ্মণাতিরিক্ত দেখ্য তারে।
অভক্ত দ্বিজাতিরিক্ত চণ্ডাল কেমন।
একভাবে কৃষ্ণসেবে কর্য্যা প্রাণপণ ॥
শবর দ্বাপর যুগে ছিল একজন।
নাম তার চক্রিক চরিত্র বিলক্ষণ ॥

(শিবায়ন, পৃ. ১৪০)

শবর যে নিম্নজাতের সেকথা নিজের উচ্চারণেই ধরা পড়ে :

আমি অতি হীন জাতি নাহি জানি ভক্তি।
সৎলোকের সাক্ষাতে বসিতে নাই শক্তি ॥

(শিবায়ন, পৃ. ১৪৩)

মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ ছাড়া সমগ্র জাতির মানুষ কমবেশি শ্রমের সঙ্গে জড়িত ছিল। যদি সমাজ-সংগঠনের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায়, যারা অতি প্রয়োজনীয় সমাজশ্রমিক তারা ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের বাইরে, অন্ত্যজ অথবা ম্লেচ্ছ পর্যায়ের অধিবাসী। আবার যারা অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository
বিশেষভাবে জড়িত যেমন : স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, চিত্রকর, চর্মকার, ধীবর, রজক প্রভৃতিরও সামাজিক মর্যাদা নেই তারা অসৎশূদ্র পর্যায়ের। বল্লাল সেন সুবর্ণবণিকদের সমাজে পতিত করেছিলেন; *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* সুবর্ণ ও অন্যান্য বণিকদের অসৎশূদ্র পর্যায়ের বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় সমাজে সেই সময়ে বণিকশ্রেণির প্রাধান্য অনেকটা লোভ পেয়েছিল। আনুমানিক অষ্টম শতক থেকেই বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর ও কুটিরশিল্পনির্ভর হয়ে পড়তে থাকে।[৫] সমাজ-ব্যবস্থায় এই প্রভাব ছিল অনেকাংশে এবং সমাজও যে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হতে চলেছে এটাও অসম্ভবের কিছু নয়। ব্রাহ্মণ্য ধারণা ,কল্পনা ও আদর্শের অনুশাসনের বিধানে যে সমাজ-ব্যবস্থায় যাগযজ্ঞ হোমাদি চরম প্রাধান্য লাভ করেছিল সেখানে শ্রম ও শ্রমজীবী শ্রেণি যে নিন্দনীয় এবং তাদের পেশাও যে নিম্নশ্রেণির পেশা হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সুপ্রাচীনকালে ব্রাহ্মণরা ক্রমানুসারে কৃষিকর্ম করতেন যা মধ্যযুগে এসে ততটা দৃষ্টিগোচর হয়নি বরং বৃত্তিভেদনীতি চরমরূপ ধারণ করেছিল এই সময়ে। সমাজ সংগঠনের স্বরূপ এবং আচার-বৈষম্য থেকে এটা বলা সমীচীন যে, ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থায় সমতার বিধানকে যেভাবে অস্বীকার করা হয়েছে ঠিক সেভাবেই অসাম্যকে বিধিবদ্ধ ও সংঘটিত করা হয়েছে। বর্ণাশ্রম প্রথা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের পার্থক্যের বিরুদ্ধে সে সময় বাঙলায় যে প্রতিবাদ ছিল না তা নয়। এই প্রতিবাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা এখনো সম্ভব হয়নি তবে প্রতিবাদের ধারাটি যে খুব দুর্বল ছিল তা বোঝা যায়।[৬] ভাগবতধর্মী ও সহজযানী সাধকদের মধ্যে প্রতিবাদের সুর শোনা যায়। ভাগবত প্রথা অনুসারে অন্ত্যজ, কিরাত, হূণ, অন্দ্র, পুলিন্দ, আভীর প্রভৃতিদেরও সমানাধিকার স্বীকার করেছে। সহজযানী সাধকদের বক্তব্য, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। এদের চিন্তার দিকটির সাথে পরবর্তীকালের মরমীয়া সাধকদের মতবাদের সাদৃশ্য লক্ষ করার মতো। কিন্তু এই প্রতিবাদ সমাজে স্বীকৃতি পায়নি। বর্ণভেদ প্রথা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের জোয়ারে তা তলিয়ে গিয়েছে। স্মৃতিকারদের রচনাবলিই বেঁধে দিয়েছিল জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রধান রূপরেখা।

শিবায়নে তৎকালীন বাংলার নিপীড়িত মানুষের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস আজও আমাদের শিহরিত করে। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য *শিবায়ন* কাব্যে দরিদ্রতার একটি চমৎকার রূপ দেখাতে পেরেছেন যা করুণ রসে আপ্লুত। জীবনে ভোগের আনন্দ, চাওয়ার আনন্দ এতই তীব্র যে দরিদ্র স্বামী দরিদ্র স্ত্রীকে জেনেশুনে বিপদে ফেলে সেই পরিস্থিতি থেকে আনন্দটুকু গ্রহণ করেন; এই চাওয়া পাওয়ার মধ্যেই লৌকিকতা বিদ্যমান। *শিবায়ন* কাব্যে দেখা যায় :

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি ॥
তিন জনে একুনে বদন হৈল বার।
দুটি হাতে গুটী গুটী যত দিতে পার ॥
তিন জনে একেবারে বার মুখে খায়।
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায় ॥
দেখ্যা দেখ্যা পদ্মাবতী বস্যা এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মুচ করিয়া হাসে ॥
সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায়্য হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে ॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।

Dhaka University Institutional Repository

হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হৈয়্যা খা ॥
মূষগ মায়ের বোলে মৌন হয়্যা রয়।
শঙ্কর শিখায়্যা দেই শিখিধ্বজে কয় ॥
রাক্ষস-ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে ॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সুপ দিলা বেসারির পরে ॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি ॥
দড়বড় দেবী আন্যা দিল ভাজা দশ।
খাইতে খাইতে গিরিশ গৌরীর গান যশ ॥
(শিবায়ন, পৃ. ১০৪-১০৫)

শত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও বাঙালি অন্ত্যজ শ্রেণি আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে ইচ্ছা পোষণ করে। বাঙালি গৃহবধু ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে স্বামীগৃহে কঠোর পরিশ্রম করতে কষ্টবোধ করে না। প্রাণপণ পরিশ্রমে বিবিধ অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করে স্বামীপুত্রের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারলে আপনার জীবনে সে চরিতার্থতা লাভ করল বলে বিশ্বাস করে। সে নারী সন্ধ্যায় শুভ্রশুচি বস্ত্র পরিধান করে চতুর্দিকের মঙ্গল-শঙ্খধ্বনির মধ্যে গৃহ-অঙ্গনস্থ তুলসীবেদীমূলে চম্পক বিনিন্দিত হস্তে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে স্বামী-সন্তানের মঙ্গল কামনা করে, গৌরী সেই চিরায়ত নারীসত্তা।

শিব-গৌরীর দারিদ্র্যের সংসার অভাবের কারণে তাদের দাম্পত্য জীবনে মাঝে মাঝে কলহের ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায়, আবার মিলনের পূর্ণানন্দে তাদের জীবন ভরপুর হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক অন্ত্যজ শ্রেণির দারিদ্র্য-পীড়িত স্বামী সর্ব্বংসহা স্ত্রীর "দুটি বাই শঙ্খ পরার" অতি সামান্য আশাও পূর্ণ করতে অসমর্থ। 'শঙ্খ পরিধান' অংশটি পড়তে পড়তে মনে হয় দারিদ্র্য-পীড়িত কবি আপন হৃদয়ের মর্মকথা তথা বাঙলার নিম্নবিত্ত ভদ্রলোকের দুঃখময় জীবনের কথা ব্যক্ত করেছেন।

"শঙ্খ পরিধান" অংশটি কবিকঙ্কণের ফুল্লরার বারমাস্যায় যেমন ফুল্লরার দুঃখ সঙ্গীতের ধ্বনিটি নিবিড় করুণ-রসের মধ্য দিয়ে ট্রাজেডি-সুলভ মহিমায় ভরে উঠেছে ঠিক তেমনি শিব ঠাকুরের নিকট ভগবতীর শঙ্খ প্রার্থনার করুণ ধ্বনিটি ট্রাজেডিপূর্ণ। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্ম-বিবাহ প্রভৃতি উৎসবগুলোর কোনটাকেই স্তরভেদে বাঙালিরা ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে আবদ্ধ রাখেনি। সমস্ত উৎসবে তারা সঙ্কীর্ণতা বিসর্জন দিয়ে তাদের গৃহের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র আত্মীয়-স্বজনের জন্য নয়, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য নয়, অনাহত, রবাহত সকলের জন্য এই দ্বার উন্মুক্ত ছিল। *শিবায়ন* কাব্যে গৌরীর জন্ম ও বিবাহ পালায় এই চিত্র দেখা যায়। গৌরীর জন্ম লাভ :

দেখিয়া কন্যার মূর্ত্তি হিমালয় কৃতকীর্ত্তি
আপনে জানিয়া করে দান।
লোচনে প্রেমের ধারা কহে কেহ মোর পারা
ত্রিভুবনে নাহি ভাগ্যবান ॥
লইয়া বান্ধব জনে বাদ্যগীত কোলাহলে

Dhaka University Institutional Repository

করিল কৌলিক মহোৎসব।

শ্রবণে কলুষ হরে কর্ণের কৌশল করে

দ্বিজ রামেশ্বর মুখরব ॥

(শিবায়ন, পৃ. ৪৭)

গৌরীর পিতা হিমালয় বন্ধুগণকে সঙ্গে নিয়ে উৎসবাদি সম্পন্ন করতেন, আবার মাতা মেনকা এয়োগণকে সঙ্গে নিয়ে "জল-সহিতে"[৭] যেতেন। জন্ম ও বিবাহের দশ কর্মবিধি বর্তমানে বাঙালি সমাজে প্রচলিত থাকলেও কন্যার বিয়ের ঠিক পূর্বে সন্ধ্যাকালে মেয়েরা 'জল সায়' অনুষ্ঠানটি সাড়ম্বরে সম্পন্ন করতেন। বর্তমানে এই 'জল সায়' অনুষ্ঠানটির নাম 'গঙ্গাবরণ' পূর্বের ন্যায় আড়ম্বরে পালন করা হয় না।

অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন, কোন দিন হল-কর্ষণ করতে নাই, নিষিদ্ধ দিনে কর্ষণ করলে কী ক্ষতি হয়, তা তারা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন । যেমন :

সেই সেই কালে যার হয় হল-যোগ।

ধরা শস্য হরে ধান্যে ধরে নানা রোগ ॥

বৃষ কান্দে বাসব বরিষে নাই বাড়া।

তেঞী হাভাতিয়া চাষী হয় লক্ষ্মী ছাড়া ॥

(শিবায়ন, পৃ. ২৩৭)

নিষিদ্ধ দিনে হল-প্রবাহ বন্ধ থাকলেও কৃষাণের কাজ বন্ধ থাকে না। সেদিন কৃষাণ কৃষিক্ষেত্রের আগাছা পরিষ্কার করে। যেমন :

হাল কামাঞের দিন হর দেন বল্যা।

গাছি মার‍্যা হুড়া গাছি পাড়ে রাখে তুল্যা ॥

(শিবায়ন, পৃ. ২৩৭)

শিবায়ন কাব্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিব একজন কৃষক। কিন্তু কৃষক হলেও প্রত্যক্ষ কৃষিকার্যে তার অসীম অনাসক্তি অবশ্য এই অনাসক্তির ভাবটুকু তার চরিত্রের উপর পৌরাণিক চরিত্রের প্রভাবের ফল বলা সমীচীন হবে।

শিবের এই ঔদাসীন্যের কারণেই তিনি সাংসারিক অভাব-অনটনের যন্ত্রণা ভোগ করে থাকেন। আবার অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছলতার জন্য তিনি কৃষিকাজে মনোযোগী না হয়ে বরং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে থাকেন। ঠিক একইভাবে অর্থনৈতিক অন্ত্যজ শ্রেণির কৃষকগণ একদিকে যেমন কৃষিকার্য দেব-বৃত্তি বলে নির্দেশ করে এর ওপর এক অপরূপ গৌরব দান করেছিল। অন্যদিকে তেমনি ভিক্ষাবৃত্তিকেও দেব-বৃত্তি বলে উল্লেখ করে নিষ্ক্রিয় জীবনে মহিমা-কীর্তন করেছিল। সুতরাং মধ্যযুগের সমাজে জন্মগতভাবে ধর্ম নির্ণয় যেমন ছিল তেমনি বর্ণ অনুযায়ী বৃত্তিও ঠিক ছিল, প্রকৃতঅর্থে এসব কিছুই নির্ভর করত কোন শ্রেণিতে তার জন্ম হয়েছিল তার ওপর, পরবর্তীতে সমাজ এই প্রথাকে একই জায়গায় স্থির থাকতে দেয়নি।

কৃষকের কল্যাণকর দেবতারূপে উত্তরবঙ্গের কোচ সমাজে যে শিব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পরিকল্পিত শিবের চরিত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য রয়েছে,কারণ এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মৌলিক জাতিগত পরিচয়ের পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল সাধারণত রাঢ় নামে পরিচিত পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল হতে মৃগয়াজীবী কোল, মুণ্ডা জাতির এক শাখা বসবাস করেছিল। উত্তরবঙ্গের কোচ জাতীয় অধিবাসীদের মত তারা কৃষিজীবী ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

সেই জন্যই স্বভাবতই কৃষিকার্যের সহায়ক কোনো দেবতারও তাদের মধ্যে কোনো স্থান ছিল না। এই কোল, মুণ্ডা জাতির প্রধান দেবতার নাম ছিল মরাং বুরো, ইনি পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা। ইনি মানবের মহা অনিষ্টকারী। উপযুক্ত পূজা না পেলে নানা দুর্বিপাক সৃষ্টি করে তিনি গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে ফেলেন। কালক্রমে হিন্দু ধর্ম যখন এই কোল, মুণ্ডা জাতি অধ্যুষিত বাংলায় এই পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে, তখন স্বভাবতই এদেশে এই অনার্য জাতি প্রভাবিত হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা শিবকে এই প্রকার রক্ত-পিপাসু ও ভয়ঙ্কর বলে কল্পনা করল। সুতরাং তাকে তারা তাদের মরাং বুরোর মতো পশুবলি দ্বারা পূজা দিয়ে খুশী করতে শুরু করল।

পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে আর্য সভ্যতার প্রভাব অধিকতর হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে শিব সম্পর্কিত এই মনোভাবের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটেনি। শিবচরিত্রের এই অভিনব পরিচয় শুধুমাত্র পৌরাণিক শিবধর্মেরই যে বিরুদ্ধে তা নয়, বঙ্গদেশের আর কোনো অঞ্চলে এই প্রথা দৃষ্টিগোচর হয় না।

শিবায়ন কাব্যটি যখন রচিত হয় তখন মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা তার সৃজনযুগ অতিক্রম করে ঐশ্বর্যযুগে প্রবেশ করছে এর মাত্র কিছুকাল পূর্বে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর সুপ্রসিদ্ধ মঙ্গলকাব্য *কবিকঙ্কণচণ্ডী* বা *চণ্ডীমঙ্গল* রচিত হয়। তখন পর্যন্ত চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব সমগ্র সমাজের ওপর হতে একেবারে দূর হয়ে যায় নাই ফলে সমাজের নৈতিক দৃঢ়তা তখন পর্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। এই পরিবেশের মধ্যেই 'রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র তাঁর *শিবায়ন* কাব্যটি রচনা করেন কিন্তু সেই নৈতিক পরিবেশ সমাজের মধ্যে অধিককাল স্থায়ী হতে পারেনি। কবি 'রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র' তাঁর *শিবায়ন* কাব্য রচনার এক শতাব্দীরও অধিককাল পর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য *'শিব-সঙ্কীর্ত্তন'* বা *শিবায়ন* কাব্যটি রচনা করেন। সমাজের নীতিবোধ ইতোমধ্যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পথ অনুসরণ করিয়া খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দী ও এমনকি বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু কবি শিব মাহাত্মসূচক কাব্য রচনা করিয়াছেন। ...কিন্তু কবি রামেশ্বর যুগের রুচি ও রসবোধকে তাঁহার কাব্য রচনার ভিত্তি করিয়া লইয়াছিলেন; তিনি জাতীয় একটি সাংস্কৃতিক ধারার অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা এই বিষয়ক তাঁহার ভবিষ্যৎ কবিদিগেরও পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।[৮]

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় *শিবায়ন* কাব্যেও রামেশ্বর ভট্টাচার্য সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণ *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* ও *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। *শিবায়নে* শিব একেবারে লৌকিক, তার চাষাবাদ পদ্ধতিই এই লৌকিকতারই প্রমাণস্বরূপ। শিবের কৃষিকার্যের বিষয়গুলো কোনো কোনো স্থানে অভিনীত হতে দেখা যায়, 'একজন বীজ ছড়ায়, একজন লাঙ্গল দিয়ে মাটি চাষ করে, দুই ব্যক্তি হালের বলদের অভিনয় করে জোয়াল কাঁধে নিয়ে টানে, কোনো ব্যক্তি পাকাধান কাটবার অভিনয় করে তাকে মূল সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করে 'বলি শিবঠাকুর, কত ধান হলো? উক্ত ব্যক্তি একটি জবাব দেয়, জবাব হতেই সকলে সেই বছরের ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ বুঝে নেয়।[৯] উক্ত ঘটনার সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যায় সাঁওতালদিগের ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যে 'বহা পরব' অনুষ্ঠিত হয় তার মাধ্যমে :

> On arriving at the *Jahen*, Jaherera sweeps the *thanas,* the naeka asks the *bongas* i.e those personating the gods, for the things they have brought, and places them on a mat. He next proceeds to ask them questions, a proceeding which probably was originally an attempt to find out something about the coming year.[১০]

শিবায়ন কাব্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘৃণার সম্পর্ক তৈরি করেছে বর্ণভেদ প্রথা। অসংখ্য নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও নিম্নবিত্তের মুসলমান বর্ণহিন্দুরা যাদের অন্ত্যজ জ্ঞান করত এবং বর্তমান গবেষণায় অধিকারহীন যারা

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকেও অন্ত্যজ ব্যাখ্যা করে আলোচনার পরিধি নির্মাণ করা হয়েছে। সামাজিক ব্যাধি হিসেবে বর্ণভেদ প্রথা যা বংশানুক্রমিকভাবে এক শ্রেণির মানুষ অন্য শ্রেণির মানুষকে জন্মগতভাবে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র ভাবতে শেখায় সে সম্পর্কিত আলোচনা এ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ জীবন

বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর্য মতবাদ বলেই এ সকল ধর্ম প্রচারের উদ্যোগ তাদেরই ছিল। বাঙলার বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য বা জৈন মতবাদ প্রচারের আগে এদেশে ছিল বিভিন্ন কোমের বসবাস।[১১] তাদের বিশ্বাসের জায়গাটিতেও ছিল ভিন্নতা। নিজস্ব ধর্মানুভূতি থেকে সব কোমের ছিল নিজস্ব ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি। আর্যরা যখন তাদের বিশ্বাস নিয়ে এদেশে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল, তারা নিজেদের শ্রেণিসমাজের রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা, সমাজ-ব্যবস্থা বিভিন্ন কোমশ্রেণির ওপর চাপিয়ে দিতে উদ্যত হল, তখন স্বাভাবিকভাবেই কোমশ্রেণি সেটা স্বেচ্ছায় মেনে নিতে অস্বীকার করল। এর ফলে তাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হল। এই বিরোধ শুধু যে অধিকার বিস্তারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রইল তা নয় এর পরিধি সর্বত্র বিরাজ করল। ধর্মচেতনাও বিরোধের এইরূপ একটি ক্ষেত্র। *শিবায়ন* মধ্যযুগীয় কাব্য কিন্তু তার আখ্যানভাগটি যতদূর মনে হয়, বহু প্রাচীনযুগের স্মৃতিবহ যার পেছনে যে একটি সামাজিক, রাজনৈতিক সংঘাত সক্রিয় ছিল, একথা বলা সমীচীন একমাত্র শিবঠাকুরের চরিত্রের মাধ্যমেই।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন সমাজের উপরতলা থেকে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে ঠিক সে সময়ই বাঙলার লোকায়ত পর্যায়ে নানা সাহিত্য রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য ও বাউল সাহিত্য। গ্রামে গ্রামে আজও বাউলরা বিদ্যমান। এরা সমাজের উচ্চকোটির লোকদের ঐশ্বর্যকে যে খুব একটা সম্ভ্রমের চোখে দেখত না এটা অনুমান করা কঠিন নয়। হিন্দুসমাজের নিচের স্তরের ধর্ম ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল প্রধানত কৌমসমাজ থেকে আগত সংস্কার-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদির একত্রকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। জাদুভিত্তিক ক্রিয়াকর্ম, গ্রাম্য দেবদেবীর অর্চনা ও তাদের সম্পর্কে ভয়-ভক্তি ও কৌতূহল, প্রতীক-পূজা, কৌলচিহ্ন বা টোটেম-পূজা, অশরীরী ভূতপ্রেতের পূজা প্রভৃতি লোকসমাজে চালু ছিল। এ জাতীয় সংস্কার ও অনুষ্ঠানাদি বিশ্লেষণ করলে বোধহয় এগুলির জড় খুঁজে পাওয়া যাবে আদিম কোমগুলির মধ্যে প্রচলিত প্রজনন-শক্তির পূজার্চনায় এবং জাদুকর্ম ও জাদুবিশ্বাসের ঐতিহ্যে।[১২] গুপ্ত আমল থেকে শুরু করে মুসলমানদের শাসনকাল পর্যন্ত বাংলার হিন্দু সমাজের উপরের স্তরটিকে যদি এক নজরে দেখা যায় তবে মনে হবে যে, বিভিন্ন অনার্য উপকরণের সঙ্গে এ সমাজে এসে মিশেছিল বৈদিক, পৌরাণিক, বৈষ্ণব, শৈব-শাক্ত ও সৌর উপাদান।[১৩] একদিকে সৃষ্টি হয়েছিল লৌকিক দেবদেবীর অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসম্মত দেবায়তনের। এ দুয়ের মধ্যে মিশ্রণ ও সমন্বয়ও ঘটেছে আবার অন্ত্যজ বলে ব্রাহ্মণ্য উচ্চশ্রেণি দ্বারা শোষিত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এই সংস্কৃতি সংগঠনের প্রক্রিয়ায় কাজ করেছে কতকগুলো রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক শক্তি। এইজন্য সমাজের উচ্চস্তরে আর্য ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রবলতা ছিল এবং অনার্য লৌকিক উপাদানের প্রভাব থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত মৃদু ও অন্তঃশীল।[১৪]

মুসলমানদের আগমনের ফলে হিন্দু রাজশক্তি ও সামন্তশক্তি ধ্বংস হলেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম, পুরোহিততন্ত্র ধ্বংস হয়নি বরং পূর্বের তুলনায় আরো রক্ষণশীল রূপ নিয়ে সুসংহতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। চৌদ্দ ও পনের শতকে লেখা *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে* বর্ণব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামোর একটি নতুন ছক আমাদের চোখে পড়ে যা পূর্বে আলোচনা করেছি। বর্তমান সময়ের হিন্দু সমাজের বর্ণ-জাতি শ্রেণি-বিন্যাসের সাথে এই ছকটি অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। উক্ত সমাজ-কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত। অবশিষ্ট লোকজনের স্থান বিভিন্ন শ্রেণির শূদ্র বা অন্ত্যজের স্তরে।

ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সবচেয়ে উঁচু বর্ণের লোক। তারাই এই সমাজ-কাঠামোটি বেঁধে দিয়েছিলেন। কৃষিনির্ভর সামন্ততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের সঙ্গে তাদের দীর্ঘকালের সম্পর্ক যেন তাদের মানসিকতায় এ ধরনের আভিজাত্যবোধ ও উৎপাদনবিমুখ প্রবণতার সৃষ্টি করেছিল। যতই শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছিল,

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদক কারিগর-শিল্পী বণিকশ্রেণিকে ততই যেন তারা বর্ণব্যবস্থার নিম্নস্তরে ঠেলে দিচ্ছিলেন অথবা বর্ণাশ্রম নিয়মনীতির বাহিরে রেখে অন্ত্যজ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি নিশ্চল, শ্রমবিমুখ সামন্ত-তন্ত্র বা পুরোহিত-তন্ত্রের সঙ্গে বিকাশমান ও উৎপাদনকেন্দ্রিক শিল্পতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের বিরোধ সম্বন্ধে যেন ইঙ্গিত দেয়। পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রেও যেন রক্ষণশীল ও প্রতিরোধমূলক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।[১৫] ব্রাহ্মণ্যসমাজে কৌলিন্যবাদও এই সময়ে দানা বেঁধেছিল। বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ততান্ত্রিক দেবদেবীর পূজার্চনা রাঢ়, মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বোধহয় পূর্বের মতোই চলছিল।[১৬] ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে অনার্য সংস্কৃতির প্রাধান্যের প্রক্রিয়া শুরু না হলেও পঞ্চদশ শতক থেকে আনার্য দেবদেবীর ব্যাপক প্রভাব নির্দেশক বিজয় বা মঙ্গলকাব্য রচনার ঐতিহ্য গড়ে উঠত না। এই অনার্য দেবদেবীর মধ্যে মনসা, চণ্ডী, বাশুলী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই দেবদেবীর প্রভাব বৃদ্ধির ফলে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির চেহারাও বদলে যাচ্ছিল। বিষ্ণুর অন্যতম অবতার কৃষ্ণের পৌরাণিক রূপ বদলে গেল। কৃষ্ণ দেখা দিলেন রাধা ও অসংখ্য গোপবালিকার প্রণয়লীলার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। পৌরাণিক দেবলোক ছেড়ে শিব গৃহস্থ কৃষকের রূপ নিলেন, কৌম সমাজের প্রভাবে তার প্রতিষ্ঠা হল ফসল উৎপাদন ও প্রজনন-শক্তির প্রতীক হিসেবে।[১৭]

লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি প্রাক্-মুসলিম যুগের সমাজেও বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তারা তখন রাজসভা, বণিকশ্রেণি ও বিত্তশালী লোকজনের পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি বলে লৌকিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সমাজের নিম্নতমস্তরে অনেকটা চাপা পড়েছিল। লৌকিক দেবদেবী, কৌমসমাজের জড়োপাসনার প্রতীক ও কৌলচিহ্ন এখন সহজেই সমাজের পরিধি পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। মুসলিম শাসন এই সাংস্কৃতিক রূপান্তরের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হতে পারে।

বহিরাগত শৈবধর্ম বাংলার সমাজের উচ্চতর স্তরেই সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়েছিল তা থেকে ক্রমে নিম্নতর সমাজেও প্রসার লাভ করে।[১৮] নিম্নতর সমাজের মধ্যে প্রচারিত হয়ে শৈবধর্ম তার পৌরাণিক আদর্শ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। নিম্নতর অন্ত্যজ সমাজ নিজস্ব সংস্কারের ভিত্তির ওপর উচ্চতর সমাজ হতে সর্বদা তার সকল বিষয়ে জ্ঞান ও প্রেরণা লাভ করে থাকে কিন্তু প্রকৃত মানসিক শিক্ষার অভাবে যে সকল উপাদান ও উপকরণ উচ্চতর সমাজ হতে গৃহীত হয়, তার মধ্যে যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং নিম্নতর সমাজের সংস্কার অনুযায়ী তারা নতুন রূপে, নতুন আঙ্গিকে পুনর্গঠিত হতে থাকে। অনেক সময় তা এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে যে তারা তাদের মৌলিকতা হারিয়ে ফেলে, প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> পৌরাণিক শৈবধর্ম যখন উচ্চতর হিন্দুসমাজ হইতে ক্রমে নিম্নতর সমাজের মধ্যেও প্রচার লাভ করিল, তখন ইহা এইভাবে নূতন রূপ লাভ করিল– তাহা বাংলাদেশের সর্বত্রই যে অভিন্ন হইল তাহা নহে; কারণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই এই নূতন পরিকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই জন্য ইহার মধ্যে আদর্শগত অনৈক্যও অনেক সময় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে মূল পৌরাণিক আদর্শ হইতে এই সকল স্থানীয় পরিকল্পনা অত্যন্ত দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল।[১৯]

ব্রাহ্মণ্যধর্ম এদেশে প্রচার লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বহু উপাদান এসে লৌকিক শৈবধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হতে শুরু করে। পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনাও বুদ্ধদেবের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল সুতরাং তদানীন্তন বৌদ্ধসমাজ শিবের চরিত্রের মধ্যেই নিজেদের আদর্শবোধের সন্ধান করেছিল। জৈন তীর্থঙ্করদিগের জীবনাদর্শ গৌতম বুদ্ধ ও পৌরাণিক শিবের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। এই জন্যই কালক্রমে তৎকালীন বাংলার বিরাট বৌদ্ধ ও জৈনসমাজ নিজেদের ধর্মীয় উপকরণ দ্বারা এদেশের শৈবধর্মকে অভিনবরূপে পুনর্গঠন করে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশে তৎকালীন সময়ে আরও একটি ধর্মের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক প্রচলন ছিল সেই ধর্মটি, নাথধর্ম। শৈব কিংবা বৌদ্ধধর্মের বাইরে এর উদ্ভব হলেও শৈবধর্মের ব্যাপক প্রসারবশত কালক্রমে এর মধ্যে গিয়েও শৈবধর্মের উপকরণরাশি প্রকাশ লাভ করে। ফলে নাথ সিদ্ধাচার্যগণ শিবকেই গুরু বলে মেনে নেয়। ক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও নাথ অনার্য– এই সকল ধর্মমত হতে উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলার লৌকিক শৈবধর্ম এক অভিনব সঙ্কর রূপ ধারণ করল।

গৌরী-পার্বতীর অধিকাংশ মূর্তির পাদদেশে আছে একটি করে গোধিকা-মূর্তি এবং কতকগুলি প্রতিমায় দু'পাশে দেখা যায় দুটি কলাগাছ। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে পণ্ডিতগণ বাংলার আঞ্চলিক উপাদান এবং লোকধর্মের উপকরণ বলে মনে করেছেন। দেবীর উপবিষ্ট মূর্তি বিরল। এই মূর্তিগুলির কারো চার, কারো ছয়, কারো আবার বিশ হাত। কেউ সর্বমঙ্গলা, কেউ পার্বতী বা ভুবনেশ্বরী, কেউ আবার মহালক্ষ্মী নামে পরিচিতা। হাতের সংখ্যা ও লক্ষণ, আসন, বাহন, পরিবার, দেবতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের ওপর এই নাম,পরিচয় নির্ভরশীল।

উল্লিখিত মূর্তিগুলি দেবী গৌরীর সৌম্যরূপের প্রতীক। দেবীর উগ্ররূপগুলির মধ্যে মহিষমর্দিনী দুর্গা প্রধান। এই রূপের দুর্গার প্রাচীন মূর্তিগুলি অষ্টভুজা অথবা দশভুজা। অন্য মূর্তিগুলি রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনাসিকা, চণ্ডা, চণ্ডবর্তী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা। এই দেবীদের প্রত্যেকের ষোল হাত, বারো ও ষোল হাতযুক্ত মহিষমর্দিনী মূর্তিও পাওয়া গেছে। সেন ও বর্মণ আমলের লিপি ও মূর্তির তথ্য থেকে এবং স্মৃতিশাস্ত্রাদি রচনার প্রবলতা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মধ্যযুগে পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল খুব বেশি। এ কথা অবশ্য অস্বীকার করা যাবে না যে, প্রত্ন ও সাহিত্যিক উৎসে প্রতিফলিত এই ধর্মীয় ও সামাজিকজীবন উচ্চস্তরের মানুষের সমাজজীবন।[২০] সে জীবনচর্যায় ছিল বিশুদ্ধ আর্য সংস্কৃতি ও হিন্দু-বৌদ্ধতান্ত্রিক সংস্কৃতির স্তর। সমাজে সর্বনিম্নস্তরে অনার্য সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। বর্ণভেদ প্রথার অন্ত্যজ শ্রেণিটি এখানে শূদ্র অথবা অস্পৃশ্য শ্রেণিতে স্থাপন করা হয়েছিল তবে স্তরবিন্যাসের সীমারেখাগুলি অতিক্রম করে একস্তর থেকে অন্যস্তরে *শিবায়ন* কাব্যের উপকরণের অনুপ্রবেশও ঘটেছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

মঙ্গলকাব্যের যুগে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা ছিল বোধহয় প্রধানত কৌমসমাজের লোকজন। তিব্বত অভিযানের পথে বখতিয়ার মেচ কোমের জনৈক প্রধানকে মুসলমান বানিয়ে আলি নাম দিয়েছিলেন। কৌম প্রধানের ইসলাম গ্রহণের অর্থই ছিল সমগ্র কোমেরই ইসলামগ্রহণ। বজ্রব্রহ্মা ও অম্বুনাথ ছিলেন বিভিন্ন কৌমগোষ্ঠীর আবাসস্থল কামরুপের নাথ সম্প্রদায়ের লোক। ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায়, বঙ্গদেশের সিলেটের পাহাড়ি এলাকার লোকজন শাহজালালের (রহঃ) কাছে ইসলামে দীক্ষা নিচ্ছিল। আর এই শৈখের কেরামত প্রদর্শনের শক্তির কথা জনসধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।[২১] ওই পাহাড়ি লোকজন ছিল জাদুশক্তিতে বিশ্বাসী অস্ট্রিক ও মোঙ্গলীয় কোমের লোকগোষ্ঠী। কেরামতিতে অভিভূত হয়ে তাদের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* যবন নামে পরিচিত একদল লোককে পুলিন্দ, পুককশ, খশ, সূক্ষ্ম, কম্বোজ, শবর, খর প্রভৃতি আদিম কোমের সঙ্গে ম্লেচ্ছ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[২২] স্বভাবতই মনেহয়, যবনগণ এক্ষেত্রে কোনো একটি কোমের ধর্মান্তরিত মুসলমান। *ব্রহ্মবৈর্বতপুরাণে*ও জোলা সম্প্রদায় ব্যাধ, কোল, কোচ, ডোম, বেদে প্রভৃতি কোমের সঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।[২৩] মুসলমান জোলারাও ছিল বোধহয় কোনো তাঁতি কোমের লোক। স্থানীয় মুসলমানদের কোনো সমাজ খুব সম্ভব তখনো গড়ে ওঠেনি। সেইজন্য সদ্য ধর্মান্তরিত অথচ ইসলামের আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে অপরিচিত যবন ও জোলাদেরকে হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার বাহিরে (বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃত) অন্ত্যজ পর্যায়ে রেখে দেয়া হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিবায়ন কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ

দেবতা হিসেবে শিবের স্থান সবার উর্ধ্বে। মহাদেবাদিদেবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মঙ্গলকাব্যের সকল কবি তাঁদের কাব্যে শিবের স্থান করে নিয়েছেন। *শিব-সঙ্কীর্ত্তন* বা *শিবায়ন* কাব্য হিসেবে বিশিষ্ট এ কারণে যে, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীরা নিজে আড়ালে থেকে মানব-মানবীকে পাত্র-পাত্রী করে মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা করেছেন। তবে *শিবায়ন* কাব্যে শিবই নায়ক। মানব জীবনের হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া-না পাওয়ার এক বিশাল সমারোহ শিব-পার্বতী চরিত্রের মাধ্যমে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। গতানুগতিক নয় বলেই এই কাব্য স্বতন্ত্র্য ও এর স্বাদেও রয়েছে ভিন্নতা। সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> রামেশ্বরের শিবায়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির অন্যতম। রচনা-ভঙ্গী ভারতচন্দ্রের মত সুন্দর না হইলেও ইহার কাব্যে সাধারণ মানুষের ঘরগৃহস্থালীর ব্যাপার অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তাহা ছাড়া কাব্যটিতে বিকৃতরুচির বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই। কবি যথার্থই লিখিয়াছেন "ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর।[২৪]

কবি তাঁর কাব্যের বহুস্থানে এইরূপ ভনিতা দিয়েছেন। মনেহয় কবি গ্রাম্য অশ্লীল শিবকাহিনিকে মার্জিত ও পরিশুদ্ধ করে ভদ্রকাব্য রচনা করতে চেয়েছেন।

শিবায়ন সাতপালা ও জাগরণ-আরম্ভ পালায় সমাপ্ত। প্রত্যেক দিন ও রাত্রিতে এক পালা গীত হওয়াই এই কাব্যের রীতি। তারমধ্যে প্রথম হতে তৃতীয় পালার কিয়দংশে পুরাণাশ্রিত কাহিনি অনুসৃত হয়েছে। প্রথম পালায় পুরাণানুসারী সৃষ্টি, দেবতাদের উৎপত্তিকথন, দ্বিতীয় পালায় দক্ষযজ্ঞ নাশ ও সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের ছাগমুণ্ডের কাহিনি, তৃতীয় পালায় হিমালয় গৃহে গৌরীর জন্ম, হিমালয় গৃহে শিবের আগমন, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের অপরাধে মদনভস্ম ও রতিবিলাপ, গৌরীর তপস্যা, গৌরী ও ছদ্মবেশী শিবের বাক্যপ্রবন্ধ, শিবের বিবাহ প্রভৃতি স্থান পেয়েছে।

এই পর্যন্ত পৌরাণিক কাহিনির ধারা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসৃত হয়েছে। পদ্মাপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, নন্দিকেশ্বরপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি পৌরাণিক ও ক্লাসিক সাহিত্য হতে কবি পৌরাণিক কাহিনির উপাদান সংগ্রহ করেছেন।[২৫] পার্বতী-শিবের বিবাহের পর হতে পৌরাণিক কাহিনি ধীরে ধীরে অপসৃত হতে শুরু করেছে অপরদিকে কৃষিপ্রধান জীবন হতে উত্থিত লৌকিক শিবের কাহিনির আবির্ভাব ঘটেছে। *শিবায়নের* পৌরাণিক অংশে পুরাণের ঘনিষ্ঠ অনুকরণের জন্য কবি এই অংশে বিশেষ কোন মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।[২৬]

তৃতীয় পালার মাঝামাঝি হতে রামেশ্বর ভট্টাচার্য লৌকিক কাহিনি অনুসরণ করেছেন। বরবেশী শিবকে দেখে মেনকার বিলাপ, শিবের মোহনমূর্তি ধারণ, হর-গৌরীর বিবাহ, এই স্থানে তৃতীয় পালা সমাপ্ত হয়েছে। চতুর্থ পালায় শিবের গার্হস্থ্যজীবনের লৌকিক কাহিনির চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে, মহাদেবের ভিক্ষা-উপজীবিকা, হরগৌরীর কলহ, ঝুলি হতে শিবের ধনরত্ন বের করা, হরগৌরীর নানা তত্ত্বকথা আলোচনা, রামনাম মাহাত্ম্য ও হরিনাম মাহাত্ম্য ঘোষণা, এই স্থলে চতুর্থ পালা সমাপ্ত। চতুর্থ পালায় মূল ঘটনা বহির্ভূত ভক্তি ও তত্ত্বকথা অধিক স্থান অধিকার করে আছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পালায় যথাক্রমে কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ ও বিবাহ এবং বাণরাজার কন্যা ঊষার সঙ্গে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গোপন মিলন এবং সেই প্রসঙ্গে হরিহরের যুদ্ধ এবং সপ্তম পালায় শিবরাত্রির আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। তবে যথার্থ লৌকিক কাহিনি ষষ্ঠ, সপ্তম ও জাগরণ পালায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ পালায় মহাদেবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষিকার্য গ্রহণ এবং সপ্তম পালায় বাগদিনীবেশিনী মহামায়া পার্বতীর সঙ্গে শিবের মাছ ধরা, শিবকে ছলনা করে দেবীর কৈলাসে প্রস্থান এবং শিবেরও কৈলাসে যাত্রা এই কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাগরণ পালায় নারদের প্ররোচনায় পার্বতী স্বামীর নিকট শাঁখা পরার ইচ্ছা পোষণ করলেন, শিব অসামর্থ্য জানালে দেবী পিত্রালয়ে অভিমান করে চলে যান। এই পালায় পার্বতীকে শাঁখা পরিয়ে বৃদ্ধ মহাদেবের পত্নীর মানভঞ্জনের চেষ্টা, সফল হওয়া, অতঃপর হরপার্বতীর পুনর্মিলনে কাহিনি সমাপ্ত হয়েছে। *শিবায়ন* কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে শিব-পার্বতীর গার্হস্থ্যজীবনে। কবির কবিত্ব ফুটে উঠেছে এই অংশে। মহাদেবের কৃষিকার্য, বাগদিনীবেশিনী দেবী কর্তৃক মহাদেবকে ছলনা এবং গৌরীর শঙ্খ-পরিধান, এই অংশে কবির মৌলিকতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

লৌকিক এই কাহিনিগুলো কোনো প্রামাণিক পুরাণে পাওয়া যায় নি। সমাজের অন্তেবাসী মানুষের পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশাভরা কাহিনিই এই কাব্যের এই অংশের আলোচ্য বিষয়। তবে *নন্দিকেশ্বর পুরাণে* (অর্বাচীন পুরাণ) কিঞ্চিত পরিমাণে শিবের কৃষিকাজের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে কিছু কিছু সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকও দুষ্প্রাপ্য নয়। যেমন :

> রামাদ্ যাচয় মেদিনীং ধনপতেঃ বীজং বলাল্লাঙ্গলং প্রেতেশান্মহিষং তবাস্তি বৃষভঃ ফালং ত্রিশূলং এব। শক্তাহং তব চান্নদানকরণে স্কন্দোহস্তি গোরক্ষণে। খিন্নাহং হর ভিক্ষয়া কুরু কৃষিং গৌরীবচঃ পাতু বঃ।
>
> অনুবাদ ঃ গৌরী শিবকে বলিতেছেন, "রামের নিকট হইতে তুমি কিছু ভূমি মাগিয়া লও, ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে বীজ আর বলরামের নিকট হইতে লাঙ্গল, প্রেতরাজ যমের নিকট হইতে চাহিয়া লও মহিষ, তোমার নিজেরই তো বৃষ রহিয়াছে– আর তোমার ত্রিশূল তো ফাল, আমি নিজে তোমাকে (মাঠে) অন্ন দিয়া আসিতে পারিব। স্কন্দ গোরক্ষণে শক্ত; হে হর ভিক্ষায় আমি খিন্ন, তুমি এইবার কৃষি কর।[২৭]

কৃষিপ্রধান বিশেষত ধান্য-প্রধান পূর্বভারতে নিষাদ যুগ হতে (অস্ট্রিক) ধান্যক্ষেত্রের দেবতারূপে ক্ষেত্রপাল ধরনের কোনো কৃষিদেবতার পূজা তদানীন্তন আর্যেতর কৃষকসমাজে প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়। অস্ট্রিকজাতি অর্থাৎ নিষাদজাতি খুব সম্ভব কৃষি ও মৎস্যজীবী জীবনের আদিম স্তরে বাস করত। সেই দূরপ্রস্থিত জীবনধারার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি পূর্বভারতের লৌকিক শিব কাহিনির মধ্যে পাওয়া যায়। *শিবায়ন* কাব্যের লৌকিক অংশে হর-পার্বতীর দারিদ্র্যের বাস্তব চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বঙ্গদেশে 'কৌলিক' প্রথার প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি ছিল। পূর্বের কাব্যগুলোর ন্যায় *শিবায়নও* এই প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারেনি। কুলীনের ছেলেকে কন্যার মাতা অশেষ প্রকারে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন। কন্যা মোটা ভাত, মোটা কাপড় পেলেই যেন কৃতার্থ হবে, জামাতার প্রতি শাশুড়ীর তাই সবিনয় নিবেদন:

কান্দিয়া কন্যার মাতা কৈল সমর্পণ ॥
জামাতার হস্ত তুলিয়া নিল নিজ মাথে।
শাশুড়ীর কথা হৈল জামাতার সাথে ॥
কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি ॥
আঁঠু ঢ্যাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর‍্যা ভাত।
প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ ॥
(শিবায়ন, পৃ. ৫২)

Dhaka University Institutional Repository

যে বয়সে লুকোচুরি, পুতুল খেলার কথা–সেই বয়সে একজন কিশোরীকে শ্বশুরবাড়ীতে যেতে হত। পারিবারিক রীতি-নীতি মেনে সংসারী হতে হত। পার্বতীকেও আমরা এমনরূপে পেয়েছি :

খেলে লুকলুকানি আপনি হয়্যা বুড়ি।
একচোরে সভাকারে করে তাড়াতাড়ি ॥
(শিবায়ন, পৃ. ৫৩)

বিবাহ-সম্বন্ধ করতে একজন ঘটক সমাজের সকলশ্রেণির মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। হর-গৌরীর বিবাহ-সম্বন্ধ করতে একজন ঘটকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় *শিবায়ন* কাব্যে। যেমন :

ঘটা কর্য়া ঘটকে পূজিল গিরিরাজ।
আস্যা যায়্যা আপনে সম্পূর্ণ কর কাজ ॥
অচলের কথা কভু চলিবার নয়।
পূর্ব্বের সবিতা যদি পশ্চিমে উদয় ॥
(শিবায়ন, পৃ. ৫৫)

শিবঠাকুর একজন কৃষক তবে কৃষিকাজে উদাসীন, তার সংসারে অভাব লেগেই আছে। নিম্নশ্রেণিকে পরোক্ষে অযোগ্য প্রমাণ করার এও একটা উচ্চবর্গীয় ধুর্ত প্রয়াস কিনা কে জানে?[২৮] ভিক্ষাবৃত্তিতে তার লজ্জা নেই। দেবতা-শিবকে, ভিক্ষুক-শিবে পরিণত করতে সে সমাজের এতটুকু বাধেনি কারণ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের অন্নের জন্য সংগ্রাম, বেঁচে থাকার সংগ্রাম ভিক্ষুক শিবের ভিক্ষাবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ। *শিবায়নে* পাওয়া যায় :

দারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাহি আর।
যতদিন সঞ্চয় সকল যায় মার ॥
নির্গুণ নিষ্কাম বাম পথে অবস্থিতি।
কে জানে কি জাতি কার পুত্র কার নাতি ॥
বুড় কত কালের কহিতে নারে কেহ।
চল্যা যাইতে টল্যা পড়ে অতি বৃদ্ধ দেহ ॥
বড় বল্যা বাসনা কর্য়াছ বুড়া বরে।
ভিক্ষ্যা মাঙ্গ্যা খায় ভুজি ভাঙ্ নাই ঘরে ॥
জ্বলিবে জঠরানলে জীবে কত কাল।
একমুখে পঞ্চমুখ বিষম জঞ্জাল ॥
কি দেখ্যা পড়্যাছ ভুলে ভূপতির ঝি।
বল মোরে ভাল বরে আমি তোরে দি ॥
(শিবায়ন, পৃ. ৬৭)

শিব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে কোনো প্রকারে সামান্য তেল সংগ্রহ করে আনেন আর ধৈর্যশীলা গৌরী অতি যত্নে অন্ন ও নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করে স্বামী ও পুত্রগণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। কিন্তু মাত্র ছয় মাসের সঞ্চয় ঘরে আছে, এর পর কী হবে এই চিন্তায় গৌরীর দেহলাবণ্য অন্তর্হিত হল। সম্মুখে অকুল পারাবার, এই পারাবার অতিক্রম করতেই দেবী কৃষিকাজ করতে শিবকে বার বার অনুরোধ করেছেন। শিবের ভূমিগ্রহণ ও জমিচাষ পদ্ধতি সাধারণ মানুষের খেটে-খাওয়া সংগ্রাম, ধৈর্যের ও সাহসের বিশাল এক মানচিত্র যেখানে শিব কর্ষকশ্রেণির প্রতিনিধি, রক্তমাংসের মানুষ। গুণবতী স্ত্রীর সুপরামর্শে

Dhaka University Institutional Repository

শিব চাষের জন্য উদ্‌যোগী হলেন। সর্বপ্রথম তিনি ইন্দ্রের নিকট চাষ-ভূমির পাট্টা গ্রহণ করলেন। শিবকে ইন্দ্র বলেন :

হর বাক্যে হাস্যা হরিহর কয় তবে।
আজ্ঞা কর কোনখানে কত ভূমি লবে ॥
মাগে হর তেপান্তর কোচ পাশে পাড়া।
দেববৃত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া ॥
একত্রে শঙ্কর-চক চষতের স্থান।
দেবী-চক দ্বীপ দেহ করিতে বিশ্রাম ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২২৩)

চাষাবাদ করতে গিয়ে সামাজিক দিক থেকে সর্বনিম্ন জাতি এবং সামাজিক উৎপাদনের দিক থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণির দেবতা বলে শিবের ওপর সমস্ত নিচপ্রবৃত্তি ও গুণ আরোপিত হয়েছে এবং এই সমস্ত গুণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে অন্ত্যজ সমাজের নিঃস্ব সহায়সম্বলহীন অবস্থা। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

বিশ্বনাথ বলে বাপু এই কালে কই।
দেখ আমি দুঃখী চাষী ডাট ডোট নাই ॥
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হবে সাবধান।
অঙ্গীকার কৈল ইন্দ্র তবে নিল দান ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২২৪)

সুতরাং শিব চাষের সজ্জা প্রস্তুত করে কুবেরের কাছ থেকে ভীম ভৃত্যের সাহায্যে বীজ-ধান্য সংগ্রহ করে আনলেন। মাঘ মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। ভীমের সাহায্যে শুভক্ষণে শিব জমিতে হলপ্রবাহ শুরু করলেন। চৈত্র মাসের মধ্যে শিব জমিতে চতুর্দশবার চাষ দিলেন। পরে চাষ ভূমিতে মাটি চূর্ণ করার জন্য তিনি জমিতে মই দিলেন।

বৈশাখ মাসে শুভক্ষণে শিব চাষ-ভূমিতে বীজ বপণ করলেন। শিবের জমিতে প্রচুর ফসল ফলল। এবার ধান ভানতে ঢেঁকির প্রয়োজন হল। শিবের নিজের ঢেঁকি ছিল না তাই নারদের কাছ থেকে ঢেঁকি চেয়ে আনলেন। শিবের অনুচর ভূতগণ ধানভাঙতে সাহায্য করল। ধান ভেনে তারা প্রচুর চাল উৎপাদন করল। গৌরীর সাংসারিক জীবনে দৈন্যের যবনিকাপাত এখানেই হল কিন্তু অস্তিত্বের লড়াইয়ে গৌরী এখানে অন্ত্যজ শ্রেণির নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> এই লৌকিক কাহিনীতে দরিদ্র শিবের গার্হস্থ্য-জীবন, দাম্পত্য কলহ, চাষবাস, মাছধরা প্রভৃতি বর্ণনায় পুরাপুরি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষিত হইয়াছে বিশেষত শিবের কৃষিকার্য ও ধান্য-রোপণের কাহিনীতে ব্রাহ্মণকবির কৃষিকর্ম বিষয়ে নিপুণ অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক আকর্ষণ সূচিত হয়েছে। শিব কর্তৃক ইন্দ্রের নিকট জমির পাট্টা গ্রহণ এবং কুবেরের নিকট বীজধান কর্জ করার বৃত্তান্তে এক যুগের সাধারণ বাঙালী কৃষাণের জীবনচিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে।[২৯]

এ প্রসঙ্গে অন্য একজন গবেষক মন্তব্য করেছেন :

> এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাসজীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুরাণীর জীবন কাহিনী।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

গৌরীর অধিকার আদায় : অন্ত্যজ নারীর অস্তিত্ব-অন্বেষা

মর্ত্যলোকে চাষের কাজে শিব এমনই উন্মত্ত হয়েছেন যে, কৈলাসে ফিরবার চিন্তাও তাঁর মনের কোণে একবারও উঁকি দেয়নি। সাধ্বী স্ত্রী গৌরীর কথা তিনি যেন একেবারেই ভুলে গেছেন এর কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের উদাসীনতা, খামখেয়ালীপনা, সর্বোপরি নীচতা সামাজিক অন্যান্য ক্রিয়া-কর্মের মধ্যেই পড়ে। এর জন্য যেমন কোনো পুরস্কার নেই, তেমনি কোনো শাস্তির বিধানও নেই। মর্ত্যলোকে শিবের কতকগুলি সঙ্গিনী জুটেছে, এই সঙ্গিনীদের মোহে আর চাষের ফসলের লোভে শিবের দিন ভালই কাটছিল। সাধ্বী স্ত্রী গৌরী আর দীর্ঘদিন স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে নারদের পরামর্শের সাহায্য নেয়। নারদের কথা অনুযায়ী দেবী গৌরী প্রথমে 'উঙানি' মশা প্রেরণ করলেন :

এমন উঙানি আস্যা অবনী ভিতর।
খায়্যা ক্ষত বিক্ষত করিল দিগম্বর ॥
তৈলহীন তনু তাতে তেপান্তরে পায়্যা।
বাকী নাই কোনখানে খুন কৈল খায়্যা ॥
জল বান্ধ্যা আষাঢ়ে আরম্ভ্যাছিল মই।
উঙানির রেলা বেলা দণ্ডটাক বই ॥
ভীমের উপরে আগে উঙানির দণ্ড।
কামড়াইয়া কলেবর কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
ভীম বলে বিশ্বে নাই মোর সম বীর।
কেনে তুচ্ছ উঙানিতে করিল অস্থির ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২৪৬)

'শিব' প্রতিরোধ করলেন :

মহেশ্বর মন্ত্রণা করিল মনে মনে।
আতুরে নিয়ম নাই নারায়ণ জানে ॥
তৈল আন্যা তনুতে লেপন কৈল সবে।
উঙানির উপদ্রব এড়াইল তবে ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২৪৭)

দেবী গৌরী দেখলেন শিবঠাকুর ও অন্য সকলেই সর্বাঙ্গে তেল মেখে উঙানি মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করল। এবার গৌরী মাছি ও ডাঁশ প্রেরণ করলেন :

নিড়ানের কালে আস্যা করিলেক ভঙ্গ।
মাঠে পায়্যা মাছি ডাঁশ মাতাইল জঙ্গ ॥

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরে নির্ভয় হয়্যা মারিল কামড়।
চমকিয়া চন্দ্রচূড় চালাইল চড় ॥
ঠাস ঠস ঠুই ঠাই ঠাকুরের করে।
দশ পাঁচ উড়্যা যায় দুই চাইর মরে ॥
কট্ কট্ কাট্যা কোটী কোটী দেই ভঙ্গ।
মাঠে পায়্যা মাছি ডাঁশ মাতাইল জঙ্গ ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২৪৯)

অতঃপর প্রতিরোধ :

মহাদেব মনে মনে করিয়া মন্ত্রণা।
ঘৃত মাখ্যা ঘুচাইল মাছির যন্ত্রণা ॥
হেল্যার কিয়ারি করি মাছি কৈল দূর।
তাহাতে রসুন-তৈল দিলেন প্রচুর ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২৫০)

সকলের সর্বাঙ্গে ঘি মেখে মাছি ও ডাঁশের দংশন হতে শিব সকলকে রক্ষা করলেন। মাছি ও ডাঁশের দংশনে হেল্যার গায়ে যে ঘা হয়েছিল তা থেকে বহু কৃমি জন্মেছিল। শিব কিয়ারি করে এবং ঘায়ে রসুন-তেল দিয়ে ক্ষতস্থান নিরাময় করে দিলেন। সুতরাং শিবকে কৈলাসে আনার জন্য গৌরী যে দুটি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সে দুইটিই নিষ্ফল হয়ে গেল। গৌরী এবার তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করলেন, এবার তিনি মর্ত্যলোকে মশা প্রেরণ করলেন :

মশার কীর্ত্তন শিবের নর্ত্তন
দাস মহিষের ভঙ্গ।
লোমকূপ সকলে শোণিত নিকলে
জজ্জর করিল অঙ্গ ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২৫১)

অতঃপর প্রতিরোধ :

উষ ঘাস করি জড় শঙ্কর জ্বালে খড়
দড় বড় লাগাল্য ধূম ॥
ধূমের জ্বালাতে মশক পালাত্যে
দাস মহিষের ভঙ্গ ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২৫১)

খড় জ্বালিয়ে ধূম উৎপন্ন করতেই সমস্ত মশা বিতাড়িত হল। তৃতীয় পন্থায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে গৌরী চতুর্থবারে বহু সংখ্যক জোঁক প্রেরণ করলেন। শিব চূণ ও লবণ প্রয়োগ করে জোঁক মেরে ফেললেন। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

Dhaka University Institutional Repository

মুকুন্দে মগন ছিল মহেশের মন।
জানে নাই ছিনা জোঁকে ধর‍্যাছে কখন ॥
ভীম দেখ্যা বলে ভোলা ভয় নাই তোর।
আপনার দেহ দেখ প্রাণ রাখ মোর ॥
চায়্যা চন্দ্রচূড় চূণ নুন দিল ঘস্যা।
রক্তাক্ত শরীর হৈল সব গেল খস্যা ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২৫৪)

সুতরাং দেবী গৌরী ব্যর্থ হলেন স্বামীকে ফেরাতে, তাহলে কী এমন উপায় আছে শিবকে বশে আনার! এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে গৌরী দেবতাশক্তি অর্থাৎ প্রভুশক্তি হয়ে একের পর এক উৎপাত, মর্ত্যলোকে পাঠানো প্রক্রিয়া- তথাকথিত শ্রেণিসমাজকে ইঙ্গিত করে, যারা ছোট ছোট ভূমির মালিক বা বর্গাচাষী ক্ষেতমজুর অথবা নিম্নশ্রেণির ক্ষেত্রকরের উপর শারীরিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে শোষণ করে আসছে। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় অন্ত্যজ নারীর অধিকার নেই, গৌরী এখানে অধিকারহীনা, সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে স্বামীর অধিকার আদায়ের জন্য কিন্তু পুরুষবেশী শিব ঠাকুর যার ভোগ্য একাধিক নারী, ঘরের স্ত্রীর প্রতি সে উদাসীন। শিব ঠাকুরকে বশে আনার জন্য কৈলাসের দেবীকে সেদিন অন্ত্যজ নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে, অন্ত্যজ নারী হয়ে তাকে শিবের মন জয় করতে হয়েছে বলে গৌরীর অভিমান, তাহলে এটাও সত্য যে অন্ত্যজ নারী কুচনী, বাগদিনীরা যেমন জাতিগতভাবে অন্ত্যজ তেমনি কৈলাস অধিপতি শিবের স্ত্রী গৌরীর স্বামীর অধিকার নেই, তিনি কী অন্ত্যজ নন? একজন বাগদিনী নারীকে শিব ঠাকুর যেভাবে চিত্তনিবেদন করেছেন ঘরের স্ত্রীকে ততধিক অপমান করেছেন। এটা থেকে প্রমাণিত যে, দেবী গৌরী অধিকারহীনা তাই অন্ত্যজ ঠিক দেবী মনসার মতো।

এবার বাগদিনী পর্বটিতে প্রবেশ করা যাক, দেবী পার্বতী মর্ত্যে এসে শিবানী বাগদিনীতে পরিণত হলেন। শিবের ধানক্ষেতে এসে মাছ ধরতে শুরু করলেন, এতে শিবের ধান নষ্ট হল। ভৃত্য ভীম এসব দেখে শিবানীর সঙ্গে কলহে লিপ্ত হল কিন্তু বাগদিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ শিব কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা না করে মিষ্টিকরে তার পরিচয় জানতে চাইলেন। বাগদিনী পরিচয় দিল :

বঙ্গদেশে বাস শিখরপুরে ঘর।
স্বামী বুড়া দোলুই দরিদ্র দিগম্বর ॥
বাপের নাম হেম দোলুই সেব্য যার সৌরি।
মায়ের নাম মেনকা আমার নাম গৌরী।
অল্পকালে দুটী পুত্র দিয়াছে গোঁসাঞি।
বহিন বিহীন নাম কার্ত্তিক গণাই ॥
বুড়াটী বিদেশে বনিতায় নাই রুচি।
মাঠে মাঠে মৎস্য ধরি হাটে হাটে বেচি ॥
পার্ব্বতী প্রকৃত পরিচয় দিলা তবু।
আতুরে অজ্ঞান হৈল জ্ঞানময় প্রভু ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২৬১-২৬২)

Dhaka University Institutional Repository

শিবানী এমনভাবে শিবকে স্বীয় পরিচয় দিল যে শিব তার সেই পরিচয়ে শিবানীকে চিনতে পারলেন না। এই পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় ভারতচন্দ্রের "অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা"র সময়ে পাটনীকে তার বিশেষণে সবিশেষ পরিচয় প্রদানের কথা। যা ঘটবার তাই ঘটল– কামার্ত্ত শিব শিবানীর দিকে ধাবিত হলেন। যেমন :

হাস্যা হাস্যা ঘেস্যা ঘেস্যা ছুতে যায় অঙ্গ।
বাগদিনী বলে আই মা এ আর কি রঙ্গ ॥
বুড়া সুড়া মনুষ্যা হয়্যা কেমন কর সয়্যা।
মন মজিল পারা মাঠে পায়্যা পরের মায়্যা ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২৬২)

শিবের আলিঙ্গনকে বাধাগ্রস্ত করল শিবানী বাগদিনী। সে বলল, পরের মেয়েকে মাঠে পেয়ে এমন কু-আচরণ কেন করছেন? নিজের ঘরে যেতে পারেন না? উত্তরে শিব বলেন :

সইটি তোমার তেমন নয় কিসে যাব ঘর ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২৬২)

এবার শিবানী বাগদিনী জানতে চায়, কী দোষ গৌরীর?

আমার সইয়ের কত দোষ কও দেখি শুনি ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২৬৩)

জবাবে শিব বলেন :

কঠিন হৃদয় হন ত সদয় দোষে গুণে জড়।
কোন্দল বিনা রৈতে নারে এই দোষটী বড় ॥
তুমি যদি সয়্যা বল্যা দয়া কর মোকে।
তোমা লয়্যা ঘর করিব ছাড়্যা দেব তাকে ॥
(শিবায়ন, পৃ. ২৬৩)

এতো কিছু বলার পরও বাগদিনী শিবের কথায় সম্মতি দেয়নি। এবার শিব বাগদিনীকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধান ক্ষেতের জল সিঞ্চন করে তার মাছ ধরার পথ সুগম করে দিলেন। বাগদিনীকে অত্যধিক সন্তুষ্ট করার জন্য শিব তাকে অঙ্গুরী প্রদান করলেন, অবশ্য বাগদিনী নিম্নবর্ণ ও নিম্নশ্রেণির গৃহিণী পিতলের অঙ্গুরীও জীবনে কখনও জোটেনি, যদি সে এই অঙ্গুরীটি পায় তাহলে তার আর কিছুই চাওয়ার থাকেনা, মনের সাধ পুরণ হয় তার। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

কিরাতিনী বলে মোর কাজ নাই তাতে।
পিতলের অঙ্গুরীটি দেহ মোর হাতে ॥
পূর্ণ কর্য়া পিত্তল পরিতে যদি পাই।
বাগদীর মায়্যা আর কিছুই না চাই ॥
পিত্তল অঙ্গুরী নহে কহে ত্রিলোচন।
মাণিক্য অঙ্গুরী লক্ষ নৃপতির ধন ॥
দয়া কর্য়া দামোদর দিয়াছিল মোরে।
ধর ধর বলিয়া ধূর্জ্জটি দিলা করে ॥
হৈমবতী হরের অঙ্গুরী লয়্যা হাতে।

Dhaka University Institutional Repository

পালাইতে প্রবঞ্চনা করে প্রাণনাথে ॥

(শিবায়ন, পৃ. ২৬৯)

এরপর শিবকে আলিঙ্গন দেওয়ার সময় উপস্থিত হলে ছদ্মবেশিনী শিবানী শিবের সঙ্গে বচন-বিদগ্ধতা আরম্ভ করল। এরপর,

অতঃপর আলিঙ্গনে অনুকূলা হও।
বাগদিনী বলে সয়া বিদগধ নও ॥
কলেবরে কাদাগুলা ধুয়্যা আসি আমি।
ততক্ষণ বাসর নির্ম্মাণ কর তুমি ॥

(শিবায়ন, পৃ. ২৭২)

শিবানী বাগদিনী গায়ের কাদা ধোয়ার ছল করে কৈলাসে চলে গেল। অন্যদিকে বাগদিনীর ফিরতে বিলম্ব দেখে শিব বুঝলেন যে বাগদিনী তাকে প্রবঞ্চনা করেছে তখন দেবী পার্বতীর জন্য শিবের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠলে তিনিও কৈলাস যাত্রা করলেন। কিন্তু স্বীয় গৃহদ্বারে উপস্থিত হলে এক নতুন বিপদ উপস্থিত হল। বাগদিনী শিবানীকে শিব অঙ্গুরী উপহার দিয়েছেন বলে পার্বতী শিবকে গৃহে প্রবেশ করতে দিলেন না। শিব এবার মহাবিপদে পড়লেন, তার এই বিপদের সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হল। দেবী পার্বতী নারদের কাছে শিবের কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিলেন। হর-পার্বতীর দ্বন্দ্বের সুমীমাংসা হয়ে যাতে শীঘ্র উভয়ের পুনর্মিলন ঘটে দেবর্ষির এই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মস্তিষ্কে একটি দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। হর-পার্বতীর কলহটি যাতে আরও একটু জোরালো হয় সেই উদ্দেশ্যে নারদ হরের কাছে একজোড়া শঙ্খ চাওয়ার পরামর্শ দেয় পার্বতীকে।

নারদের পরামর্শ অনুযায়ী পার্বতী হরের নিকট উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু ভিখারী শিব পার্বতীর সেই সাধ পূর্ণ করতে অক্ষমতার কথা জানালেন। অভিমানী পার্বতী রাগ করে পিতৃগৃহে চলে আসলেন। এবার আবারও দেবর্ষি উভয়ের মিলনের উদ্দেশ্য খুঁজতে শুরু করলেন, এবার তিনি শিবকে বললেন শাঁখারির বেশে গিরিরাজপুরে উপস্থিত হয়ে সহস্তে গৌরীকে শঙ্খ পরিয়ে দিতে। যেই কথা, সেই কাজ, দেবর্ষির কথা অনুযায়ী শিব গিরিরাজপুরে উপস্থিত হলেন। শঙ্করের বেশে ছদ্মবেশী শিবকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল দেবী শাঁখার মূল্য কত জানতে চাইল, শিব উত্তরে বললেন :

অমূল্য শঙ্খের মূল্য আত্ম-সমর্পণ।

(শিবায়ন, পৃ. ৩০৯)

অতঃপর শিব স্বহস্তে দেবীর দুই হাতে শঙ্খ পরিয়ে দিলেন। দেবীর অভিমান দূরীভূত হল। দেবী পার্বতী শিবের সঙ্গে কৈলাসে ফিরে গেলেন।

শিবায়ন কাব্যের অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনচিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে শিব-পার্বতীর সংসারের অভাব, বৃত্তি, চাওয়া, পাওয়া এমনকি ভোগেরও চিত্র সমাজের অন্তেবাসী মানুষের জীবনকে ঘিরেই।

এই বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদেরকে নস্টালজিক হতে হবে। বর্তমানের মার্জিত রুচি, উচ্চশিক্ষার আলোকে প্রদীপ্ত, সংস্কারমুক্ত, উদার-জনসংঘের সমাজ ও মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুদার জনগণের জীর্ণ সমাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।[৩১] সুতরাং পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অতীত দিনের কাব্য বিচার করার সময় সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়। সাহিত্য বিচার করার সময় সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন 'সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। সমাজের প্রকৃত অবস্থা সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। এই প্রতিফলন যথাযথ হলে সাহিত্যকর্মটি প্রথমশ্রেণির সাহিত্য বলে পরিগণিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের সমাজ ও সাহিত্যের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, মুসলমানী কেচ্ছার কলুষ স্রোতের মুখে পড়িয়া বঙ্গ সাহিত্য কলুষিত হইয়াছিল।'[৩২] প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য রচিতও হয়েছিল মানুষের জন্য।

'রামেশ্বরের কাব্য–ভদ্রকাব্য' এই তথ্যটুকু তিনি নিজেই দিয়েছেন বলে নয় ,সমগ্র কাব্যটি পড়ে, আত্মস্থ করে মনে হয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণির অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যদি শিব-পার্বতীকে অবলম্বন না করা হত তাহলে মধ্যযুগে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও অসহায় এই শ্রেণির প্রতিবাদের কোনো মাধ্যম খুঁজে পাওয়া যেত না। শিব-পার্বতী এখানে উপায়, উপলক্ষ মাত্র। 'শিবের কোঁচিনী পাড়ায় প্রবেশ' প্রসঙ্গে রামেশ্বর লিখেছেন :

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বায় যন্ত্র।
কেহ করতালি দেই সবে এক তন্ত্র ॥
কোঁচিনী সকল হৈল কুসুম উদ্যান।
শঙ্কর ভ্রমর তায় মধু করে পান ॥
নিত্য নিত্য এই কীর্ত্তি করে কৃত্তিবাস।
দিন শেষে বিজ্ঞ বেশে ভিক্ষা অভিলাষ ॥
(শিবায়ন, পৃ. ৯৭)

এই বর্ণনায় দেখা যায়, শিব কোঁচিনী পাড়ায় প্রবেশ করে পঞ্চমুখে আনন্দে গোবিন্দ গুণগান করছেন। আর কোঁচনীসকল তাকে ঘিরে কেউ নাচে, কেউ গান করে, কেউ বাদ্যযন্ত্র বাজায়, আবার কেউ করতালি দেয়। সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> শিবের হরিগুণগানে কোঁচিনীদের যোগদানে অশ্লীলতার গন্ধ কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। গোবিন্দ গুণগান না করিয়া যদি শিব খেউর বা টপ্পা গান করিতেন, শিধুপানে মত্ত হইয়া যদি তিনি কোঁচিনীদের সঙ্গে রতিরঙ্গে উন্মত্ত হইতেন, তবে সমালোচকদের নাসিকা কুঞ্চনে আমরা আপত্তি করিতাম না।[৩৩]

এবার বাগদিনী প্রসঙ্গে বলতে হয়, শিবানী অন্য কোনো নারী নয়, ছদ্মবেশিনী দেবী পার্বতী। তাকে শিব চিনতে পারলেন না কিন্তু তার মায়ায় ধরা পড়লেন। বাগদিনীর চরিত্র এখানে শরৎ শেফালিকার ন্যায় শুভ্র দীপ্তিতে ভাস্বর। এখানেও কোনরূপ অশ্লীলতার গন্ধ আছে বলে মনে হয় না। এসব চরিত্রে যা আছে তা মূলত শ্রেণিহীন মানুষের অধিকার আদায়ের স্বপ্ন। শিব চরিত্র সম্পর্কে সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর শিব বঙ্গদেশের শত সহস্র কৃষকের ঘরের লোক; এই দেব চরিত্রটি কৈলাসেরও নয়, শ্মশান-মসানেরও নয়, নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় নির্ব্বিকল্প যোগ-সমাধি-প্রাপ্ত তাপসও নহেন, এমন কি কালিদাসোক্ত মার্জ্জিত রুচি, কতকটা সন্দিগ্ধ-চিত্ত প্রেমিকও নহেন, তিনি চাষার ঘরের খাঁটি মানুষ।[৩৪]

বর্ণাশ্রমকে আদর্শায়িত করার প্রবণতাকে সমকালীন জাতীয়তাবাদী মানসিকতার প্রতিফলন হিসেবেও বিবেচনা করেছেন অনেকে। প্রাচীন ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথার অমানবিকতার বিষয়টি অনেকটা স্বীকৃত সত্য। অথচ এমন একটি সত্যকেও আধুনিক যুগের বিখ্যাত পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' এমনভাবে উত্থাপন করে যাতে মনে হয়, বর্ণাশ্রমের আদর্শের মধ্যেও দোষের কিছু নেই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথা ছিল একটি অনিষ্টকর প্রথা এবং যার ফলে উঁচু-নিচু বর্ণের মধ্যে নানা ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল।'[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু একই পত্রিকায় তিনি প্রাচীন ভারতে উচ্চবর্ণীয় ধনী ব্যক্তির উদারতার যে বর্ণনা দেন, তাতে মনে হয় না যে, প্রাচীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম আদর্শের মধ্যে কোনোরকম মানবাধিকার ক্ষুন্ন হত। এ জাতীয় একটি প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ :

> হরে চাঁড়ালের ব্যাম হইয়াছে তাহার শিশু পুত্রটি কাঁদিয়া আসিয়া বাবুকে সমাচার দিল। তখন সকলেই আহা! হরে চাঁড়াল দিব্য লোক ছিল বলিয়া নানা প্রকারে তাহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।... কবিরাজ মহাশয় সঙ্গেই ছিলেন, অমনি পুঁটলী খুলিয়া ঔষধ দিলেন।... হরে চাঁড়াল সারিয়া উঠিল।... হরে চাঁড়ালের বাড়ী হইতে আসিতে আসিতে পরাণমণ্ডল ধরিল, বাবু! আমার বাগানে একবার পদার্পণ করিয়া যান।... যেমন এক জায়গায় একটি ফুল ফুটিলে তাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয়, সেইরূপ কোন জায়গায় একজন বড়লোক হইলে তাঁহার দ্বারা চারিদিকের লোক উপকৃত হইত।[৩৬]

বঙ্গদেশীয় কৃষকদের দুরবস্থার কথা লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন :

> প্রাচীন ভারতে কৃষকের অবস্থা ভালো ছিল, তখন জমিদারী প্রথা ছিল এবং রাজারা প্রজাবৎসল ছিলেন।[৩৭]

তখন বর্ণাশ্রমকেই প্রশংসা করা হয় কেননা প্রাচীন কালের সেই সমাজে বর্ণাশ্রমই ছিল সবকিছুর নিয়ামক।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথার নিয়ম-কানুন কিছুটা শিথিল হয়েছিল আধুনিকযুগে তারপরও কখনও কখনও আমরা নিজেদের বিবেককে, মানবতাকে বিসর্জন দিয়ে সমাজের চোখে সম্মানী ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি :

> আমি পল্লীগ্রামে দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না– অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগীতা দাবী করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহার অযোগ্য বলিয়াছে, বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিন দণ্ড দিতেছি।[৩৮]

এমনকি মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও অস্পৃশ্যতা কতোটা কার্যকর তাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন :

> চোখের সামনে দেখিয়াছি, হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে পথ দিয়া স্নানে চলিয়াছে ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িয়া একটি বিদেশী রোগী মরিল, সে কোন্ জাতের মানুষ জানা ছিল না বলিয়া কেহ তাকে ছুঁইল না।[৩৯]

সুতরাং সাহিত্য যে সমাজের কথা বলে এটা যেমন সত্য তেমন সাহিত্যিকদের মতামত যুগে যুগে সময়ের দাবির কাছে পরাজিত হয়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিখ্যাত লেখকদের অভিমতও সময়ের দাবির কাছে মাথা নত করে। এটাই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি আর্যসমাজ, বর্ণপ্রথার পক্ষে তাদের স্তুতি করেছেন তিনিই এক শ্রেণির লেখককে সমালোচনা করেন, যাঁরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও প্রাচীন ভারত ও আর্যত্ব নিয়ে অযৌক্তিক আস্ফালন করেন।

তাঁর কবিতাটি নিম্নরূপ :

মোক্ষমুলার বলেছে 'আর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।...
কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর,
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর,

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর
সাক্ষী বেদব্যাস।[৪০]

শিবায়ন কাব্যে অন্ত্যজ শ্রেণি সমাজ-নির্ভর একটি বিষয়। যেখানে ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথার পাশাপাশি এসেছে 'নারী' শ্রেণি কারণ অন্ত্যজ শব্দটিকে সমাজের অন্তেবাসী সকল মানুষকে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম সকল ধর্মেই নারীর মর্যাদা যেমন নেই ঠিক তেমনি সামাজিক-অর্থনৈতিক ভাবেও নারীদের অবস্থান নিম্নস্তরে রাখা হয়েছে, অধিকারের প্রশ্নেও নারীরা অধিকারহীন, তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে একজন আধুনিক নারী তাঁর জন্মের আঁতুড়ঘরটি একবার দেখে উপলব্ধির জায়গাটি তৈরি করুক যেখানে পুরুষের মূল্যবোধের প্রয়োজন অনেক বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ :

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* তৃতীয় খণ্ড (প্রথম পর্ব), (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬-২০০৭), পৃ. ২১৮

২. স্বরোচিষ সরকার, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫), পৃ. ২১

৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙলীর ইতিহাস* (আদিপর্ব) (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং ,১৪০০), পৃ. ২৪৯

৪. অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ৪র্থ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০০৫), পৃ. ০৬

৫. ঐ, পৃ. ০৭

৬. অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮), পৃ. ১২১

৭. যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭), পৃ. ৭৭

৮. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র, *শিবায়ন* (সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য), (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৬৩), ভূমিকা অংশ।

৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ, ২০০৬), পৃ. ১৫১

১০. *Bengal District Gazetteer,* Santal Parganas, Calcutta, 1910, p. 128

১১. অজয় রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

১২. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (কলকাতা : ১৩৫৯), পৃ. ৬০৭

১৩. *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), প্রধান সম্পাদক আনিসুজ্জামান, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ২০০৮), পৃ. ২২৬

১৪. ঐ, পৃ. ২২৬

১৫. মমতাজুর রহমান তরফদার," বাংলার বর্ণ-ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ,ডিসেম্বর ১৯৮৩), পৃ. ২১১

১৬. কমলাকান্ত গুপ্ত, ইতিহাসের আলোকে শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত বিষ্ণু (ত্রিবিক্রম) মূর্তি, *পতিতপাবন মহাপ্রভু* শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধের অফপ্রিন্ট।

১৭. *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫

১৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ, ২০০৬), পৃ. ১৪২-১৪৩

১৯. ঐ, পৃ. ১৪৩

২০. *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

২১. Mahdi Husain (tran.), *The Rehla of Ibn Battuta* (Baroda, 1953), p.p. 238-39

২২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত) *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* (কলকাতা : ১৮৯৫, উত্তর খণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়, শ্লোক ৫৩), পৃ. ৫৭৯

২৩. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পাদিত) *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ* (কলকাতা : ১৮৮৮ দ্বিতীয় খণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়, শ্লোক ১২১)

২৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ ,১৯৫০), পৃ. ১২২

২৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব, (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৯-১০), পৃ. ৭৬

২৬. পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত, *রামেশ্বর গ্রন্থাবলী* (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৪), পৃ. ১১২

২৭. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে হরগৌরীর প্রেম* (কলকাতা : বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

২৮. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ, (কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, পঞ্চম মুদ্রণ ১৪১৫), পৃ. ১৩৪

২৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

৩০. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা* (কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ২য় সংস্করণ ১৩৬৫), পৃ. ২৬

৩১. যোগিলাল হালদার, *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭), ভূমিকা অংশ।

৩২. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (কলকাতা : অষ্টম সংস্করণ ১৯৪৯), পৃ. ৩৪৫

৩৩. যোগিলাল হালদার, পূর্বোক্ত, ভূমিকা অংশ

৩৪. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ* দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৬), পৃ. ৯৭১

৩৫. পত্র সূচনা *বঙ্গদর্শন* বৈশাখ ১২৭৯, ১ ঃ ৪

৩৬. "সাবেক মনুষ্যত্ব ও হালের সাইন করা" *বঙ্গদর্শন* আষাঢ় ১২৮৮ (১৮৮১), ৮ : ৮৯-৯০

৩৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গদেশের কৃষক" *বঙ্গদর্শন* পৌষ ১২৭৯, ১ : ৩৪৮

৩৮. উদ্ধৃত, সুধীরচন্দ্র কর, *কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ* (কলকাতা : এস.সি. সরকার, ১৯৬৩), পৃ. ৬৮

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম", *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ১৩শ খণ্ড (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০), পৃ. ৫৭৮

৪০. "বঙ্গবীর" মানসী, *রবীন্দ্র রচনাবলী* পূর্বোক্ত, ১ : ৩৭১

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মঙ্গলকাব্যের সমাজে বর্ণবিন্যস্ত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা মূলত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি বর্ণগুলোরই প্রতিষ্ঠাকে বুঝায়। কালক্রমে সমাজে ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য এই তিনটি শ্রেণির উদ্ভব হয়। *বৃহদ্ধর্মপুরাণের* মতে, ব্রাহ্মণ বাদে অন্য সমস্ত জাতিই শূদ্র। বঙ্গদেশে বর্ণবিন্যস্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইত্যাদি বর্ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বর্ণগতভাবে দৃষ্টিগোচর হয়না। সকলেই শূদ্র পর্যায়ে গৃহীত হত এবং দুইটি অথবা চারটি বর্ণ ছাড়াও অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য বলে শূদ্রের নিম্নেও আরও একটি শ্রেণির অস্তিত্ব তখন ছিল, বিভিন্ন পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থেও এর প্রমাণ আছে। মনে করা হয় ধর্মের দিক থেকে ধর্মান্তরিত এবং প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এবং আর্থিক-সামাজিক পর্যায়ে তারা সমাজশ্রমিক নিম্নপেশা অবলম্বনকারী। মঙ্গলকাব্যের আর্থিক-সামাজিক ক্ষেত্রে তারা অবহেলিত, বিপর্যস্ত। অধিকারের প্রশ্নে তারা বঞ্চিত, যেমন মঙ্গলকাব্যের নারীসমাজ। সুতরাং অন্ত্যজ শ্রেণি বলতে গবেষণাকর্মে যাদের স্থান দেয়া হয়েছে তারা মূলত অন্তেবাসী মানুষ–তারা সামাজিকভাবে ও ধর্মীয়ভাবে সমাজের অন্তে বসবাস করে।

বাংলার গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতির অবসান ঘটেছিল মুসলমান কর্তৃক বাংলা বিজিত হওয়ার পর। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুর্কী আক্রমণের ফলে বঙ্গদেশে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেই অভ্যুত্থান ঘটেছিল লোকায়ত দেবদেবীদের। পূর্বে এই সকল দেব-দেবী সমাজের নিম্নকোটির মানুষ কর্তৃক পূজিতা হতেন। মুসলমান রাজগণের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের মধ্যে শৈথিল্য ঘটায় নিম্নশ্রেণি, অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য কর্তৃক পূজিত বহু দেব-দেবী প্রাধান্য লাভ করতে থাকেন। তারা হলেন দেবীমনসা, দেবীচণ্ডী ও দেবীশীতলা-বাশুলী ইত্যাদি। হিন্দু দেবতামণ্ডলে দেবত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাদের অধিকাংশকে শিবজায়া পার্বতীর সঙ্গে অভিন্ন করা হয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্তমান যুগের হিন্দু সমাজে গৃহীত এই সকল দেব-দেবী বঙ্গদেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে পূজিতা হয়ে এসেছিলেন। তবে সমাজের নিম্নশ্রেণি কর্তৃক পূজিতা এই সকল দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। তার কারণ ছিল আর্যসমাজের প্রধান দেবতাসমূহ ছিল পুরুষদেবতা, আর আর্যেতর সমাজের প্রধান দেবতাসমূহ ছিল নারীদেবতা। আর্য দেবতাসমূহ যতই প্রাধান্য লাভ করতে লাগল, সমাজের উচ্চশ্রেণির উপাস্য আর্যেতর এই সকল নারীদেবতা ততই গাছতলায়, ঝোপেঝাড়ে, পর্বতগুহায় আশ্রয় লাভ করল। কিন্তু মধ্যযুগে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ দখল করার কারণে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম টলমল করতে শুরু করল, তখন নারীদেবতারা তাদের আশ্রয়স্থল পরিত্যাগ করে ক্রমশ হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্মসংস্কারের মধ্যে প্রবেশ অর্থাৎ জাতে উঠতে শুরু করল। এই অনুপ্রবেশকে সহজ-সাবলীল করার জন্য পৌরাণিক মাতৃদেবীর সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে মর্ত্যলোকে তাদের পূজা প্রচারিত হল। আর্যেতর দেব-দেবীদের নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হল সেই সাহিত্যই ''মঙ্গলসাহিত্য''। মঙ্গলসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি মঙ্গলকাব্য–*মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল*, *অন্নদামঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল*, *শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন* বক্ষ্যমান গবেষণাকর্মের মূল উপাদান।

মনসামঙ্গল কাব্যে অন্ত্যজ ও ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নে বলা যায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাশ্রিত সাহিত্যিকগণই ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধী অনার্যদেবী মনসার স্তুতি করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী না হয়ে বরং ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত সমাজ-ব্যবস্থারই চিত্রায়ণ করেছেন *মনসামঙ্গল* কাব্যে। তবে এ কথাও সত্য যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণির অবস্থান, বিদ্রোহ ও অধিকার অর্জনের জয়গাথা রচিত হয়েছে *মনসামঙ্গল* কাব্যে। ব্রাহ্মণ্য

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি থেকে বহুদূরে অবস্থিত অন্ত্যজ সংস্কৃতির কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির নারীগণ যখন জীবনের সকল সাধ, সব ভোগাকাঙ্ক্ষাকে বর্জন করে মৃতপতি কোলে নিয়ে গহীন সাগরের বুকে একাকিনী ভাসমানা হয়, অধিকারহীনা নারী হিসেবেই বেহুলা এখানে অন্ত্যজ কিন্তু জয় তারই হয়েছে, উচ্চশ্রেণির চাঁদ সদাগর তাকে সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখতে পারেনি।

ষোড়শ শতাব্দীর সমাজ-কাঠামো, জাতি-বর্ণপ্রথা সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য, শ্রেণিদ্বন্দ্ব প্রত্যেকটি বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা ও পর্যালোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে। সম্রাট আকবরের সমকালীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার এক বাস্তব চিত্র *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে বিধৃত হয়েছে যেখানে রাজস্বআদায়, প্রজা-পীড়নপ্রথা, সামন্ত-শাসকদের নির্মম শোষণ, সামাজিকবৈষম্য এবং জাতি-বর্ণ প্রথার এক স্বচ্ছ দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাঙ্গলার মুসলিম সমাজের পেশা ও সামাজিক মর্যাদা, পদবি এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বও এই কাব্যে চিত্রিত হয়েছে। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ অতিদুঃখে দিনযাপন করত, ফুল্লরার বারমাস্যার ভিতর দরিদ্র শ্রেণির জীবন-যাত্রার চিত্রটি দেখে আমরা সহজেই তা উপলব্ধি করতে পারি। কালকেতুর নব প্রতিষ্ঠিত নগর গুজরাটে বসতি স্থাপনের জন্য যে সকল প্রজার আগমন ঘটে তাদের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ঐ যুগের জাতিপরিচয় সর্ম্পকে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। ধনপতি উপাখ্যানে খুল্লনার সতীত্বপরীক্ষা প্রশ্নে উচ্চশ্রেণি কর্তৃক অন্ত্যজ শ্রেণির উপর অত্যাচারের চিত্র সেই সমাজের শ্রেণিদ্বন্দ্বকে ইঙ্গিত করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুরূপ প্রকাশিত। দরবারী দর্পচূর্ণ একদিকে, অন্যদিকে কৃষিনির্ভর পল্লীজীবন; যেখানে সরল, সংযত, সীমিত শান্তি ও তৃপ্তিবোধ মানুষের মধ্যে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে নগরজীবনের শূন্যগর্ভ ঐশ্বর্য, স্থূলরুচি, অসংযত জীবনাচারণ ও আবরণকে উন্মোচন করেছেন কবি ভারতচন্দ্র। তিনি সম্পূর্ণ সচেতনভাবে কাহিনি রচনা করেছেন, অনেকে ক্ষেত্রে, তিনি মঙ্গলকাব্যের প্রথাকে অনুসরণ করেননি। কিন্তু 'ঈশ্বরী পাটনী' চরিত্রটি মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে এসেছে। কবি অত্যন্ত সচেতনভাবে সেই সময়ের দাবি 'ঈশ্বরী পাটনী'র কণ্ঠে তুলে দিয়েছেন, দেবীর কাছে কবির আহ্বান–অন্ত্যজ শ্রেণির অন্নের সংস্থান যেন হয়, মানুষ আর যেন নিরন্ন না থাকে। নির্লোভ জীবনের প্রসন্নতা নিয়ে কবির প্রার্থনা,'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। আর্যেতর সমাজে যে কেবল নারীদেবতাই ছিলেন, এমন নয় । পুরুষদেবতা হিসেবে আমরা শিব ও ধর্মঠাকুরের নাম বলতে পারি। তাদের আশ্রয় করে যে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে সেগুলো হল *ধর্মমঙ্গল* ও *শিবায়ন*। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে ধর্মঠাকুর যে অন্ত্যজ শ্রেণির দেবতা, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ধর্মঠাকুরের পূজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেবল ডোম জাতীয় লোকেরাই এর পুরোহিতের কাজ করে। কাব্যে অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে অত্যন্ত চমৎকাররূপে। কালুডোম-লখাইদের বীরত্ব যেমন মুগ্ধ করার মতো, তেমন উচ্চশ্রেণির শোষণ-নির্যাতন ও প্রজাপালনের চিত্রও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে এ কাব্যে।

শিবায়ন কাব্যে শিবঠাকুরকে আমরা পেয়েছি সাধারণ বাঙালি গৃহস্থরূপে। গ্রামের শ্রমজীবী কৃষকদের মত তিনিও মাঠে চাষ করেন এবং গৌরীর সঙ্গে গৃহস্থ জীবনযাপন করেন। বস্তুত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গৌরীর বিবাহ সাধারণ বাঙালি নারীর বিবাহঅনুষ্ঠান, তাই হর-গৌরীর সংসারও সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষের সংসারের রূপচিত্র হয়ে ওঠে। অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শ্রেণির জীবনচিত্রেরও কিছু দিক *শিবায়নে* বিধৃত হয়েছে, শিবের কোঁচিনী পাড়ায় প্রবেশ, দেবীর বাগদিনী বেশ, অংশগুলো শিবচরিত্রে কালিমা লেপন করলেও এটা স্পষ্টত যে, কবির উদ্দেশ্য–অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, চাওয়া-পাওয়ার সংবাদ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া, শিব চরিত্রের মাহাত্ম্যের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পুরাণের মতো মঙ্গলকাব্য আখ্যানমূলক রচনা হওয়ায় মঙ্গলকাব্যের লৌকিক আখ্যায়িকার মধ্যে পৌরাণিক কাহিনিগুলো এসে প্রবেশ করতে থাকে। পুরাণ যেমন বিশেষ কোনো দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারমূলক রচনা, মঙ্গলকাব্যও তাই; শুধুমাত্র পুরাণের মধ্যে দেবতার মাহাত্ম্য আনুপূর্বিক দৈব উপায়েই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে–এর কোনো মর্ত্য পরিচয় নেই। এর নায়ক দেবতা, তার আচরণ দৈব; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের নায়ক স্বর্গভ্রষ্ট মানুষ, তার আচরণ মানবিক। পুরাণের দেবতা তার মাহাত্ম্যে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতা মানুষের স্বীকৃতি অর্জন করতে না পারলে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন না। সুতরাং মঙ্গলকাব্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষ, মানবতাকেই এখানে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মানুষ হিসেবে যাদের জয়গান করা হয়েছে তারা উচ্চশ্রেণির, উচ্চবৃত্তির বা উচ্চবর্ণের কেউ নয় একেবারে সমাজের তলানিতে পড়ে থাকা নিম্নবর্ণের, নিম্নআয়ের, নিম্নবৃত্তির, অধিকারহীনা অন্ত্যজ শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষ, যাদের অস্মিতাবোধ আছে, অহঙ্কার নেই।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূলগ্রন্থ

জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (সম্পাদক), কবি বিজয় গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পাদক), মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *কবিকঙ্কণচণ্ডী* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪)

সুকুমার সেন (সম্পাদক), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত *চণ্ডীমঙ্গল* (নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৭৫)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদক) , *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী* (কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ)

বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত (সম্পাদক), মানিক রাম গাঙ্গুলি বিরচিত *ধর্মমঙ্গল* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০)

যোগিলাল হালদার (সম্পাদক), রামেশ্বরের *শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭)

খ. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭)

---------, *আদি বাঙালি : নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭)

অতুল সুর, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস* (কলকাতা : জিজ্ঞাসা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬)

---------, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন* (কলকাতা : সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রিট, ১৯৮৬)

---------, *মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা* (কলকাতা : উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮)

অনীক মাহমুদ, *চিরায়ত বাংলা ভাষা সংস্কৃতি রাজনীতি সাহিত্য* (ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, প্রথম প্রকাশ, ২০০০)

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত* (কলকাতা : বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ)

অমল কুমার ঘোষ, *বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনা* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯)

অমলেন্দু মিত্র, *রাঢের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর* (কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২)

অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, চতুর্থ মুদ্রর্ণ, অক্টোবর, ২০০৫)

----------, *রেনেসাঁস ও সমাজমানস* (কলকাতা : উচ্চারণ, ১৯৮৩)

----------, *মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যবিচার* (কলকাতা : উচ্চারণ, ১৯৮৫)

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (দ্বিতীয় খণ্ড), (কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৬)

--------, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (তৃতীয় খণ্ড : প্রথম পর্ব), (কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬-২০০৭)

----------,*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব), (কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী

Dhaka University Institutional Repository

প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ , ২০০৯-২০১০)

---------, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* (কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৯-২০০০)

আনিসুজ্জামান, *স্বরূপের সন্ধানে* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৬)

--------, *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০০)

আনিসুজ্জামান, (সম্পাদক), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭)

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ অনূদিত, *আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)

আবুল কাশেম চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)

আমিন ইসলাম, *সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য* (ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯১)

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী, পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৬)

আবদুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪)

আবদুল করিম, *বাংলা সাহিত্যের কালক্রম* (মধ্যযুগ), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪)

---------, *বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯)

আবুল ফজল আল্লামী, *আইন-ই-আকবরী* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৮)

আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (দ্বিতীয় খণ্ড), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৮)

--------, *মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫)

ইরফান হবিব, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা* (১৫৫৬-১৭০৭), (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৯)

---------, ইরফান হবিব (সম্পাদক), *মধ্যকালীন ভারত* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯০)

এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ মোগল পর্ব), (ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক,বাংলাবাজার, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৭)

এ. কে. নাজমুল করিম, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, পুনর্মুদ্রণ, জুন, ২০০৮)

এন. এ. সিদ্দিকী, *মোগল রাজত্বে ভূমি রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা* (কলকাতা : পার্ল পাবলিশাস, ১৯৮০)

এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১৫৭৬-১৭৫৭) ২য় খণ্ড, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯)

ওয়াকিল আহমদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক* (ঢাকা : ১৯৯০)

----------, *মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪)

---------, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী* (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫)

কমলকুমার সান্যাল, *মানুষের ক্রমবিকাশ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি* (১ম খণ্ড), (কলকাতা : বর্ণালী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২)

----------, *মানুষের ক্রমবিকাশ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি* (২য় খণ্ড), (কলকাতা : বর্ণালী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৩)

কামিনী কুমার রায়, *বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার* (কলকাতা : বাসন্তী লাইব্রেরী, প্রথম সংস্করণ,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০)
কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, *নারী শ্রেণী ও বর্ণ* (নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান), (কলকাতা : মিত্রম্, প্রথম মিত্রম্ সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৯)
কার্ল ম্যানহাইম, *সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব* (বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর অনূদিত), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮০)
কোকা আন্তোনভা ও অন্যান্য, *ভারত বর্ষের ইতিহাস* (মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৬)
ক্ষিতিমোহন সেন, *হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা* (কলকাতা : বিশ্ব ভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৬)
খাজা নিযামউদ্দীন আহমদ,*তবাকাত ই-আকবরী* ১ম ও ২য় খণ্ড, আহমদ ফজলুর রহমান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮)
ক্ষেত্র গুপ্ত, *কবি মুকুন্দরাম* (কলকাতা : গ্রন্থ নিলয়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৪)
---------, *প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন* (কলকাতা : সাহিত্য প্রকাশ, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ)
--------, *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস* (কলকাতা : গ্রন্থ নিলয়, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০০)
গীতা মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সামন্ততান্ত্রিক চিত্তাধারা* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮১)
গোপাল হালদার, *বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ, (কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ)
--------, *বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* (দ্বিতীয় খণ্ড : নবযুগ), (কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ)
গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ* (কলকাতা : ১৯৮৩)
গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী, *বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯)
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, মাঘ, ১৪১৪)
তানভীর মোকাম্মেল, *মার্কসবাদ ও সাহিত্য* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯)
তোফায়েল আহমদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় প্রকাশ, জুন, ১৯৯২)
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবিকঙ্কণচণ্ডী, চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী* (প্রথম ভাগ), (কলকাতা : ইউনিভার্সিটী প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ১৯২৫)
----------, *কবিকঙ্কণচণ্ডী, চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী* (দ্বিতীয় ভাগ), (কলকাতা : ইউনিভার্সিটী প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ১৯২৮)
চিত্তরঞ্জন মাইতি, *বাংলা কাব্য প্রবাহ* (কলকাতা : ড. মেহ্‌রা রূপা অ্যান্ড কোং, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৪)
জয়া সেনগুপ্তা, *মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী* (ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০)
জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *আত্মঅন্বেষা : বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪০৬/ জুন, ১৯৯৯)
দেবেশ রায়, (সম্পাদক), *দলিত সাহিত্য* (কলকাতা : সাহিত্য একাডেমী, ২০০১)
দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ প্রথম খণ্ড, (সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত), (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৬, ফাল্গুন, ১৪১২)
দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড, (সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত), (কলকাতা : দে'জ

Dhaka University Institutional Repository

পাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রর্ণ, মার্চ, ২০০৬, ফাল্গুন, ১৪১২)
দুর্গাদাস লাহিড়ী, *বঙ্গের ইতিহাস* (কলকাতা : ১৩১৫ বঙ্গাব্দ)
দেবীপদ ভট্টাচার্য, *বাংলার চরিতসাহিত্য* (কলকাতা : ১৯৫৪ খ্রি.)
নগেন্দ্রনাথ বসু, *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস* (ব্রাহ্মণ কাণ্ড), প্রথমাংশ, কলকাতা
--------, *বারেন্দ্র কায়স্থ বিবরণ* (কলকাতা : ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)
------- , *কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়* (কলকাতা : ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা* (কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৭)
নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম* (মোঃ রেজাউল করিম অনূদিত), (ঢাকা : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭)
নির্মল দাশ, *মধ্যযুগের কাব্যপাঠ* (কলকাতা : সাহিত্য বিহার, সাহিত্য বিহার সংস্করণ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ)
নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়)
----------,*বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, জ্যোৎস্না সিংহ রায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, (কলকাতা : লেখক সমরায় সংস্করণ, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ)
----------, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ)
----------, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৬ বঙ্গাব্দ)
নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস* (কলকাতা : ১৩২২ বঙ্গাব্দ)
নৃপেন্দ্র গোস্বামী, *ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ* (কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ)
নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরী , *দেবতার মানবায়ন : শাস্ত্রে সাহিত্যে এবং কৌতুকে* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫)
পবিত্র সরকার, (প্রধান সম্পাদক), *ভারতের সমাজ ভারতের নারী* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০১)
প্রদ্যোত কুমার মাইতি, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে বাঙালী নারীর শিক্ষা-চিত্র, ইতিহাস-অনুসন্ধান-৫* গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০)
প্রফুল্লকুমার সরকার, *ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু* (কলকাতা : ২য় সংস্করণ, ১৯৪১)
প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, *ব্রত ও আচার* (ঢাকা : সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)
প্রমথ চৌধুরী, *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৯৮)
ফ্রাঞ্জ ফেনো, *জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত* (আমিনুল ইসলাম ভূইয়া অনূদিত), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮)
বদরুদ্দীন উমর, *মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি* (কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশনী, ১৯৮৬)
বি. টি. রণদিভে, *জাত বর্ণ শ্রেণী এবং সম্পত্তিগত সম্পর্ক* (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,অষ্টম মুদ্রণ, জুলাই, ২০১০)
বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৮)
---------, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা : প্রকাশ ভবন, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৮)
---------, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* তৃতীয় খণ্ড, (কলকাতা : প্রকাশ ভবন, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৮)

Dhaka University Institutional Repository

----------, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* চতুর্থ খণ্ড, (কলকাতা : প্রকাশ ভবন, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭)

--------,*বাদশাহী আমল*, (ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ট্রাভের্লাস ইন দা মুঘল এম্পায়ার অবলম্বনে রচিত), (কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৩৯২)

--------, *বাংলার লোক সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব* (কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮০)

বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, *জীবন রসিক কবি মুকুন্দরাম* (কলকাতা : হাউজ অব বুকস, ১৯৬৫)

ভবতোষ দত্ত, *বাঙালি মানসে বেদান্ত* (কলকাতা : সাহিত্যলোক , প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬)

ভীষ্মদেব চৌধুরী , *বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা ও অন্যান্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১)

ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* (প্রথম পর্যায়), (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৭৮)

মিতা চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের দেব-ভাবনা* (কলকাতা : ১৯৮০)

মিনু মাসানী, *বিবর্তনের পথে মানব-পরিবার* (নিযামউদ্দিন আহমদ অনূদিত), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩)

মুখলেসুর রহমান, *মাতৃকা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯)

মুস্তফা পান্না, *বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

মুসা আনসারী, *ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, জুন, ২০০৮)

মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১ম খণ্ড), মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ , ১৯৯৫)

--------, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৬)

মুহম্মদ আফসারউদ্দীন (সম্পাদক), *এ. কে. নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা : সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪)

মুহম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৬)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা* দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৭)

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, *শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১)

মোহাম্মদ হাননান, *মনসামঙ্গল কাব্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব* (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, একুশে বইমেলা, ২০০১)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আধুনিক বাংলাকাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭০)

মীনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী* আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক বাংলায় অনূদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)

রজনী পাম দত্ত ,*আজিকার ভারত* (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, প্রথম বাংলা সংস্করণ, ১৯৪৮)

রঞ্জন দত্ত, *রাঢের সমাজ অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ : বীরভূম ১৭৪০-১৮৭১* (কলকাতা : সুবর্ণরেখা রত্নাবলী, ২০০১)

Dhaka University Institutional Repository

রফিকউল্লাহ খান, *কবিতা ও সমাজ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫)

রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ), (কলকাতা : ১৯৭৪)

----------, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (মধ্য যুগ), (কলকাতা : ১৩৮০ বঙ্গাব্দ)

----------, *বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি* (কলকাতা : ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ)

----------, *কমলা বক্তৃতামালা* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬)

রাজিয়া সুলতানা, *সাহিত্য বীক্ষণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৮)

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *মানব সমাজ* (ড. সুবোধ চৌধুরী অনূদিত), (কলকাতা : ভারতী বুক স্টল, প্রকাশ কাল অনুল্লেখিত)

----------, *নতুন মানব সমাজ* (শম্ভুনাথ দাস অনূদিত), (ঢাকা : নবপ্রকাশ ভবন, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৬)

রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *সমাজ সংস্কৃতি প্রগতি* (কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯১)

রামশরণ শর্মা, *ভারতের সামন্ততন্ত্র* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)

----------, *প্রাচীন ভারতে বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজ গঠন* (গৌতম নিয়োগী অনূদিত), (কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮)

লেলিন আজাদ, *ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষিকাঠামো* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯)

শঙ্করী প্রসাদ বসু , *কবি ভারতচন্দ্র* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০০)

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ-চরিত্র* (কলকাতা : পুঁথি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২)

----------, *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা : পুঁথি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪)

----------, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী-চরিত্র* (কলকাতা : পুঁথি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬)

----------, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি* (কলকাতা : পুঁথি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

----------, *গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও সাধনতত্ত্ব* (কলকাতা : ১৯৯৯)

----------, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সামাজতত্ত্ব* (কলকাতা : পুঁথি, প্রথম সংস্করণ, ২০০০)

----------, *শাক্ত-তান্ত্রিক সাধনা ও সাহিত্য* (কলকাতা : পুঁথি, প্রথম সংস্করণ, ২০০০)

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০)

শিপ্রা সরকার, *সাহিত্যের সামাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য* (ঢাকা : আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, প্রথম আজকাল প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৭)

শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ* (কলকাতা : ১৯০৯ খ্রি.)

শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য, *ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ* (কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৫৬)

শিব প্রসাদ হালদার, *পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গ সাহিত্য* (কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৩)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬৭)

স্বরোচিষ সরকার ,*অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫)

স্নেহময় চাকলাদার, *ভারতের জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৫০)

----------, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, নবম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৯)

----------, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৩৯৮, নবম মুদ্রণ, জৈষ্ঠ, ১৪১৭)

----------, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড), (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৪০১, অষ্টম মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪১৭)

----------, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (চতুর্থ খণ্ড), (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৬, ষষ্ঠ মুদ্রণ ,জুন, ২০১০)

----------, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (পঞ্চম খণ্ড), (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১০)

সুখময় মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম* (কলকাতা : ভারতী বুক স্টল, ৯৩, মাহাত্মা গান্ধি রোড, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৭)

----------, *বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর (*স্বাধীন সুলতানদের আমল) (কলকাতা : ১৯৮০ খ্রিঃ)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় , *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য* (কলকাতা : ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক্-পলাশী বাংলা* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২)

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, *কলিকাতা : সেকালের ও একালের* (কলকাতা : ১৯১৫ খ্রিঃ)

সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৪/ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮)

সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ, মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, *সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৩/ মার্চ, ২০০৭)

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (প্রথম পর্ব), (কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮২)

----------, *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (দ্বিতীয় পর্ব), (কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৮)

----------, *হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* (তৃতীয় পর্ব), (কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭)

গ. সহায়ক বাংলা প্রবন্ধ

অজয় রায়, "ভূখণ্ড বাংলাদেশ, জন-জাতি ও সভ্যতা সংস্কৃতি", মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, *সুন্দরম* শীতসংখ্যা, (ঢাকা : ১৪০২)

-------, "বাঙালির আত্মপরিচয় : একটি পুরাবৃত্তিক ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনা " সফর আলী আকন্দ সম্পাদিত, *বাঙালীর আত্মপরিচয়* (রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১)

আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, " বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী" সফর আলী আকন্দ সম্পাদিত, *বাঙালীর আত্মপরিচয়* (রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১)

আবু জাফর শামসুদ্দীন, "বাঙালীর আত্মপরিচয়" সফর আলী আকন্দ সম্পাদিত, *বাঙালীর আত্মপরিচয়* (রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১)

Dhaka University Institutional Repository

খন্দকার মুজাম্মিল হক, "মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ঐতিহাসিক উপাদান" আবুল খায়ের মোঃ আশরাফ উদ্দিন সম্পাদিত, *ভাষা-সাহিত্য পত্র* উনত্রিংশ বার্ষিক সংখ্যা, (ঢাকা : বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪১০ বঙ্গাব্দ)

খোন্দকার সিরাজুল হক,"বাংলার মুসলমানের আত্মপরিচয়" সফর আলী আকন্দ সম্পাদিত, *বাঙালীর আত্মপরিচয়* (রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১)

জামরুল হাসান বেগ, "মনসামঙ্গলের পুরুষচরিত্র : নারী আসক্তি প্রসঙ্গ" *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* সংখ্যা ৬৫, (ঢাকা : অক্টোবর ১৯৯৯, কার্তিক ১৪০৬)

মাহমুদা খাতুন, "মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ" মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, *সুন্দরম* ৬ষ্ঠ বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা (ঢাকা : ১৯৯২)

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, "বাংলাদেশের প্রসঙ্গ উত্তরাধিকার" *বাংলাদেশ : বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* (ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১)

মোহাম্মদ হাননান "মনসামঙ্গল কাব্য : চাঁদ সদাগরের শ্রেণী-চরিত্র" মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, *সাহিত্য পত্রিকা* চৌত্রিশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফাল্গুন, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ)

নরেন বিশ্বাস, "প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে খাদ্য পানীয়" রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *সাহিত্য পত্রিকা* আটত্রিশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কার্তিক, ১৪০২ বঙ্গাব্দ)

নীলিমা ইব্রাহিম,"মুকুন্দরামের কাব্যে শ্রেণীচরিত্র" *সাহিত্য পত্রিকা* অষ্টাদশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ)

রংগলাল সেন, "বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো : ঐতিহাসিক পটভূমি " *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* (ঢাকা : ডিসেম্বর, ১৯৮১)

শামীম আরা, "মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য : অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ" দুলাল ভৌমিক সম্পাদিত, *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* (ঢাকা : সপ্তবিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪১৬/ ডিসেম্বর ২০০৯)

শিপ্রা সরকার, "হিন্দু সমাজের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা : একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, ভীষ্মদেব চৌধুরী সম্পাদিত, *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* (ঢাকা : ঊনবিংশ খণ্ড, হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, গ্রীষ্ম-শীত ১৪১৮/ ডিসেম্বর ২০১১)

সাঈদ-উর রহমান "সামন্তযুগে বাংলা ভাষার কবিদের সাহিত্যাদর্শ" *সাহিত্য পত্রিকা* তেত্রিশবর্ষ , দ্বিতীয় সংখ্যা ,(ঢাকা : ফাল্গুন, ১৩৯৬/ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০)

সুকুমারী ভট্টাচার্য, "সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্র ও নারী : পঞ্চম থেকে একাদশ শতক" *প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৩৯৪)

ঘ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Abul Fazl Allami , *The Ain-i-Akbari* Vol. 1. (Calcutta : Asiatic Society, Tr. By H. Blockmann, Second edition, revised and edited by D. C. phillot , Third edition , 1977, Reprinted from Second edition of 1927)

----------, *The Ain-i-Akbari,* Vol. II. (Calcutta : Asiatic Society , Tr. By Colonel H. S. Jarret, Second edition, corrected and further annotated by Sir Jadu Nath Sarker. Third edition, 1978. Reprinted from Second edition of 1949)

A. K. Nazmul Karim, *Changing Society in India Pakistan and Bangladesh* (Dacca : Nawroze Kitabistan , 1976)

Dhaka University Institutional Repository

----------, *The Dynamics of Bangladesh Society* (New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1980)

Angus Maddison, *Class Structure and Economic Growth : India and Pakistan Since the Mughals* (London : 1917)

B. K. Chaturvedi , *Sliv., Books For All* (Delhi : 1996)

Christopher Caudwell, *Illusion and Reality* (Bombey : People's Publishing House, 1947)

D. D. Kosambi , *Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline* (New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1981)

David Daiches , *Literature and Society* (London : Lawrence and Wishart , 1938)

Dinesh Chandra Sen, *Vanga Sahitya Parichaya, Part I* (Calcutta : Calcutta University, 1914)

Dipti Kumar Biswas, *Sociology of Major Bengali Novels* (Haryana : The Academic Press , 1974)

Dr. Muhammad Enamul Haque, A *History of Sufi –ism in Bengal* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1975)

Dr. P. N. Chopra, *Life and letters under the Mughals* (New Delhi : 1976)

E. B. Tylor, *Primitive Culture* (New York : Brentano's , 1924)

Ernst Fischer , *The Necessity of Art* (London : Penguin Books, 1963)

G. V. Plekhanov, *Art and Social Life* (Moscow : Progress Publishers, 1974)

H. Arvon, *Marxist Esthetics* (Cornell : Cornell University, 1973)

Hamida Khatoon Naqvi, " Incidents of Rebellions During the Reign of Emperor Akbar" in S. Nurul Hasan et (ed.) *Medieval India- A Miscellany* Vol. II (Bombey : Asia Publishing House, 1972)

Herbert Risley, *The People of India* (Calcutta : Thacker Spink and Co. 1908)

Jadu Nath Sarkar (ed.) , *The History of Bengal* Vol. II (Dacca : The University of Dacca, 1972)

--------, *Bengal Nawabs* (Calcutta : Asiatic Society of Bengal)

--------,*Fall of the Mughal Empire* Vol. I, Third edition, reprinted , Orient Langmans Limited Bombay : Calcutta : Madras : New Delhi, 1981.

J. Dimitrov, *Complete Works* Vol. I, (Moscow : Progress Publishers ,1968)

J. Z. Holwell, *Interesting Historical events relating to the Province of Bengal and Empire Indostan* part 1,London.

K. K. Datta, *Studies in the History of the Bengal Subah, Kolkata* (Calcutta : 1936)

Karl Marx, *Friedrich Engels On Literature and Art* (Moscow : Progress Publishers , 1976)

Dhaka University Institutional Repository

Lewis A. Coser (ed.) , *Sociology Through Literature*(London : Prentic Hall, 1963)

M. Martin, *History, History, Antiquities , Topography and Statistics of Eastern India* Vol. I and II (London : 1838)

Max Weber , *The City* (New York : The Free Press , 1966)

Mirza Nathan , *Baharistan-i-Ghyabi,* Vol. I Tr. by M. I. Borah (Gouhati, 1936)

M. N. Srinivas , *Religion and Society Among the Croogs of South India* (London : Oxford University Press, 1952)

Muhammad Abdur Rahim , *Social And Cultural History of Bengal* Vol. II (Karachi : Pakistan Publishing House , 1967)

Pierre Bessaignet (ed.) *Social Research in East Pakistan* (Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1964)

Pitirim Sorokin, *Social and Cultural Dynamics* (London : Petter Owen, 1957)

P. N. Ojha, *Aspects of Medieval Indian Society and Culture (*Delhi : B. R. Publishing Corporation, 1978)

Rama Prasad Chanda, *The Indo-Aryan Race* (Rajshahi : Varendra Research Society ,1916)

Ralph Fox, *The Novel and the People* (London : Lawrence and Wishart, 1937)

S. B. Dasgupta, *Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature* (Calcutta : Calcutta University, 1946)

S. Nurul Hasan et al (eds.), *Medieval India- A Miscellany* Vol. II (Bombey : Asia Publishing House , 1972)

Sree Ram Sharma, *The Religious Policy of the Mughal Emperors,* (New Delhi : 1962)

Sushil Kumar De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century* (Catcutta : Catcutta University, 1962)

Subhorangan Das-Gupta, *Dialectics and Dream* (Stuttgart : Steiner Verlag Wiesbaden G MBH, 1987)

Tamonash Chandra Das Gupta, *Aspects of Bengali Society* (from old Bengali Literature, (Calcutta : Calcutta University Press, 1935)

Tom Bottomore, et al (eds.) , *A Dictionary of Marxist Thought* (Oxford : Black well Reference, 1988)

V. I. Lenin, *On Literature and Art* (Moscow : Progress Publishers ,1970)

William Adams, *Report on Education in Bengal (* Calcutta : 1835)

W. W. Hunter, *The Indian Musalmans* (Calcutta : Reprinted From third edition, 1945)

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. সহায়ক ইংরেজি প্রবন্ধ

D. D. Kosambi, "Caste and class in India", *Science and Society* Vol. III, No. 3 (Summer, 1944)

Irfan Habib, "Theories of Social Change in South Asia", *The Journal of Social Studies* No. 33 (Dhaka : css, 1986)

Lucien Goldmann, "The Sociology of Literature –Status and Problems of Method", *International Social Sciences Journal* Vol. XIX (London : 1967)

Miriam Sharma, "Caste, Class and Gender : Production and Reproduction in North India" *The Journal of Peasant Studies* Vol. 12, No. 1, July (London : 1985)

R. S. Sharma, "How Feudal was Indian Feudalism ?" *The Journal of Peasant Studies* Vol. 12, Nos. 2&3 (London : 1985)

চ. প্রাসঙ্গিক অভিধান/ পরিভাষাকোষ

অশোক মুখোপাধ্যায় (সংকলক), *সংসদ সমার্থ শব্দকোষ* (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯০)

আব্দুল হাকিম, খান বাহাদুর (সম্পাদিত), *বাংলা বিশ্বকোষ* (১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড) , (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২-১৯৭৬)

আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২)

দুলাল চৌধুরী, *লোকসংস্কৃতি : পরিভাষা* (কলকাতা : রূপসী বাংলা, ২০০২)

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রাজিয়া সুলতানা (সংকলিত ও সম্পাদিত), *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী , জুন ২০০৭)

রাজশেখর বসু (সংকলিত), *চলন্তিকা* (কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি: এয়োদশ সংস্করণ, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ)

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত), *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, উনবিংশ মুদ্রণ, ১৯৯৫)

সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান* (কলকাতা : এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি: পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ)

সুবলচন্দ্র মিত্র (সংকলিত), *সরল বাংলা অভিধান* (কলকাতা : নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা: লি: অষ্টম সংস্করণ, পুণর্মুদ্রণ, ১৯৯১)

সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পাদিত), *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান* (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬)

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *রাজনীতির অভিধান* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: ১৯৯৭)

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (দুই খণ্ডে ১ম ও ২য়) (নয়াদিল্লী : সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৭৮)

Judy Pearsall (ed.), *Concise Oxford English Dictionary* (New York : Oxford University Press, tenth edition, revised, 1999)

Websters Revised Unbridge Dictionary 1913

Samik Bandyopadhyay (ed.), *The New Samsad English Bengali Dictionary* (of Contemporary English) (Kolkata : Sahitya Samsad)